সাধারণ বিজ্ঞান

(নবম ও দশম শ্রেণী)

শ্রীঅশোক

.সি., বি. টি.,

র্স ফিজিক্স কনটেন্টস্ ট্রেণ্ড—

গণিত ও পদার্থ বিজ্ঞানের শিক্ষক, বিবেকানন্দ ইনস্টিটিউশন্ (উচ্চতর মাধ্যমিক
ও বহুমুখী বিত্থালয়), হাওড়া ; পদার্থ বিজ্ঞানের (পার্ট-টাইম)
শিক্ষক, শিবপুর ভবানীবালিকা বিত্থালয় ; হাওড়া রামকৃষ্ণ
ইনস্টিটিউশনের বিজ্ঞান ও গণিতের ভূতপূর্ব শিক্ষক ;
সরল পাটীগণিত (৮ম শ্রেণী) প্রণেতা।

ও

শ্রীইন্দুশেখর বিশ্বাস, এম. এস্-সি., ডি. ফিল,

উদ্ভিদ্ বিত্থার অধ্যাপক, রামমোহন কলেজ (সিটি কলেজ প্রাতঃকালীন
বিভাগ), কলিকাতা ; জীববিত্থার শিক্ষক, বরাহনগর
রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম উচ্চতর মাধ্যমিক ও
বহুমুখী বিত্থালয়, কলিকাতা।

আধুনিক প্রকাশক

১৭-বি, মুক্তারাম বাবু স্ট্রীট্,

কলিকাতা-৭

আধুনিক প্রকাশক পক্ষে
প্রকাশক :
শ্রীভূপেন্দ্রনাথ বসু এম. এ.
১২৭-বি, মুক্তারাম বাবু স্ট্রীট্,
কলিকাতা-৭

প্রথম প্রকাশ : এপ্রিল, ১৯৬০

াকর :
শ্রীপ্রভাতচন্দ্র রায়
শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড
৫, চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাত

সূচীপত্র

প্রথম খণ্ড

নবম শ্রেণীর পাঠ্যাংশ

SYLLABUS

CLASS IX

Objective: To provide an elementary scientific classification and interpretation of some everyday phenomena.

A. MECHANICS:	
1. What makes work hard; weight, friction, inertia.	
2. General notion of gravitation. Newton's Law of attraction. Simple explanation of movement of Moon and of artificial satellites. Simple explanation of tides.	
3. Simple machines to make work easier: inclined plane: lever, pulleys. (Simple pulleys).	Demonstration, experiments with inclined plane, pulleys.
B. LIGHT:	
1. Light travels in a straight line; shadows; eclipses.	Construction of a pinhole camera.
2. Light travels with finite velocity (simple statement). Light from the sun takes 8 minutes to reach us. Light travels faster than sound. Lightning is seen before thunder is heard.	
Reflection of light at plane and spherical mirrors: convex and concave (Focus and focal length). Real and virtual images (no mathematical formulae).	Construction of a periscope. Formation of images by mirrors.
Refraction; convex lense. Focus and focal length (no mathematical formulae).	Experiments on refraction through glass and water. Formation of images by lenses.

5. The eye as a lense (simple explanation).	Demonstration of principal parts of telescope and of simple and compound microscope.
6. The Prism, dispersion of colours.	Demonstration of model of an eye.
C. HEAT :	
1. Main sources of heat ; Sun, mechanical action, (friction) chemical reactions (burning of fuels), electricity.	Use of prism to show formation of spectrum.
2. Effects of heat : Expansion of solids, liquids, gases (examples and applications), land and sea breezes.	Ball and ring experiment. Expansion of different metals of liquid and gases.
3. Heat and Temperature : Thermometers . fiixed points and scale; maximum and minimum thermometer ; clinical thermometer	
4. Change of state : Melting, freezing, evaporation, boiling, condensation ; heat is required for melting and evaporation.	Melting and boiling points of different substances ; preparation of ice by rapid evaporation of ether.
5 How heat travels ; conduction (clothing and body covering), convection (heating and ventilation), Radiation.	Conduction—experiments, convection of liquids and gases.
D. CHEMICAL REACTIONS:	
1. Acids, bases and salts (to be treated mainly by examples).	Hydrochloric, sulphuric, nitric and carbonic acids [illegible] potash, caustic soda and barium hydroxide ; common salt
2. Chemical composition and principal uses of common salt, sodium carbonate, caustic soda, Hydrochloric acid.	

3. Nitrogen Cycle and Nitrogen compounds in agriculture : Fertilisers—Ammonium sulphates and Nitrates : Bacterial action —nodules of leguminous plants ; crop-rotation.	
4. Lime and its products ; Chalk ; limeburning ; quick lime and slaked lime.	Action of water on quick-lime, action of carbon dioxide on lime water.
5. Hard water and soft water —methods of softening water.	Use of soaps in different kinds of water (before and after boiling).

E. LIVING BEINGS :

1. Outline of internal and external structure of toad or frog and of common fish	Demonstration of principal structure dissection.

F. THE HUMAN BODY :

1. Human blood ; the blood circulation, pumping action of the heart ; arteries ; capillaries ; veins ; feeling of pulse ; red and white corpuscles.	Charts on blood circulation. Demonstration of first aid in case of bleeding including use of tourniquet.
2. Digestive system of man ; mouth ; teeth ; tongue ; gullet ; stomach ; small intestine ; pancreas ; liver. Action of enzymes in aiding digestion.	Charts on digestive system.
3. Food ; source of energy for Man ; our food needs , balanced diet (protein, fat, carbohydrate, salt, water, vitamin, roughage).	

CLASS X

Objective : Same as in Class IX.

SOUND :	
Production by a vibrating body.	Vibrating tuning fork ; sonometer ; working of sound box of gramophone.
Material medium necessary for transmission of sound.	Demonstration with vacuum pump and bell.
Reflection, echoes.	
How we hear : the human ear.	Demonstration of model of the ear.
ELECTRICITY :	
Electric current and voltaic cell : idea of electric potential (compare with waterfall).	Working of simple volatic cell.
Effects of electric current : magnetic, heating, chemical : Electric bell	Construction of electromagnet, assembling an electric bell ; electrolysis.
Idea of intensity (like flow of water per unit time something pushed). Idea of resistance (compare flow of water through pipe : pipe offers resistance to flow).	
Interaction of electricity and magnetism.	Simple experiments to show action of magnet on current and current on magnet.
Electromagnetic induction (Faraday).	Experiments on electromagnetic induction.
Daniel Cell, Leclanche Cell and Lead accumulators. (No explanation of chemical reaction required).	Handling of Daniel cell and Leclanche cell (dry and wet) and lead accumulator.
Electricity as energy . Motors, Heating and lighting ; Electric lamps.	Working models ; handling an electric iron, stove and heater ; study of a fan regulator.
Electricity for communication : telegraph, telephone.	Model of telegraph.

C. METALS :

1. Study of the natural occurrence and properties and uses of the following metals and alloys: iron, copper, aluminium, zinc, steel, brass, bell metal. (Details of methods of extraction not required).

D. LIVING BEINGS

1. Elementary idea about structure and life history of amoeba, spirogyra (algae) yeast and fern.

Demonstration by charts and specimens.

E. GENERAL IDEAS ABOUT :

1. (a) Evolution, (b) Heredity, (c) Adaptation.

Demonsration by charts.

F. COMMON DISEASES AND EPIDEMICS :

Brief and elementary statement of main symptoms, causes, treatment and prevention in each case.

Demonstration by charts.

(i) Air-borne diseases : Common cold, influenza.

(ii) Water-borne diseases : Cholera, typhoid, dysentery.

(iii) Insect-borne diseases : Malaria, Plague.

(iv) Diseases by contact : Ring-warm, scabies.

প্রথম খণ্ড

[নবম শ্রেণীর পাঠ্যাংশ]

বলবিদ্যা (Mechanics)

প্রথম অধ্যায়

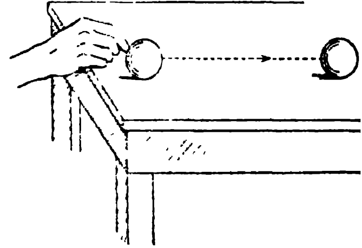
কার্য করা কঠিন হয় কেন

(What makes work hard ?)

ওজন (weight), ঘর্ষণ (Friction) ও জাড্য (Inertia)

1. **বলবিদ্যা :** বস্তুর স্থিতি ও গতির অবস্থা ও কার্যকারণ যে শাস্ত্রে আলোচিত হয় উহাকে 'বলবিদ্যা' (Mechanics) বলে।

2. **বল** (Force) : টেবিলের উপর একটি মার্বেল স্থির অবস্থায় রহিয়াছে। আঙুলের ডগা দিয়া টোকা দিলে উহা গড়াইয়া গেল অর্থাৎ উহা গতিশীল হইল এবং আঙুল হইতে দূরে সরিয়া গেল (চিত্র 1)। ধরিলাম টেবিলের উপরে একখানি ভারী পুস্তক রহিয়াছে। আঙুলের ডগা দিয়া ধাক্কা দিলে উহাকে নড়ানো যাইবে না। এখানে পুস্তকটির পরিবর্তন করিবার চেষ্টা করা হইল কিন্তু কার্যকরী করা হইল না। এইবার জোরে ধাক্কা দিলে পুস্তকটি সরিয়া গেল।



চিত্র 1
বলে বল প্রয়োগ করিতেছে

খানিকটা উপর হইতে একটি পাথর ছাড়িয়া দেওয়া হইল। পৃথিবীর আকর্ষণে উহা নিচের দিকে ক্রমবর্ধমান গতিতে পতিত হইল। আবার একটি পাথরকে ভূপৃষ্ঠ হইতে খানিকটা উঁচুতে তোলা হইল। এখানে পাথরটি গতিশীল হইল।

এই সকল দৃষ্টান্ত হইতে দেখা যায় যে, যে কারণ কোন বস্তুর স্থির বা নিশ্চল অবস্থান অথবা স্থির গতির পরিবর্তন করে বা করিবার চেষ্টা করে তাহাই **'বল'** (force)। বলের অর্থ কোন টান বা ধাক্কা।

3. কার্য (Work): কোন বস্তুর উপর বল প্রয়োগ করিলে এবং উহা প্রযুক্ত বলের দিকে সরিলে বলা হয় বল কার্য করিয়াছে। কিন্তু বস্তুটি প্রযুক্ত বলের বিপরীত দিকে সরিলে বলের বিরুদ্ধে কার্য করিয়াছে বলা হয়।



চিত্র 2
বালতি করিয়া জল উঠাইতেছে

মজুর ইট মাথায় করিয়া উপরে তুলিতেছে, কুলীরা মোট বহন করিতেছে, ঘোড়ায় গাড়ি টানিতেছে, মাঝি দাঁড় টানিতেছে, একটি মানুষ হাতুড়ি দিয়া খোয়া ভাঙ্গিতেছে, একটি মজুর মাটি কাটিতেছে, গাধা পিঠে করিয়া কাপড়ের বোঝা বহন করিতেছে, লোকে বাল্‌তি করিয়া জল উঠাইতেছে (চিত্র 2)। এই সকল দৃষ্টান্তে দেখা যায় যে, বল প্রয়োগে বস্তু এক স্থান হইতে অন্য স্থানে সরিয়া যায়।

এখানে মজুর, কুলী, ঘোড়া, মাঝি, মানুষ সবাই কার্য করে। প্রত্যেক ক্ষেত্রে বলের অভিমুখে বস্তু সরিয়া যায়। কিন্তু বল প্রয়োগ করিলে যদি বস্তু না সরে তাহা হইলে বুঝিতে হইবে বস্তুর উপর প্রযুক্ত বল কোন কায করে না। মজুর যখন ইট উপরে তোলে তখন সে পৃথিবীর আকর্ষণের বিরুদ্ধে কায করে, কারণ ইট প্রযুক্ত বলের ক্রিয়ামুখের বিপরীত দিকে সরিয়া যায়।

কার্যের পরিমাণ সর্বদাই প্রযুক্ত বল (force) ও ঐ বলের দিক বরাবর সরণের (displacement) গুণফলের সমান হয়।

অর্থাৎ, কার্যের মাপ = প্রযুক্ত বল × বলের প্রয়োগ বিন্দু হইতে বস্তুর সরণ।
∴ $W = P \times S$. এখানে W = কার্যের মাপ ; P = প্রযুক্ত বল এবং S = বস্তুর সরণ।

এই সূত্র হইতে দেখা যায় যে, বস্তুর উপর বল প্রযুক্ত হইলে যদি কোনরূপ সরণ না হয় তাহা হইলে কোন কার্য করা হয় না (no movement, no work)।

মানুষ ও প্রাণী সর্বদাই কার্য করিতেছে। আমাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সব সময়েই স্থির নহে। আমরা যখন কোন বস্তু মাটি হইতে তুলি তখন আমরা বাহুপেশীর (muscle) শক্তির সাহায্যে বস্তুর উপর বলপ্রয়োগ করি। এমন কি নিদ্রিত অবস্থাতেও আমাদের হৃৎপিণ্ড, ফুসফুস স্থির থাকে না—তাহারা অবিরাম কার্য

করিয়া চলে। কথা বলিলে, চলাফেরা করিলে, আহার করিলে, গান করিলেও কার্য করা হয়। আমাদের মতন অন্য প্রাণীরাও কার্য করে। মৌমাছি মধু আহরণ করে, পিপীলিকা খাদ্য সংগ্রহ করে; গরু ছাগল ঘাস খাইবার জন্য মাঠে চরিয়া বেড়ায়; মাছ জলে সাঁতার কাটে অর্থাৎ প্রাণী মাত্রই কিছু না কিছু কার্য করে।

4. কার্য করা কঠিন হয় কেন (What makes work hard)?—ওজন (Weight), ঘর্ষণ (Friction) ও জাড্য (Inertia): কোন কার্য করিতে আমাদের বেশী পরিশ্রম হয় ও আমরা কষ্ট বোধ করি কেন? একটু চিন্তা করিলেই আমরা দেখিতে পাইব যে কার্য করিতে হইলে আমাদের কোন না কোন বাধা অতিক্রম করিতে হয়। এই বাধা বা প্রতিবন্ধকের জন্যই কার্য করিতে কষ্ট বোধ হয়। বাধা তিন প্রকার—**অভিকর্ষ** (gravity), **ঘর্ষণ** (friction), **জাড্য** (inertia)।

5. ওজন (weight) এবং অভিকর্ষ (gravity): একটি বলকে হাতে রাখিলে বেশ ভারী লাগে। এইরূপ ভারী লাগিবার কারণ কি? পৃথিবীর নিকটবর্তী সকল বস্তুকে পৃথিবী নিজের কেন্দ্রের দিকে আকর্ষণ করে। পৃথিবীর এই আকর্ষণকে **অভিকর্ষ** (gravity) বলে। যে বলে পৃথিবী কোন বস্তুকে নিজের কেন্দ্রের দিকে আকর্ষণ করে তাহাই বস্তুর ওজন বা ভার। বস্তুর মধ্যে যতটুকু পদার্থ আছে তাহাই উহার **ভর**। যে বস্তুর ভর যত বেশী তাহার উপর পৃথিবীর আকর্ষণও তত বেশী ও বস্তুও তত ভারী হয়। সুতরাং বস্তু যত ভারী হইবে, তাকে উপর দিকে উঠাইতে তত কষ্ট হইবে। যেখানে পৃথিবীর আকর্ষণ নাই সেখানে বস্তুর ওজনও নাই। সুতরাং পৃথিবীর সর্বত্র বস্তুর ভর নির্দিষ্ট কিন্তু ওজন নির্দিষ্ট নয়। পৃথিবীর বিভিন্ন স্থলে বস্তুর ওজনও বিভিন্ন। পৃথিবীর অভিকর্ষের বিরুদ্ধে কোন বস্তুকে তুলিতে গেলে পরিশ্রম করিতে হয় ও কষ্ট হয়। এখানে পৃথিবীর অভিকর্ষ কার্যের বাধা স্বরূপ। একটি ঢিল সজোরে ছুঁড়িলেও আকাশপথে খুব বেশী দূর যাইতে পারে না, কিছুদূর যাইয়া পৃথিবীর অভিকর্ষের টানে মাটিতে পড়িয়া যায়। কামানের গোলাও বেশ কিছুদূর যাইয়া মাটিতে পড়িয়া যাইতে বাধ্য হয়। অভিকর্ষ-শক্তি ক্রিয়া না করিলে বস্তু মাটিতে না পড়িয়া গতিশীল বস্তু অনন্তকাল ধরিয়া মহাশূন্যে চলিতে থাকিত। কোনও ফল গাছ হইতে মাটিতে পড়িত না। মানুষ মাটি হইতে উচ্চ লম্ফ দিলে মাটিতে আর নামিতে না পারিয়া আকাশেই উঠিয়া যাইত।

6. (Friction): একটি বলকে মসৃণ মেঝের উপর গড়াইয়া দিলে যতদূর যাইয়া থামিবে, অমসৃণ মেঝের উপর বা মাটিতে গড়াইয়া দিলে পূর্বাপেক্ষা কম দূর যাইয়া থামিবে। ঠেলা গাড়ির চালককে মাটির বা উঁচুনীচু ইট দেওয়া রাস্তায় গাড়ি ঠেলিয়া লইয়া যাইতে যত পরিশ্রম করিতে হয়, পীচ দেওয়া সমান রাস্তায় তত পরিশ্রম করিতে হয় না। আবার গাড়ির চাকা কাঠের না হইয়া যদি উহা রবারের বেড় লাগান থাকে তাহা হইলে চালককে বেশী পরিশ্রম করিতে হয় না। **ঘর্ষণ** প্রতিরোধ ইহার কারণ। এই ঘর্ষণ প্রতিরোধকে চলনের **বিপরীতমুখী** একটি ক্রিয়াশীল বল বলিয়া মনে করা হয়।

একটি কঠিন বস্তুকে অপর একটি কঠিন বস্তুর উপর দিয়া চালাইতে গেলে ঘর্ষণ হয় এবং ইহার ফলে ঐ গতি একপ্রকার বাধার সম্মুখীন হয়। এই প্রকার বাধা বা প্রতিরোধ বলকেই **ঘর্ষণ** বলে। এই বাধাই কোন গতিশীল পদার্থের গতিকে কমাইয়া দেয় বা তাহাকে গতিশূন্য করে। এই ঘর্ষণের মাত্রা কঠিন পদার্থের তলের মসৃণতার উপর নির্ভর করে, কেননা তলের অমসৃণতাই ঘর্ষণ-বলের কারণ। কঠিন পদার্থের তলদেশ যত মসৃণ হয় ঘর্ষণ-বলের উদ্ভব তত কম হয়। জলে নৌকা চলিলে জল নৌকার গতিপথে ঘর্ষণজনিত বাধার সৃষ্টি করে। শূন্যে বিমান চলিবার সময় বায়ুর সহিত ঘর্ষণজনিত বাধার সৃষ্টি হয়। গাড়ী বা যন্ত্রের চাকা ঘুরিবার সময় অক্ষদণ্ডের (axle) সহিত চাকার ঘর্ষণ হয়, ইহার ফলে চাকার গতি ক্রমশঃ কমিয়া আসিতে থাকে। বরফের ঘর্ষণ-বল খুবই কম বলিয়া বরফের উপর চলিলে পা পিছলাইয়া যায়।

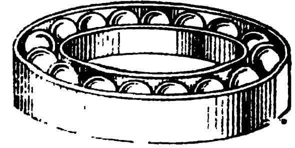
ঘর্ষণের উপকারিতা: ঘর্ষণজনিত বলের উদ্ভব না হইলে আমরা হাঁটিতে পারিতাম না, সকলেই পিছলাইয়া পড়িয়া যাইতাম; পা ও মাটির স্পর্শতলে পায়ের গতিরোধক ঘর্ষণ-বল ইহা রোধ করে। কাঠে পেরেক বা স্ক্রু লাগিত না, বাহির হইয়া আসিত। মাটির উপর মই দাঁড় করাইয়া রাখা যাইত না, মইও অমসৃণ মাটির ঘর্ষণজনিত বাধার জন্য স্খলিত হইতে পারে না। ইঞ্জিন রেলের উপর দিয়া গাড়ি টানিয়া লইয়া যাইতে পারিত না, গাড়ির চাকা সর্বদাই স্খলিত হইত।

সুতরাং দেখা যায় যে ঘর্ষণ-জনিত বাধারও প্রয়োজন আছে।

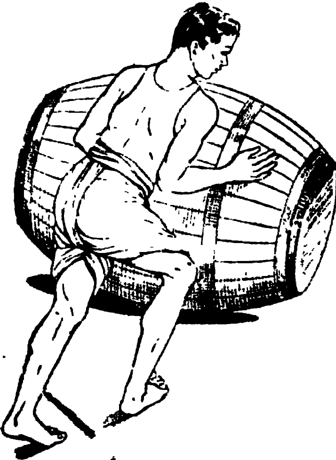
ঘর্ষণের অপকারিতা: ঘর্ষণের জন্য নানান অসুবিধারও সম্মুখীন হইতে হয়। বিশেষ করিয়া বিভিন্ন যন্ত্রপাতিতে এই ঘর্ষণ বিশেষ অসুবিধাজনক। ঘর্ষণ বস্তুর আপেক্ষিক গতি কমাইয়া দেয়, ফলে গতিশীল বস্তুর যান্ত্রিক শক্তি কিছু নষ্ট হয়।

ঘর্ষণ কমাইবার উপায়ঃ ঘর্ষণ কমাইবার জন্য দুইটি ঘর্ষণশীল কঠিন পৃষ্ঠের মধ্যে তৈল বা চর্বি মাখান হয়। আধুনিক যন্ত্রপাতিতে স্লিভ বিয়ারিং (sleeve-bearing)-এর পরিবর্তে বল বিয়ারিং (ball bearing) ব্যবহার করা হয়। বাই সাইকেলের চাকার অক্ষের চারিদিকে স্টীলের বল (ball bearing) রাখা হয় এবং তাহাতে উপস্নেহন তৈল (lubricating oil) দিয়া ঘর্ষণ কমান হয়। ঘর্ষণ বাড়াইবার জন্য মোটর গাড়ির চাকায় খাঁজ কাটা থাকে। বৃষ্টির পর পিছল হইতে রক্ষা পাইবার জন্য বালি ছড়াইয়া দেওয়া হয়। ইহাতে ঘর্ষণ বাড়িয়া যায়।

7. জাড্য (Inertia): নিউটন গতি-বিষয়ক তিনটি মহামূল্যবান সূত্র আবিষ্কার করিয়া-ছিলেন। নিউটনের প্রথম সূত্র বলে, বাহির হইতে প্রযুক্ত বলদ্বারা অবস্থার পরিবর্তন করিতে বাধ্য না করিলে অচলবস্তু অচল অবস্থাতেই থাকিবে এবং সচল বস্তু সমবেগে সরলরেখা অবলম্বন করিয়া চিরকাল চলিতে থাকিবে। এই সূত্রটিকে দুইটি অংশে ভাগ করা যায়। প্রথম



চিত্র 3
বলবিয়ারিংযুক্ত যন্ত্র।



চিত্র 4
পিপার স্থির জাড্যের জন্য পিপাকে স্থির অবস্থা হইতে চালাইতে কষ্ট বোধ হইতেছে।



চিত্র 5
পিপাটি গতিশীল হওয়াতে সহজেই উহাকে ঠেলিয়া লইয়া যাওয়া যায়।

অংশ **জাড্যসূত্র** (law of Inertia) এবং দ্বিতীয় অংশ **বলের সংজ্ঞা** নির্দেশ করে। প্রথম অংশ বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে কোন বস্তুর স্থিতি বা গতি

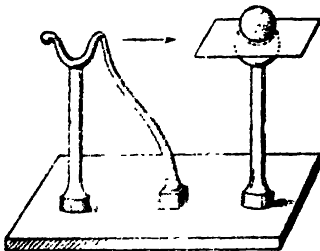
পরিবর্তন করা বা করিবার চেষ্টা করার ক্ষমতা নাই। পদার্থ মাত্রই জড়তা-প্রবণ। বাহির হইতে কোন বল ইহার উপর প্রযুক্ত না হইলে স্থির বস্তু আপনা আপনি সচল বা সচল বস্তু আপনা হইতেই থামিয়া যাইতে পারে না। স্থির বস্তুকে চালাইতে হইলে কিংবা গতিশীল অবস্থায় বস্তুকে থামাইতে বেশী কার্য করিতে হয় অর্থাৎ শক্তি খরচ করিতে হয়। একটি স্থির তৈল ভরা পিপাকে গড়াইয়া লইয়া যাইতে হইলে প্রথমে যত বল প্রয়োগ করিতে হয় (চিত্র 4) একবার গড়াইতে আরম্ভ করিলে আর তত বল প্রয়োগ করিতে হয় না, গড়াইয়া চলে (চিত্র 5)। কিন্তু ঐ গতিশীল পিপাকে থামাইতে হইলে গতির বিপরীত দিকে অধিক চাপ প্রয়োগ করিতে হয়। পদার্থের জাড্যের জন্য এইরূপ হয়।

জাড্যকে দুইভাগে ভাগ করা যাইতে পারে। যথা: (1) **স্থিতি-জাড্য** (Inertia of rest) ও (2) **গতি-জাড্য** (Inertia of motion)।

স্থিতি জাড্যের উদাহরণ:

(1) টেবিলের উপর একটি বল আছে। উহা ঐ ভাবে একই স্থানে থাকিবে যতক্ষণ পর্যন্ত না উহাকে কেহ উঠাইয়া লয় বা ধাক্কা দেয় অর্থাৎ বাহিক কোন বল উহার উপর প্রয়োগ না করিলে বলটি হঠাৎ চলিতে আরম্ভ করে না বা স্থান পরিবর্তন করিতে পারে না।

(2) স্থির অবস্থা হইতে হঠাৎ যখন কোন যাত্রীসহ গাড়ি চলিতে শুরু করে তখন প্রত্যেক যাত্রীই (বসিয়া বা দাঁড়াইয়া থাকাকালীন) পিছন দিকে হেলিয়া পড়ে। গাড়ি পূর্বে স্থির থাকার জন্য যাত্রীর দেহও স্থির অবস্থায় ছিল। কিন্তু ছাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে যাত্রীর গাড়িসংলগ্ন দেহের নিম্নাংশ গাড়ির গতি প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ গতিশীল হয়, কিন্তু ঊর্ধ্বাংশ স্থিতি-জাড্যের জন্য নিজেকে স্থির রাখিবার চেষ্টা করে। এইরূপ অবস্থায় দুটি ছবিতে যাত্রী পিছন দিকে হেলিয়া পড়ে।


চিত্র 6
স্থিতি জাড্য

(3) একটি খাড়া দণ্ডের মাথায় একটি বাটি বসানো আছে (চিত্র 6)। বাটির উপর একটি শক্ত কাগজখণ্ড রাখা হইল। কাগজটির উপর একটি বল রাখা হইল। একটি হুকের সহিত একটি ধাতব স্প্রিং লাগানো থাকে। এখন স্প্রিংটিকে ছাড়িয়া দিলে উহা

ছুটিয়া গিয়া কাগজ খণ্ডকে সজোরে আঘাত করে এবং ইহা ছিটকাইয়া পড়িয়া যায় কিন্তু বলটিকে বাটির ভিতর পড়িয়া থাকিতে দেখা যায়। উহা বাহিরে চলিয়া যায় না। বস্তুর স্থিতি-জাড্যের জন্যই এইরূপ হয়।

(4) জানালার কাচে একটি গুলি ছুঁড়িয়া মারিলে কাচ ভাঙ্গিয়া টুকরা টুকরা হইয়া যায় এবং কাচের গায়ে বহু ফাটল চিহ্ন দেখা যায় কিন্তু দূর হইতে বন্দুকের গুলি খুব বেগে কাচের গায়ে আঘাত করিলে কাচের স্থিতি জাড্যের জন্য গায়ে কেবল গুলির পরিধির সমান একটি গর্ত বা ছিদ্র দেখা যায় কিন্তু চারিদিকে কোন ফাটল দেখা যায় না।

গতিজাড্যের উদাহরণ: (1) খেলায় লাফ দিবার পূর্বে খেলোয়াড় প্রথমে কিছুদূর দৌড়াইয়া আসে এবং পেশীকে গতি-সম্পন্ন করে। তাহার গতিজাড্য তাহাকে লাফাইতে সহায়তা করে।

(2) চলন্ত গাড়িতে থাকাকালীন আরোহীর সমস্ত দেহই গতিশীল ও গাড়ির বেগ সম্পন্ন হয়। চলন্ত গাড়ি যদি হঠাৎ থামিয়া যায় দণ্ডায়মান যাত্রীরা সম্মুখের দিকে ঝুঁকিয়া পড়ে। আরোহীর দেহের নিম্নাংশ গাড়ির সঙ্গে সঙ্গেই নিশ্চল হয় কিন্তু ঊর্ধ্বাংশ গতি-জাড্যের জন্য গতি বজায় রাখিতে চেষ্টা করে। ইহার ফলে আরোহী সামনের দিকে ঝুঁকিয়া পড়ে।

(3) চলন্ত গাড়ি হইতে উপর দিকে লম্বভাবে (vertically) নিক্ষিপ্ত বল গতিজাড্যের জন্য পুনরায় নিক্ষেপকারীর হাতে আসিয়া পড়ে। উপর দিকে লম্বভাবে নির্দিষ্ট গতিতে বলটি নিক্ষিপ্ত হইলেও তাহার আড়াআড়ি (horizontal) বেগ কোন সময়েই নষ্ট হয় না। তাই বলটি হাতেই ফিরিয়া আসে।

(4) চলন্ত বাস বা ট্রাম থামিবার সময় উহার গতি কমিতে থাকে। তখন অনেক যাত্রীকে অসতর্কভাবে গাড়ি হইতে লাফাইয়া নামিয়া পড়িতে দেখা যায়। ইহার ফলে তাল সামলাইতে না পারিয়া যাত্রী সামনের দিকে উপুড় হইয়া পড়িয়া যায়। ইহা গতি-জাড্যের উদাহরণ। লাফাইবার সময় আরোহীর দেহের গতির বেগ, বেগবান গাড়ির বেগের সমান থাকে। কিন্তু মাটিতে পা দিবার সঙ্গে সঙ্গে তাহার দেহের নিম্নাংশের গতি হঠাৎ বন্ধ হইয়া যায়। গতি-জাড্যের জন্য দেহের ঊর্ধ্বাংশের গতি বজায় রাখিতে চেষ্টা করে। ইহার ফলে, আরোহী সামনের দিকে ঝুঁকিয়া পড়ে বা উপুড় হইয়া পড়িয়া যায়।

নিউটনের দ্বিতীয় গতিসূত্র: কোন বস্তুর ভর-বেগ পরিবর্তনের হার উহার উপর প্রযুক্ত বলের সমানুপাতিক এবং বল যে দিকে ক্রিয়া করে ভর-বেগের

পরিবর্তন সেই দিকে ঘটে। যদি P = প্রযুক্ত বল, m = বস্তুর ভর, f = ত্বরণ হয়, তাহা হইলে প্রমাণ করা যায় যে, $P = mf$.

তৃতীয় গতিসূত্র : প্রত্যেক ক্রিয়ার একটি সমান ও বিপরীত প্রতিক্রিয়া থাকে।

প্রশ্নাবলী

1. কার্য বলিতে কি বুঝ? কার্য করিতে কষ্ট হয় কেন?

2. ঘর্ষণ (friction) কাহাকে বলে? আমাদের দৈনন্দিন জীবনে ইহা কি অসুবিধার সৃষ্টি করে? ঘর্ষণ থাকায় আমাদের কি সুবিধা হয়? [স্কুল ফাইনাল ১৯৬৬]

3. কেন হয় বল :—

(i) পাকা ফল বোঁটা হইতে খসিয়া মাটিতে পড়ে, আকাশে উড়িয়া যায় না।

(ii) বাস হঠাৎ চলিতে আরম্ভ করিলে যাত্রী পশ্চাৎ দিকে হেলিয়া পড়ে।

(iii) ঊর্ধ্বে ঢিল ছুঁড়িলে উহার বেগ কমিতে শুরু করে।

(iv) জানালার কাচে বেগে গুলির আঘাত করিলে ফাটলহীন গর্ত হয়।

(v) চলন্ত গাড়ি হইতে অসাবধানে নামিবার সময় আমরা সম্মুখ দিকে হুমড়ি খাইয়া পড়িয়া যাই।

(vi) চলন্ত গাড়ি হইতে উপর দিকে বল নিক্ষেপ করিলে বল হাতেই ফিরিয়া আসে।

4. অভিকর্ষ কাহাকে বলে? অভিকর্ষ ও ঘর্ষণ-জনিত বাধার উপকারিতা কি? যন্ত্রের বিভিন্ন অংশের ঘর্ষণ কমাইবার জন্য কি ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়?

5. শূন্যস্থান পূরণ কর :—

(i) বিশ্বের ছোট বড় যাবতীয় পদার্থ একে অন্যকে — করে।

(ii) দুই বস্তুর মধ্যে দূরত্ব যত বাড়ে আকর্ষণ বল তত —।

(iii) পৃথিবী যে বলের দ্বারা সমস্ত পদার্থকে কেন্দ্রের দিকে আকর্ষণ করে তাহাকে — বলে।

(iv) বরফ মসৃণ বলিয়া উহার ঘর্ষণ-বল খুবই — থাকে।

(v) মসৃণ তল অপেক্ষা অমসৃণ তল — বাধা দেয়।

(vi) যাহার দ্বারা পদার্থের মধ্যে কোন প্রকার পরিবর্তন ঘটানো যায় তাহার নাম—।

দ্বিতীয় অধ্যায়

কার্যকে সহজ করিবার সাধারণ যন্ত্র বা কল

(Simple machines to make work easier)

8. Machine : আমরা লক্ষ্য করিয়াছি যে কার্য করিতে হইলে বাধার সম্মুখীন হইতে হয়। এইজন্য মানুষকে অনেক সময় কঠোর পরিশ্রম করিতে হয়। এই কষ্ট লাঘব করিবার জন্য মানুষ বুদ্ধিবলে নানা প্রকার যন্ত্র আবিষ্কার করিয়াছে, যাহাদের দ্বারা কার্য করা অনেক সহজ হইয়া পড়িয়াছে। যে ভার উত্তোলন করা এক জন বা কয়েকজন লোকের পক্ষেও সাধ্যাতীত সেই ভার যন্ত্রের সাহায্যে অনায়াসে একা খুব সহজেই উত্তোলন করিতে পারে।

যে জিনিস দ্বারা কৌশলে কার্য সাধন করা যায় তাহাকেই **যন্ত্র বা কল** (machine) বলে। যন্ত্র দ্বারা বাধা অতিক্রম করিবার জন্য উহার এক স্থানে কোন নির্দিষ্ট দিকে বল প্রয়োগ করিলে সুবিধামত অন্য এক স্থানে আবার এক দিকে সেই বল সরবরাহ করা হয় এবং তাহা সেই স্থানে কোন বাধা অতিক্রম করে। অল্প বল প্রয়োগ করিয়া বাধা অতিক্রম করাই যন্ত্রের উদ্দেশ্য। যে বল প্রয়োগ করা হয় তাহাকে চেষ্টা (effort) এবং যে বাধা অতিক্রম করা হয়, তাহাকে বাধা (resistance) বা ভার বা ওজন (load or weight) বলে।

কুয়া হইতে সোজা দড়ি দ্বারা জল তুলিতে সুবিধা হয়, না কপিকলের সাহায্যে তুলিলে অধিক সুবিধা হয়? সহজেই বুঝা যায় যে কপিকলের সাহায্যে তুলিলে অনেক সুবিধা হয়। জলপূর্ণ বালতির ওজন হইল বাধা, আর দড়ির টান হইল চেষ্টা।

দুইতলা বাড়ীর উপরে ঘুরানো সিঁড়ির দ্বারা উঠিতে সুবিধা বোধ হয়, না খাড়াই সিঁড়িতে উঠা সুবিধাজনক বোধ হয়? নিশ্চয়ই ঘুরানো বা বেশী কাত করা সিঁড়ি বাহিয়া উঠা সুবিধাজনক।

9. যান্ত্রিক সুবিধা (Mechanical advantage): অনেক যন্ত্র আছে যেগুলির সাহায্যে আমরা সাধারণতঃ কম বল প্রয়োগ করিয়া বেশী বাধা অতিক্রম করিতে পারি। যন্ত্র দ্বারা আমরা যে সুবিধা পাই তাহাকেই **যান্ত্রিক সুবিধা** (mechanical advantage) বলে।

$$\text{যান্ত্রিক সুবিধা} = \frac{\text{ভার}}{\text{চেষ্টা বা প্রযুক্ত বল}} = \frac{W}{P}$$

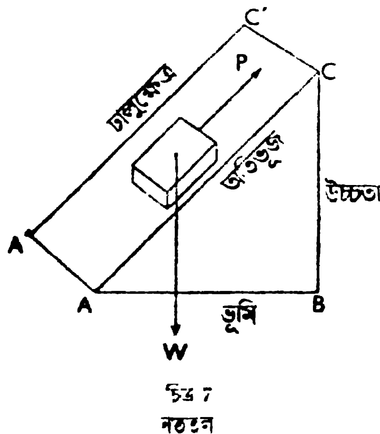
(এখানে W = ভার, P = চেষ্টা)।

সাধারণভাবে বলিতে গেলে যান্ত্রিক সুবিধার সংজ্ঞা এই ভাবে বলাই ভাল। কোন যন্ত্রে চেষ্টা ও ভারসাম্য অবস্থান থাকিলে, ভার ও চেষ্টার অনুপাতকে যান্ত্রিক সুবিধা বলা হয়। অধিকাংশ যন্ত্র এরূপ কৌশল অবলম্বন করিয়া তৈয়ারী করা হয় যে প্রযুক্ত বল উত্তোলিত অর্থাৎ অতিক্রান্ত বাধা অপেক্ষা কম। সেই সব ক্ষেত্রে যান্ত্রিক সুবিধার মান 1 হইতে বেশী। কোন কোন যন্ত্রে (যেমন, একটি স্থির কপিকল) চেষ্টা ও বাধা পরস্পর সমান। আবার এমন যন্ত্র আছে যেখানে যান্ত্রিক সুবিধার পরিবর্তে অসুবিধাই হয় বলা যাইতে পারে। সেইরূপ ক্ষেত্রে চেষ্টা, বাধা অপেক্ষা বেশী (যেমন, চিম্‌টা প্রভৃতি)।

10. **সহজ যন্ত্র** নিম্নলিখিত ছয়টি ভাগে ভাগ করা যাইতে পারে :—

(1) নততল (Inclined plane) (2) লিভার (Lever) ; (3) কপিকল (Pulley) ; (4) চাকা ও অক্ষদণ্ড (Wheel and Axle) ; (5) স্ক্রু (Screw) ; (6) কীল (Wedge)।

11. **নততল (Inclined plane):** একটি দৃঢ় মসৃণ সমতল অনুভূমিক তলের সহিত যে কোন কোণে নত থাকিলে **নততল** বলে। ইহার সাহায্যে ভারী বস্তুকে সামান্য চেষ্টার প্রয়োগ দ্বারা উপরে তুলিতে পারা যায়। যে কোন ঢালু জায়গা নততলের কাজ করে। $ACC'A'$ (চিত্র 7) একটি ঢালু তল, অনুভূমিক রেখা AB-এর সহিত CAB কোণে অবস্থিত আছে। P বল, W ভারের উপর তলের সমান্তরাল বরাবর প্রয়োগ করিয়া তাহাকে তলের নীচে A বিন্দু হইতে তলের উপর C বিন্দু পর্যন্ত সমবেগে টানিয়া তোলা হইল, অর্থাৎ P-এর প্রয়োগ বিন্দু AC দূরত্ব অতিক্রম করিল।



চিত্র 7
নততল

সুতরাং কাজের পরিমাণ = প্রযুক্ত বল × দূরত্ব = $P \times AC$.

W ভারকে অভিকর্ষ বলের বিরুদ্ধে উল্লম্ব ঊর্ধ্বমুখী BC দূরত্ব তোলা হইল।

[কার্যের পরিমাণ = $W \times BC$]

সুতরাং ঘর্ষণ বাধা উপেক্ষা করিলে, কার্যনীতি অনুসারে P-এর কাজ

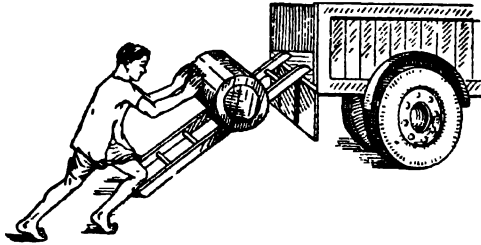
= উল্লম্ব ঊর্ধ্বমুখে W ভারকে উত্তোলনের কাজ

অর্থাৎ, $P \times AC = W \times BC$

$$\therefore \text{ যান্ত্রিক সুবিধা} = \frac{W}{P} = \frac{AC}{BC},$$

চিত্রে, AC, BC অপেক্ষা সর্বদাই বড়। সুতরাং AC-কে ইচ্ছামত বড় এবং BC-কে ছোট করিয়া যান্ত্রিক সুবিধা বাড়ান যায়। অর্থাৎ কম বল প্রয়োগ করিয়া অধিক ওজন তোলা যায়। দৈর্ঘ্য AC, উচ্চতা BC অপেক্ষা দ্বিগুণ হইলে যান্ত্রিক সুবিধা $\frac{2BC}{BC} = 2$ হইবে অর্থাৎ প্রযুক্ত বলের দ্বিগুণ ভার তোলা সম্ভবপর হইবে। ঢালু বেশী হইলে যান্ত্রিক সুবিধা বেশী হয়।

মালগাড়ি বা লরী হইতে দৃঢ় তক্তা ফেলিয়া দিয়া ভারী জিনিস তুলিতে প্রায়ই দেখা যায় (চিত্র 8)। অতীতকালে যখন কপিকল আবিষ্কৃত হয় নাই তখন সুউচ্চ



চিত্র 8
তক্তা ফেলিয়া ভারী জিনিস তুলিতেছে

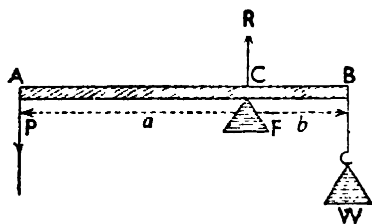
স্থানে ভারী বস্তু তুলিবার জন্য নততলের সাহায্য লওয়া হইত। যেমন মিসরের উচ্চ পিরামিড ও আরও বহু সুউচ্চ মন্দির তৈয়ারী করিতে নততলের সাহায্যে ভারী প্রস্তরখণ্ডকে উচ্চ স্থানে তোলা হইত। বহুতলাযুক্ত উচ্চ গৃহে উঠিবার জন্য ঘোরানো সিঁড়ি এই নততল পদ্ধতিতে নির্মিত হয়।

12. **লিভার (Lever):** লিভার একটি শক্ত (অনমনীয়) সরল অথবা বাঁকান দণ্ড যাহা দৃঢ়সংলগ্ন একটি স্থির বিন্দুর চারিদিকে ঘুরিতে পারে। স্থির বিন্দুকে **আলম্ব** (Fulcrum) বলে। লিভারের একস্থানে **বল বা চেষ্টা** (power or effort) প্রয়োগ করা হয় এবং আর এক স্থানে **ভার বা বাধার** (weight or resistance) কাজ করিবার ব্যবস্থা থাকে। আলম্ব হইতে চেষ্টা ও বাধার অভিলম্ব দূরত্বকে লিভারের **বাহু** (arms) বলে। ওজন করিবার দাঁড়িপাল্লা একটি লিভার।

আলম্ব, চেষ্টা ও ভারের পারস্পরিক অবস্থান অনুযায়ী লিভারকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়।

(1) **প্রথম শ্রেণীর লিভার** (First class lever): এই শ্রেণীতে চেষ্টা ও ভারের মধ্যে আলম্ব অবস্থিত।

উদাহরণ:—ক্রোবার (crowbar) বা ভারী বস্তু কাত করিবার দণ্ড, পেরেক তুলিবার হাতুড়ি, মাটি কাঁটা কোদাল, কাঁচি, ঢেঁকি, মাল ওজন করিবার যন্ত্র (steelyard), পাম্প, সাঁড়াশী।



চিত্র 9

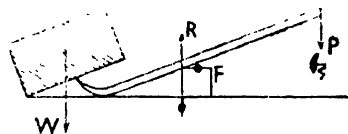
AB দণ্ডটি F আলম্বের চারিদিকে ঘুরিতে পারে (চিত্র 9)। A চেষ্টার (P) প্রয়োগ বিন্দু, C আলম্ব, R প্রতিক্রিয়া। B ওজনের (W) প্রয়োগ বিন্দু, CA এবং BC লিভারের দুই বাহু।

এখানে, $W.BC = P.AC$ অর্থাৎ

$W.b = P.a$

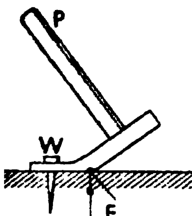
$$\therefore \frac{W}{P} = \frac{a}{b}$$

$\therefore$ যান্ত্রিক সুবিধা $= \frac{a}{b}$.

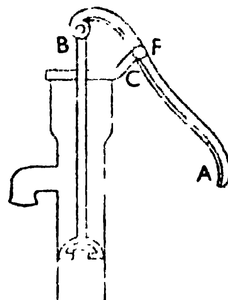


চিত্র 10
ক্রোবার (crowbar)

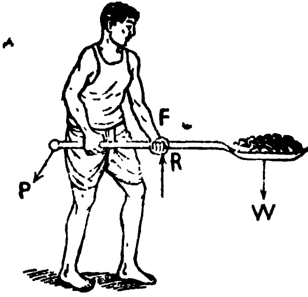
সুতরাং a বেশী হইলে কম বল প্রয়োগে বেশী ওজন তোলা সম্ভবপর।



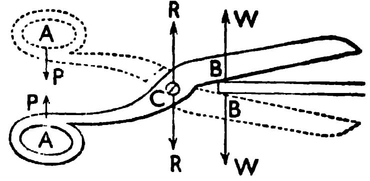
চিত্র 11
পেরেক তুলিবার হাতুড়ি



চিত্র 12
পাম্পের হাতল



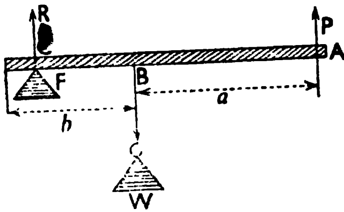
চিত্র 18
পোকার (poker)



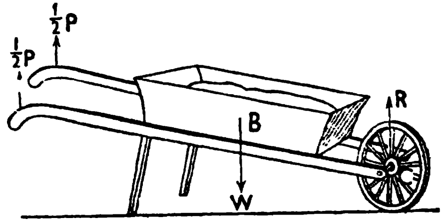
চিত্র 14
কাঁচি একটি যুক্ত লিভার।

(2) **দ্বিতীয় শ্রেণীর লিভার** (Second class lever): এই শ্রেণীতে আলম্ব (C) ও চেষ্টার (P) মধ্যে ভার W অবস্থিত চিত্র (15); ভার আলম্বের নিকটে ও চেষ্টা হইতে দূরে থাকে। এই শ্রেণীর লিভারে যান্ত্রিক সুবিধা একের চেয়ে বেশী; এবং ইহার সাহায্যে সব সময়েই কম বল প্রয়োগে বেশী ওজন উঠান সম্ভবপর।

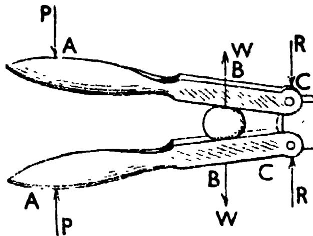
উদাহরণ:—হাতগাড়ি (Wheel-barrow), নৌকার দাঁড়, যাঁতি, নাট-ক্রাকার (nut-cracker)।



চিত্র 15

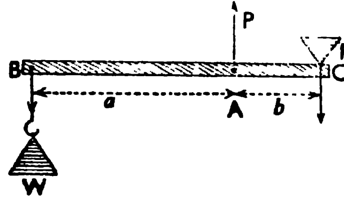


চিত্র 16
হাত গাড়ি (wheel-barrow)।

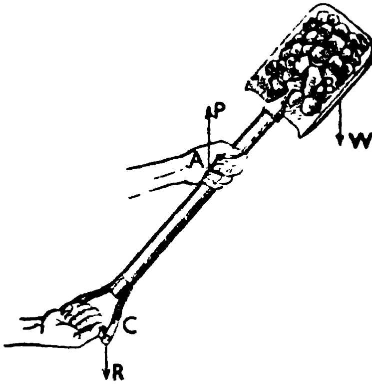


চিত্র 17
(নাট-ক্রাকার nut-cracker)।

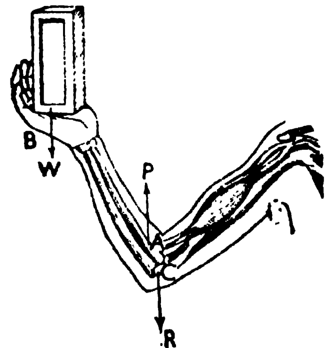
(3) **তৃতীয় শ্রেণীর লিভার** (Third class lever) : এই শ্রেণীতে আলম্ব (C) ও ভারের (W) মধ্যে চেষ্টা (P) অবস্থিত (চিত্র 18)। চেষ্টা আলম্বের নিকটে ও ভার হইতে দূরে অবস্থিত। এই শ্রেণীর লিভারে যান্ত্রিক সুবিধা একের চেয়ে কম অর্থাৎ সব সময়েই বেশী বল প্রয়োগ করিয়া কম ওজন উঠান সম্ভবপর হয়।



চিত্র 18



চিত্র 18a
বেলচা (shovel)।

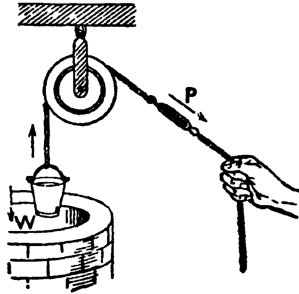


চিত্র 19
হাতের কনুই।

উদাহরণ :—সেলাইয়ের কলের পা-দান ও পিয়ানোর পা-দান ; কয়লা, ছাই, বালি, সুরকি প্রভৃতি দ্রব্য ভূমি হইতে তুলিবার জন্য বেলচা ; মানুষের হাতের কনুই (elbow) হইতে হাতের মুঠা পর্যন্ত সামনের বাহু (forearm), চিমটা প্রভৃতি তৃতীয় শ্রেণীর লিভারের উদাহরণ। ভারী জিনিস তুলিবার সময় আমাদের হাতের হাড় দণ্ডের কাজ, কনুই আলম্বের কাজ করে, এবং মুঠা হইতে কনুইএর মধ্যে পেশীর কুঞ্চনের (contraction) বল বলবিন্দুর ক্রিয়া করে। পেশীর এই সংকোচনের ফলে যে শক্তি উৎপন্ন হয় তাহাতে উহা ভারী ওজন তুলিতে পারে।

13. **কপিকল (Pulleys) :** কুয়া হইতে জল তুলিতে, থিয়েটারে সিন তুলিতে, বড় ল্যাম্প ঝুলাইতে কপিকলের সাহায্য লওয়া হয় (চিত্র 20) সাধারণ

কপিকলের ধাতুর বা কাঠের গোল চাকা, উহার মধ্যস্থানের অক্ষদণ্ডের চারিদিকে ঘুরিতে পারে। চাকা সমেত অক্ষদণ্ডটি আংটির (ring) সাহায্যে ঝুলান হয়। এই চাকার পরিধিতে খাঁজ কাটা (groove) থাকে। একটি সূতা চাকার উপর দিয়া ঘুরাইয়া একপ্রান্তে একটি ভারী জিনিস W-এর সঙ্গে আটকান থাকে এবং অপর প্রান্তে P বল (চেষ্টা) প্রয়োগ করিলে ভারী জিনিসটি অভিকর্ষের বিরুদ্ধে উপর দিকে টানিয়া তোলা হয়। এই যন্ত্র প্রথম শ্রেণীর লিভারের মত কার্য করে।



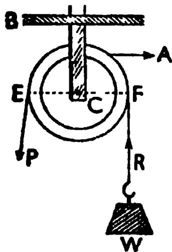
কপিকলের সাহায্যে কূপ হইতে জল তোলা হইতেছে

। চিত্রে A কাঠের, লোহার বা পিতলের চাকা, C অক্ষ, R দড়ি, B কাঠামো দেখানো হইয়াছে। P বল দ্বারা W ওজনকে তোলা হইতেছে।

∴ $W \times CF$ (চাকার ব্যাসার্ধ) $= P \times EC$ (চাকার ব্যাসার্ধ)

∴ $W = P$ অর্থাৎ ওজন = বল।

সুতরাং কপিকলে যান্ত্রিক সুবিধা $= \frac{\text{ওজন}}{\text{বল}} = \frac{W}{P} = 1$



চিত্র 21
একটি কপিকল।

ইহা হইতে বুঝা যায় যে কপিকলের সাহায্যে কম বল প্রয়োগ করিয়া ভারী জিনিস উঠান যায় না। কারণ ইহাতে যে পরিমাণ ওজন উঠাইতে হইবে সেই পরিমাণ বল প্রয়োগ করিতে হয়। তবুও কয়েকটি বিশেষ সুবিধার জন্য কপিকলের ব্যবহার করা হয়।

(1) সোজাসুজি কোন ভারী জিনিসকে টানিয়া না তুলিয়া কপিকলের সাহায্যে নিম্নদিকে বল প্রয়োগ করিয়া কম পরিশ্রমে তোলা হয়।

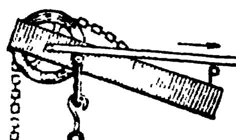
(2) দেহের সমস্ত ভার একসঙ্গে নীচের দিকে প্রয়োগ করা যায় এবং ইহা বল হিসাবে কার্য করে।

(3) মাটিতে বা নীচে দাঁড়াইয়া ভারী জিনিস তোলা যায়।

কপিকলের সাহায্যে যান্ত্রিক সুবিধা পাইতে হইলে একাধিক কপিকল বিভিন্ন ভাবে সাজাইয়া লইতে হয়। এইরূপ ক্ষেত্রে কপিকল গতিশীল (movable) হইতে পারে বা স্থিরও (fixed) থাকিতে পারে। একটি ভারবাহ ও গতিশীল এবং অপরটি আকর্ষক ও স্থির। উহা একটি শক্ত মজবুত কড়ির সঙ্গে আটকান থাকে (চিত্র 22)।

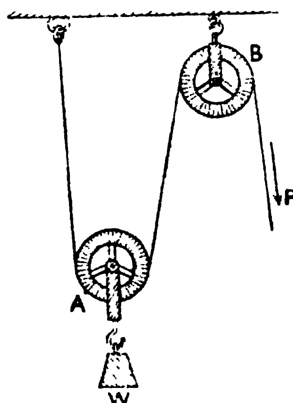
$$\text{যান্ত্রিক সুবিধা} = \frac{W}{P} = \frac{2P}{P} = 2$$

অর্থাৎ এইরূপ গতিশীল কপিকলের সাহায্যে বলের দ্বিগুণ ওজন তোলা যাইতে পারে।





চিত্র 22



চিত্র 22a

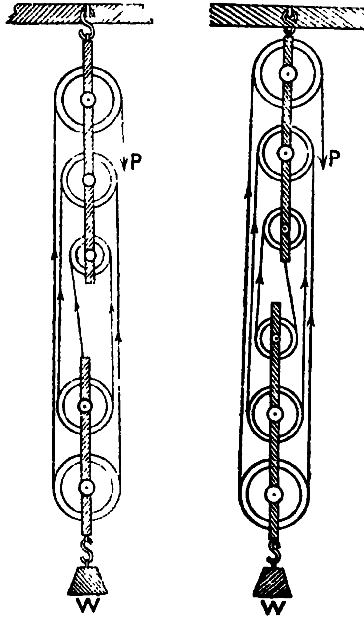
আবার দুইটি ব্লকে কয়েকটি কপিকল সাজাইয়া কম বল প্রয়োগ করিয়া বহুগুণ ওজন তোলা যাইতে পারে। কয়েকটি কপিকল পর পর সাজাইয়া একটি কাঠের ব্লকে আটকাইয়া একটি নির্দিষ্ট স্থান হইতে ঝোলাইয়া দেওয়া হয়। উহারই নীচে আবার একটি ব্লকে কয়েকটি কপিকল সাজান হয়। উপরের ব্লকটি স্থির থাকে এবং নীচের ব্লকটি কপিকল সহ চলমান থাকে। একই দড়ি সব কয়টি কপিকলের উপর দিয়া যায়।

নীচের ব্লকটির ওজন উপেক্ষা করিলে যান্ত্রিক সুবিধা হয় পুলির সংখ্যার সমান।

সুতরাং, যদি কপিকলের সংখ্যা n হয়, তাহা হইলে,

$$\text{যান্ত্রিক সুবিধা} = \frac{W}{P} = n \text{ হইবে।}$$

যদি কপিকলের সংখ্যা 6 হয়, তাহা হইলে 1 কিলোগ্রাম বল প্রয়োগ করিয়া 6 কিলোগ্রাম ওজন তোলা যাইতে পারিবে (চিত্র 23)।



চিত্র 23

কয়েকটি কপিকলের সাহায্যে কাজ করা সহজ।

প্রশ্নাবলী

1. যন্ত্র কাহাকে বলে? কয়েকটি যন্ত্রের নাম কর।

2. নততল কাহাকে বলে? নততলের কার্যপ্রণালী বুঝাইয়া দাও। নততলের উপকারিতা কি?

3. লিভার কাহাকে বলে? উহা কয় প্রকার? প্রত্যেক প্রকারের দৃষ্টান্তসহ বর্ণনা দাও।

4. কপিকল কাহাকে বলে? কপিকল দিয়া আমরা কি উপকার পাই? স্থির কপিকলের কার্যপ্রণালী বর্ণনা কর।

5. নিম্নলিখিত যন্ত্রগুলি কোন্ শ্রেণীর লিভারের অন্তর্ভুক্ত কারণ-সহ উল্লেখ কর:—

(i) মানব-বাহু; (ii) দাঁড়িপাল্লা; (iii) কাঁচি; (iv) যাঁতি; (v) সাঁড়াশী; (vi) চলন্ত নৌকার দাঁড়; (vii) ঢেঁকি; (viii) এক চাকার গাড়ী; (ix) কয়লা তোলার পোকার।

তৃতীয় অধ্যায়

মহাকর্ষ, নিউটনের মহাকর্ষের সূত্র, চন্দ্র ও কৃত্রিম উপগ্রহের গতি, জোয়ার ভাটা

(General notion of Gravitation, Newton's law of attraction. Simple explanation of movement of moon and artificial satellites. Simple explanation of tides.)

14. **স্থিতি ও গতি (rest and motion):** বিশ্বের সকল পদার্থের দিকে তাকাইয়া আমরা এই ধারণা করিতে পারি যে, কোন কোন পদার্থ স্থির আর কোন কোন পদার্থ সচল। যখন কোন পদার্থ একই স্থানে অবস্থান করে তখন উহার অবস্থানকে আমরা স্থিতি বলি। আবার যখন কোন বস্তু স্থান ত্যাগ করে তখন তাহার অবস্থাকে আমরা গতি বলি। কোন বস্তুকে নততল সমতলের উপর হইতে ছাড়িয়া দিলে বস্তুটি নীচে নামিয়া আসে অর্থাৎ বস্তুটি গতিশীল অবস্থা প্রাপ্ত হয়। পৃথিবীর উপরিস্থিত গাছপালা, বাড়ী সবই আমরা স্থির অবস্থায় দেখিতে পাইতেছি, কিন্তু গতিশীল রেলগাড়িতে চড়িয়া যাইবার সময় দেখি যে উহারা উল্টা দিকে ছুটিতেছে। টেবিলের উপর বই খাতা স্থির অবস্থায় আছে। কিন্তু এই স্থির বস্তুগুলি অন্য গ্রহ হইতে স্থির অবস্থায় না দেখাইয়া গতিশীল দেখাইবে। পৃথিবী গতিশীল বলিয়া পৃথিবীর যাবতীয় স্থিতি বস্তুই পৃথিবীর সঙ্গে প্রচণ্ড গতিতে ঘুরিতেছে। সুতরাং চরম স্থিতি অবস্থায় কোন বস্তুই নাই। পার্শ্বস্থিত অন্য কোন স্থির বস্তুর তুলনায় কোন বস্তু স্থিতি অবস্থায় থাকিলে

স্থির এবং গতিশীল অবস্থায় থাকিলে সচল বলি। গতি ও স্থিতি এই দুই অবস্থা আপেক্ষিক (relative) মাত্র।

সরণ (displacement): কোন গতিশীল বস্তুর প্রথম ও শেষ অবস্থানের সরল রৈখিক দূরত্বকে **সরণ** (displacement) বলে।

15. **দ্রুতি** (speed): একটি রেলগাড়ি হাওড়া ষ্টেশন হইতে 45 ঘণ্টায় 900 মাইল অতিক্রম করে। অতএব আমরা বলিতে পারি যে রেলগাড়িটি 1 ঘণ্টায় $\frac{900}{45}$ মাইল বা 20 মাইল যায়। 1 ঘণ্টায় অতিক্রান্ত পথকে **দ্রুতি** বলে। এখানে রেলগাড়িটি কোন্ দিক ধরিয়া যায় তাহার কোন উল্লেখ নাই। সুতরাং দ্রুতি $(s) = \frac{\text{অতিক্রান্ত পথ } (d)}{\text{মোট সময় } (t)}$ অর্থাৎ গতিশীল বস্তুর অবস্থানের পরিবর্তনের হারকে দ্রুতি বলে।

16. **বেগ** (velocity): কোন বিশেষ দিকে গতিশীল বস্তুর সরণের পরিবর্তনের হারকে **বেগ** বলা হয়। সুতরাং যদি গতিশীল বস্তুর সমবেগ V হয় এবং t সময়ে অতিক্রান্ত পথ s হয়, তাহা হইলে $V = \frac{s}{t}$ হয়।

17. **ত্বরণ** (Acceleration): একটি রেলগাড়ি প্রথম 1 ঘণ্টায় 25 মাইল যায়, পরবর্তী 1 ঘণ্টায় 30 মাইল যায়, তৎপরবর্তী 1 ঘণ্টায় 35 মাইল যায়। এখানে প্রতি ঘণ্টায় বেগের পরিবর্তন 5 মাইল করিয়া হইতেছে। বেগের এই ক্রমবর্ধমান পরিবর্তনের হারকে **ত্বরণ** বলে। সুতরাং গতিশীল বস্তুর প্রারম্ভিক বেগ যদি u হয়, t সময় শেষে বেগ v হয়, তাহা হইলে ত্বরণ $(f) = \frac{v-u}{t}$.

আবার বেগ যদি সমহারে কমিতে শুরু করে তাহা হইলে ক্রমহ্রাসমান বেগের পবিবর্তনের হারকে **মন্দন** (Retardation) বলে।

বলের সংজ্ঞা হইতে আমরা বলিতে পারি যে বস্তুর উপর বলপ্রয়োগ করিলেই ত্বরণের সৃষ্টি হয়।

18. **মহাকর্ষ ও অভিকর্ষ** (**Gravitation & gravity**): বিশ্বের যে কোন দুইটি বস্তু সর্বদা পরস্পরকে এক আকর্ষণ বলে টানে। এই বলকে **মহাকর্ষ** (force of gravitation) বলে। পদার্থের পারস্পরিক আকর্ষণের প্রভাবে আকাশের **সকল জ্যোতিষ্ক** মহাশূন্যে আবর্তন করে। বিশ্ববিশ্রুত বৈজ্ঞানিক স্যার আইজাক নিউটন এই সূত্রের আবিষ্কারক বলিয়া ইহাকে নিউটনের **মহাকর্ষ সূত্র** (Newton's law of gravitation) বলে। মহাকর্ষের সূত্রে বলা হইতেছে:—এই বিশ্বের যে কোন দুইটি বস্তুকণা পরস্পরকে আকর্ষণ করে এবং

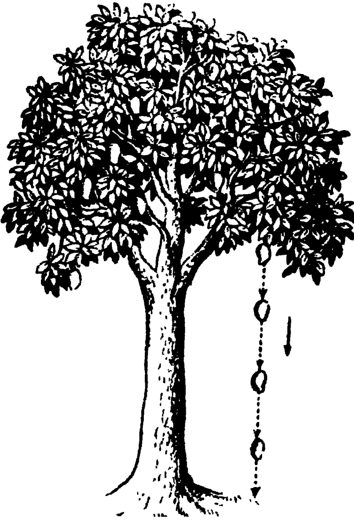
এই আকর্ষণের মান বস্তুকণা দুইটির ভরের গুণফলের সমানুপাতিক ও উহাদের মধ্যকার দূরত্বের বর্গের ব্যস্তানুপাতিক। যদি দুইটি বস্তুর ভর m এবং M হয় এবং ইহারা পরস্পর হইতে d দূরত্বে থাকিয়া মহাকর্ষ জনিত পারস্পরিক আকর্ষণ বল F দ্বারা পরস্পর পরস্পরকে আকর্ষণ করে তবে, $F = G.\frac{mM}{d^2}$ হয় (চিত্র 24)। এই সূত্রে G একটি ধ্রুবক এবং ইহাকে মহাকর্ষের বিশ্বধ্রুবক (Universal

চিত্র 24
দুইটি বস্তু পরস্পরকে আকর্ষণ করিতেছে

Gravitational constant) বলা হয়। ভর গ্রামে, বল ডাইন্‌এ ও দূরত্ব সেন্টিমিটারে প্রকাশ করিলে এই G এর মান $6{\cdot}68 \times 10^{-8}$।

পৃথিবীও একটি বস্তু। সুতরাং পৃথিবী ও অন্য কোন বস্তুর মধ্যেও নিউটনের সূত্রানুযায়ী আকর্ষণ হইবে। এই বিশেষ ক্ষেত্রে অর্থাৎ পৃথিবীর নিকটবর্তী বস্তুগুলির পারস্পরিক মহাকর্ষকে **অভিকর্ষ** (Gravity) বলা হয়।

গাছ হইতে ফল নীচের দিকে পড়ে (চিত্র 25)। শুধু গাছ হইতে কেন, উচ্চ স্থান হইতে যে কোন জিনিসকে ছাড়িলে তাহা নীচের দিকে পড়ে। বস্তু যতই পৃথিবীর দিকে নামিয়া আসে উহার বেগও তত বৃদ্ধি পায়। ইহার কারণ কি ? প্রত্যেক বস্তুকে পৃথিবী উহার কেন্দ্রের দিকে আকর্ষণ করে। বস্তুটিও পৃথিবীকে আকর্ষণ করে। কিন্তু পৃথিবীর ভর বস্তুর ভর অপেক্ষা বহুগুণ বেশী বলিয়া বস্তুটি পৃথিবীর কেন্দ্রের দিকে যাইতে চেষ্টা করে। সুতরাং উপর হইতে ছাড়িয়া দিলে যখন বস্তু নীচের দিকে যাইতে চেষ্টা করে তখন বস্তুর উপর নিশ্চয়ই কোন বল ক্রিয়া করে। পৃথিবীর আকর্ষণই এই বল। আমরা জানি বস্তুর উপর বল ক্রিয়া করিলে উহাতে ত্বরণের সৃষ্টি হয়। পৃথিবীর অভিকর্ষের জন্য যে ত্বরণের সৃষ্টি হয়



চিত্র 25
গাছ হইতে ফল পড়িতেছে।

তাহাকে **অভিকর্ষজ ত্বরণ** (acceleration due to gravity) বলে এবং ইহা সাধারণতঃ 'g' দ্বারা সূচিত হয়। অভিকর্ষজ ত্বরণ $g=G\frac{M}{R^2}$.এখানে M=পৃথিবীর ভর, R=পৃথিবীর ব্যাসার্ধ। ইটালী দেশীয় বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক গ্যালিলিওর পূর্বে লোকের ধারণা ছিল যে বস্তু যত ভারী হইবে অভিকর্ষজ ত্বরণও তত বেশী হইবে। কিন্তু গ্যালিলিও পরীক্ষার দ্বারা প্রমাণ করেন যে, একই স্থানে সকল বস্তুই সমত্বরণে পৃথিবীর কেন্দ্রের দিকে আসিতে চেষ্টা করে। সুতরাং এই ত্বরণ বস্তু নিরপেক্ষ। দূরত্ব বাড়িলে 'g' মান কমিবে, এবং দূরত্ব কমিলে 'g' মান বাড়িবে। এই কারণে পাহাড়ের উপরিস্থিত কোন স্থানের 'g' এর মান ভূপৃষ্ঠে 'g' এর মান অপেক্ষা কম। আবার পৃথিবী সম্পূর্ণ গোল নহে বলিয়া 'g' এর মান পৃথিবীর সর্বত্র সমান নয়। মেরুপ্রান্ত (polar region) কিঞ্চিৎ চাপা। সুতরাং পৃথিবীর কেন্দ্র হইতে মেরুদ্বয়ের দূরত্ব নিরক্ষীয় অঞ্চলের (equatorial region) অপেক্ষা কম। এই কারণে মেরুদ্বয়ে 'g' এর মান নিরক্ষরেখা হইতে বেশী।

সি. জি. এস্ পদ্ধতিতে 'g' এর গড় মান=981 সে. মি. প্রতি সে.^{2} এবং এফ. পি. এস্ পদ্ধতিতে 'g' এর গড় মান=32 ফিট প্রতি সে.^{2}। আবার, পৃথিবীর অভ্যন্তরে কোন খনির মধ্যে প্রবেশ করিলে দেখা যায় যে সেখানে 'g'এর মান ভূপৃষ্ঠে 'g'এর মান হইতে কম। পৃথিবীর কেন্দ্রে কোন আকর্ষণ নাই ; সুতরাং সেখানে 'g' মানও শূন্য।

19. পদার্থের ওজন (Weight) ও ভর : (Mass) ভর বলিতে কোন বস্তুতে মোট যে পরিমাণ পদার্থ আছে তাহাই বুঝায়। কোন পদার্থকে হাতের উপর রাখিয়া দিলে চাপ অনুভব করি। ইহার কারণ পদার্থ টিকে পৃথিবী সর্বদা নিম্নাভিমুখে আকর্ষণ করিতেছে। যে বলে পৃথিবী কোন পদার্থকে নিজের কেন্দ্রের দিকে আকর্ষণ করে তাহাই বস্তুর **ভার** বা **ওজন**। নিউটনের গতিসূত্র হইতে আমরা জানি, বল ভর ও ত্বরণের গুণফলের সমান অর্থাৎ $P=mf$, এখানে বস্তুর ত্বরণ, অভিকর্ষ ছাড়া আর কিছুই নহে। কাজেই কোন পদার্থের উপর অভিকর্ষজ বল মাপিতে গেলে পদার্থের ভরকে অভিকর্ষজ ত্বরণ দ্বারা গুণ করিতে হয় এবং পদার্থের ওজন বা ভার বলিতে এই অভিকর্ষজ বলই বুঝায়। অতএব পদার্থের ভারকে যদি W বলা হয়, তাহা হইলে

$$W = \text{ভর} \times \text{অভিকর্ষজ ত্বরণ}$$
$$= m \times g.$$

সুতরাং ভর ও ওজন এক নহে। ওজন ভরের সমানুপাতিক। একটি বেশী হইলে অন্যটি সেই অনুপাতে বেশী হইবে। পৃথিবীর সর্বত্র পদার্থের ভর একই থাকিবে, কিন্তু পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে 'g' মান বিভিন্ন বলিয়া পদার্থের ওজনও বিভিন্ন হইবে। কিন্তু কোন নির্দিষ্ট স্থানে পদার্থের ওজন ও ভর সমানুপাতিক বলিয়া সাধারণতঃ ঐ স্থানে উহার ওজন ও ভরের মধ্যে কোন পার্থক্য করা হয় না।

20. গ্যালিলিও এবং ধ্রুব অভিকর্ষজ ত্বরণ (Galileo and the Constant acceleration due to gravity) : পৃথিবীর অভিকর্ষজ আকর্ষণ যদি সমান পদার্থের উপর সমান শক্তিতে ক্রিয়া করে তাহা হইলে কোন উচ্চস্থান হইতে যদি একটি হাল্‌কা ও একটি ভারী জিনিস ছাড়িয়া দেওয়া যায়, উভয়েই একসঙ্গে একই সময়ে মাটিতে পড়িবে। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায় যে, ভারী বস্তু আগে পড়ে এবং হাল্‌কা বস্তুর পড়িতে বিলম্ব হয়। গ্যালিলিওর পূর্বে মানুষের এই ধারণা বদ্ধমূল ছিল যে, ভারী বস্তু শীঘ্র পড়ে এবং হাল্‌কা বস্তুর পড়িতে বিলম্ব হয়। 1590 খ্রীষ্টাব্দে গ্যালিলিও পিসা নগরীর বিখ্যাত হেলানো মিনারের (180 ফুট উচ্চ) চূড়া হইতে ছোট, বড় বিভিন্ন ওজনের বস্তু ছাড়িয়া দিয়া দেখান যে উহারা এক সঙ্গে একই সময় মাটিতে পড়ে। তিনি যেটুকু তফাত লক্ষ্য করিলেন তাহারা বায়ুর বাধার জন্য। বস্তু হাল্‌কা এবং বড় হইলে বায়ুর বাধাও বেশী হইবে এবং একটু ধীরে ধীরে পড়িবে। তাই গ্যালিলিও বহু পরীক্ষার পর এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে বায়ুশূন্য স্থানে স্থির অবস্থা হইতে ছোট, বড়, হাল্‌কা, ভারী সকল পদার্থই সমত্বরণে নীচে পড়িবে। কিন্তু তাঁহার সময় বায়ু-নিষ্কাশনের পাম্প (Pump) আবিষ্কৃত হয় নাই বলিয়া গ্যালিলিও তাঁহার সিদ্ধান্ত পরীক্ষার দ্বারা নির্ভুল প্রমাণ করিতে পারেন নাই। বায়ু-নিষ্কাশন যন্ত্রের আবিষ্কারের পর বৈজ্ঞানিক নিউটন 1650 খ্রীষ্টাব্দে গিনি ও পালক পরীক্ষার দ্বারা এই সিদ্ধান্তের সত্যতা প্রমাণ করেন। পড়ন্ত বস্তুর পতনের কয়েকটি বিশেষ ধর্ম লক্ষ্য করিয়া গ্যালিলিও তিনটি মূল্যবান সূত্র (laws of falling bodies) আবিষ্কার করেন। তাহারা নিম্নরূপ :—

পড়ন্ত বস্তুর সূত্র :—

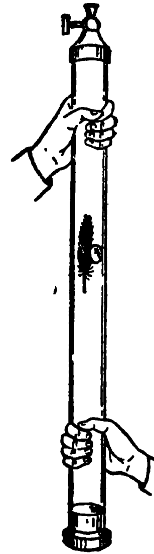
স্থির অবস্থা হইতে বিনা বাধায় নীচে পড়িতে থাকিলে—

(ক) প্রত্যেক বস্তু সমান সময়ে সমান পথ অতিক্রম করে।

(খ) নির্দিষ্ট সময়ে যে বেগ উৎপন্ন হয় তাহা ঐ সময়ের সমানুপাতিক।

(গ) নির্দিষ্ট সময়ে বস্তুটি যে পথ অতিক্রম করে তাহা ঐ সময়ের বর্গের সমানুপাতিক।

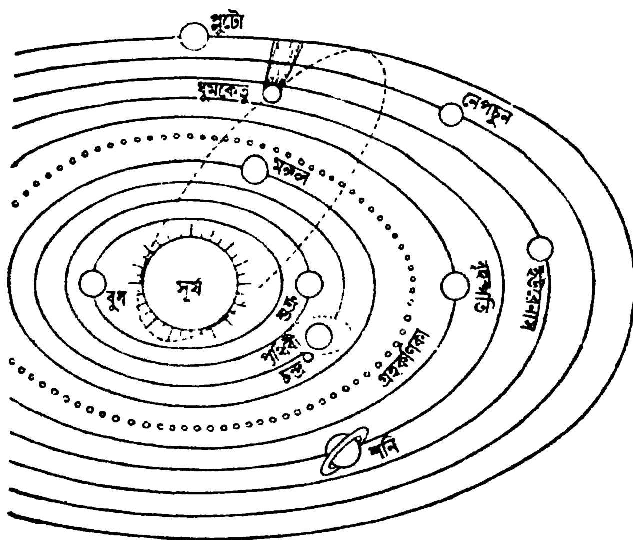
21. **গিনি ও পালক পরীক্ষা** (Guinea and Feather Experiment) : প্রায় 1 মিটার লম্বা একটি মোটা ফাঁপা কাঁচের নল লওয়া হয় (চিত্র 26)। উহার এক মুখ একটি মুটকি (cap) দ্বারা বন্ধ ও অন্য মুখ খোলা ও মুখে একটি রোধনী (stopcock) বসানো আছে। নলটির মধ্যে একটি গিনি ও একটি পালক আছে। আবদ্ধ নলটিকে হঠাৎ উল্টাইয়া দিলে দেখা যায় যে গিনি পালকটির আগেই পড়িতেছে। এইবার বায়ু-নিষ্কাশন যন্ত্র দ্বারা ভিতর হইতে বায়ু বাহির করিয়া লইয়া রোধনী আটকাইয়া দেওয়া হয়। এই অবস্থায় নলটি পুনরায় হঠাৎ উল্টাইয়া দিলে দেখা যাইবে যে গিনি ও পালক উভয়েই একসঙ্গে অপর প্রান্তে পৌছাইয়াছে। ইহা হইতে প্রমাণিত হয় যে বায়ুর বাধা না থাকিলে উপর হইতে সকল বস্তুই পৃথিবীপৃষ্ঠে সমান ত্বরণ লইয়া পতিত হয়।



চিত্র 26
গিনি ও পালক পরীক্ষা।

22. **সৌর জগৎ** (**Solar system**) : প্রভাত হইবার সঙ্গে সঙ্গে পূর্বাকাশে সূর্য উদিত হয়, সারাদিন আকাশে বিরাজমান থাকিয়া সন্ধ্যায় পশ্চিমাকাশে অস্ত যায়। দেখিয়া মনে হয় যেন সূর্য পৃথিবীর চারিদিকে ঘুরিতেছে। রাত্রির আগমনে কোটি কোটি উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের আকাশে আবির্ভাব হয়, যেন আকাশের বুকে অসংখ্য দীপ জ্বলিয়া ওঠে। চন্দ্রও রাত্রির অন্ধকার দূর করিবার কাজে আগাইয়া আসে। যে সব জ্যোতিষ্ককে আমরা খালি চোখে দেখিতে পাই তাহাদের সংখ্যা দূরবীণে দেখা জ্যোতিষ্কের সংখ্যার তুলনায় অতি নগণ্য। যে সব জ্যোতিষ্ক হইতে স্থির ভাবে আলোক আসে তাহাদের বলা হয় **গ্রহ** (planet)। আর যাহাদের আলো মিট মিট করে তাহাদের বলা হয় **নক্ষত্র** (star)। এই বিশাল বিশ্বে কোটি কোটি নক্ষত্র আছে ; সূর্য তাহাদের মধ্যে একটি। প্রত্যেকটি নক্ষত্র সূর্যের মত বড় অথবা সূর্য অপেক্ষা বহুগুণ বড়—এক একটা অগ্নিময় জলন্ত গ্যাসীয় পিণ্ড। সূর্যের আকর্ষণে প্রায় এক হাজার গ্রহ সূর্যের চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। ইহাদের মধ্যে সূর্য হইতে পর পর প্রধান গ্রহগুলি হইতেছে **বুধ** (Mercury), **শুক্র** (Venus), **পৃথিবী** (Earth), **মঙ্গল** (Mars), **বৃহস্পতি** (Jupiter), **শনি** (Saturn), **অরুণ** বা **ইউরেনাস**

(Uranus), বরুণ বা নেপচুন (Neptune), ও কুবের বা প্লুটো (Pluto)। ইহা ছাড়া মঙ্গল ও বৃহস্পতির মধ্যে প্রায় ছয় শত ক্ষুদ্র গ্রহ একত্র পুঞ্জীভূত হইয়া আছে। ইহারাও সূর্যের চারিদিকে ঘুরিতেছে। ইহাদিগকে গ্রহাণুপুঞ্জ (Asteroid) বলে। গ্রহগুলির নিজস্ব কোন আলো বা তাপ নাই। পৃথিবীর চারিদিকে চাঁদ ঘুরিতেছে। চাঁদ পৃথিবীর উপগ্রহ। পৃথিবী ছাড়া অন্যান্য গ্রহেও এক বা একাধিক উপগ্রহ আছে। এই উপগ্রহগুলির প্রত্যেকেই নিজ নিজ গ্রহের চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। মঙ্গলের দুইটি, বৃহস্পতির বারটি, শনির নয়টি, ইউরেনাসের চারিটি ও নেপচুনের দুইটি উপগ্রহ আছে। ইহা ছাড়া শনিগ্রহের ছোট ছোট আরও অসংখ্য উপগ্রহ আছে। ইহাদিগকে একটি বলয়ের মত দেখায়। অন্যান্য গ্রহদের কোন উপগ্রহ নাই।



চিত্র 27

সৌর-জগৎ।

গ্রহের মতন উপগ্রহগুলির নিজস্ব কোন আলো বা তাপ নাই। সূর্যের আলোকেই ইহারা আলোকিত; তাই উজ্জ্বল দেখায়। গ্রহ, অসংখ্য উপগ্রহ (Satellites), ধূমকেতু (Comets) ও উল্কা লইয়া যে জগৎ তাহাকে সৌর জগৎ (Solar system) বলা হয় (চিত্র 27)।

23. সূর্যের আকর্ষণ ও গ্রহের গতি: অতীতে মানুষের বিশ্বাস ছিল

যে, পৃথিবী স্থির এবং পৃথিবীকে কেন্দ্র করিয়া তাহার চতুর্দিকে সূর্য নক্ষত্রাদি ঘুরিতেছে। জ্যোতির্বিদ কোপার্নিকাস (Copernicus) চতুর্দশ শতাব্দীতে সর্বপ্রথম প্রচার করেন যে সূর্যের আকর্ষণে তাহার চতুর্দিকে পৃথিবী ও অন্যান্য গ্রহ উপবৃত্তাকার পথে ঘুরিতেছে। সূর্যই সৌরজগতের কেন্দ্র। গ্রহগুলির গতির কারণ নিউটনের পূর্বে কোন বিজ্ঞানীই নির্ণয় করিতে পারেন নাই। তাঁহার মহাকর্ষ সূত্র আবিষ্কারের পর গ্রহগুলির ঘূর্ণনের কারণ জানিতে পারা যায়।

নিউটনের গতিসূত্র হইতে আমরা জানি যে কোন বস্তু সরলরেখায় চলিতে আরম্ভ করিলে বাহির হইতে বস্তুর উপর কোন বল প্রয়োগ করিয়া বাধ্য না করিলে তাহা সমবেগে সরলরেখা ধরিয়া চলিতে থাকিবে। সুতরাং কোন বস্তু নির্দিষ্ট বেগে বৃত্তাকার পথে ঘুরিতে থাকিলে উহার কেন্দ্রের দিকে ঐ বস্তুর উপর নিশ্চয়ই একটি বল প্রতি মুহূর্তেই প্রযুক্ত হইয়া থাকে। ঐ বলকে **অভিকেন্দ্রিক বল** (Centripetal force) বলা হয়। যেমন, একটি ঢিলকে সুতার একপ্রান্তে বাঁধিয়া অপর প্রান্ত আঙুলে জড়াইয়া বৃত্তপথে ঘুরাইলে সব সময়ে ঢিলটির উপর বল প্রয়োগ করিতে হয়। ইহাই অভিকেন্দ্রিক বল। এই বল ঘূর্ণায়মান ঢিলটিকে কেন্দ্রের অভিমুখে আকর্ষণ করে। আবার, নিউটনের তৃতীয় সূত্রানুযায়ী ক্রিয়া-মাত্রেরই সমান ও বিপরীত প্রতিক্রিয়া থাকে। সুতরাং এই অভিকেন্দ্রিক বলেরও প্রতিক্রিয়া বল আছে। এই প্রতিক্রিয়ার জন্য ঢিলটি সব সময়েই বৃত্তাকার পথ হইতে স্পর্শক বরাবর ছুটিয়া যায়। ইহার ফলে আঙুলের উপর একটা টান পড়ে। ইহাকে **অপকেন্দ্রিক প্রতিক্রিয়া** (Centrifugal reaction) বলে। এই দুইটি পরস্পর বিরুদ্ধ ক্রিয়ার জন্যই ঢিলটি বৃত্তাকারে অবিরাম ঘুরিতে থাকে। এই একই কারণে গ্রহগুলি অবিরাম গতিতে ঘুরিতেছে। সূর্য ও গ্রহগুলির মধ্যে মহাকর্ষ-জনিত বল সর্বদা ক্রিয়া করিতেছে। সূর্যের আকর্ষণ বল অভিকেন্দ্র বলের ন্যায় ক্রিয়া করে। সূর্যের চারিদিক বায়ুশূন্য,—সেইজন্য গ্রহগুলিকে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করিবার সময় বায়ুর ঘর্ষণজনিত বাধার সম্মুখীন হইতে হয় না। গতিজাড্যের জন্য ইহারা অনন্তকাল ধরিয়া সমগতিতে প্রদক্ষিণ করিতেছে।

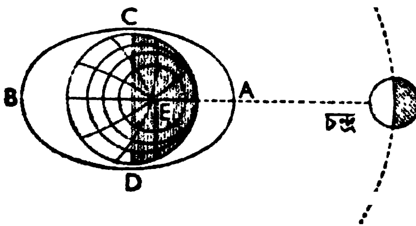
গ্রহের চতুর্দিকে উপগ্রহগুলি একই কারণে ঘুরিতেছে। উপগ্রহগুলি সূর্য অপেক্ষা নিজ নিজ গ্রহের নিকটবর্তী বলিয়া উপগ্রহের ক্ষেত্রে গ্রহের মহাকর্ষীয় বলের প্রভাব খুব বেশী। এইজন্য তাহারা সর্বদা উপবৃত্তাকার পথে নিজ নিজ গ্রহকে প্রদক্ষিণ করিতেছে।

চাঁদ পৃথিবীর উপগ্রহ। উহা পৃথিবীর চারিদিকে ঘুরিতেছে। চাঁদের নিজস্ব কোন আলো নাই; তবুও আমরা জ্যোৎস্নার আলো পাই। সূর্যের আলো চাঁদের গায়ে লাগিয়া চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে। ইহার কিছু অংশ পৃথিবীতে আসিয়া পৌঁছায়—ইহাই 'চাঁদের জ্যোৎস্না'।

24. **জোয়ার ভাটা:** সূর্য ও চন্দ্র উভয়েই পৃথিবীকে আকর্ষণ করে। এই আকর্ষণের জন্য প্রত্যেক দিন ১২ ঘণ্টা অন্তর সমুদ্রের জলরাশির স্ফীতি ও হ্রাস হয় এবং তাহার সঙ্গে নদীর জলেও উঠানামা হয়। জলের এই স্ফীতিকে **জোয়ার** (Flow or High tide) এবং পতন বা হ্রাসকে **ভাটা** (Ebb or Low tide) বলে। চন্দ্র পৃথিবীর নিকটতম জ্যোতিষ্ক বলিয়া পৃথিবীর উপর চন্দ্রের আকর্ষণ অত্যন্ত প্রবল এবং ইহা বহু দূরবর্তী সূর্যের আকর্ষণ অপেক্ষা অনেক বেশী। সুতরাং প্রধানতঃ চন্দ্রের আকর্ষণেই জোয়ার ভাটা হইয়া থাকে।

চন্দ্র পৃথিবীর চারিদিকে ঘুরিতেছে। পৃথিবী-পৃষ্ঠের যে অংশ চন্দ্রের সর্বাপেক্ষা নিকটবর্তী হয় সেই স্থানেই চন্দ্রের আকর্ষণ সর্বাপেক্ষা বেশী হয়। (কঠিন স্থলের অণু অপেক্ষা তরল জলের অণুগুলি শিথিল বলিয়া জল সহজেই আকৃষ্ট হয়।) সুতরাং ঐ অংশের জলরাশির উপর চন্দ্রের আকর্ষণের টান প্রবল হয়।

মহাসমুদ্রগুলি পরস্পরের সহিত যুক্ত বলিয়া ঐ স্থানের দিকে চারিদিক হইতে জলরাশি প্রবাহিত হয় এবং জলরাশি ফুলিয়া উঠার ফলে জোয়ারের সৃষ্টি হয়। ইহা মুখ্য বা প্রত্যক্ষ (Primary or Direct tide)। 28 চিত্রে *A* স্থানটি চন্দ্রের ঠিক সম্মুখে—এই স্থলে মুখ্য জোয়ার হয়। মুখ্য জোয়ারের বিপরীত দিকের স্থান অর্থাৎ প্রতিবাদ স্থান *B*-এর দূরত্ব পৃথিবীর কেন্দ্র অপেক্ষা চন্দ্র হইতে আরও চারি হাজার মাইল দূরে অবস্থিত। সুতরাং পৃথিবীর কেন্দ্রের উপর চন্দ্রের আকর্ষণ *B* স্থানের উপর আকর্ষণ অপেক্ষা অনেক বেশী। কিন্তু *B* স্থানের সমুদ্র-তলস্থ কঠিন ভূ-ভাগ পৃথিবীর কেন্দ্রের সঙ্গে দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ। সুতরাং চন্দ্রের আকর্ষণে কেন্দ্র হইতে সমস্ত কঠিন অংশ চন্দ্রের দিকে সরিয়া যায়। কিন্তু *B* স্থানের জলরাশির উপর চন্দ্রের আকর্ষণ বেশ কম বলিয়া তাহা ততটা সরিয়া আসে না। ইহার ফলে ঐ *B*



চিত্র 28
জোয়ার ও ভাটা।

স্থানে জোয়ারের সৃষ্টি হয়। ইহাকে **গৌণ** বা **পরোক্ষ জোয়ার** (Secondary or Indirect tide) বলে। A ও B এই দুই স্থানের মধ্যবর্তী স্থান অর্থাৎ C ও D হইতে জলরাশি A ও B এর দিকে প্রবাহিত হয়। এই কারণে ঐ দুই স্থানে ভাটার সৃষ্টি হয়।

প্রতিদিন A স্থানে একবার মুখ্য জোয়ার, একবার গৌণ জোয়ার ও দুইবার ভাটার সৃষ্টি হয়। অর্থাৎ পৃথিবী-পৃষ্ঠস্থ প্রতি স্থানে দৈনিক দুইবার জোয়ার ও দুইবার ভাটা হয়। পৃথিবী হইতে সূর্য, চন্দ্র অপেক্ষা বহুদূরে অবস্থিত। সেইজন্য পৃথিবীর উপর—সূর্যের আকর্ষণ চন্দ্র অপেক্ষা খুবই কম। কিন্তু অমাবস্যায় সূর্য ও চন্দ্র পৃথিবীর একই পার্শ্বে অবস্থিত হয় বলিয়া পৃথিবীর উপর ইহাদের মিলিত আকর্ষণ অত্যন্ত প্রবল। ফলে পৃথিবীর যে স্থানে মুখ্য সৌর ও চন্দ্র জোয়ার হয়, তার বিপরীত পার্শ্বে গৌণ সৌর ও চন্দ্র জোয়ার হয়। তখন জলস্ফীতি খুবই বেশী হয়। এইরূপ জোয়ারকে **ভরা কটাল** বা **ভরা জোয়ার** (Spring tide) বলে।

পূর্ণিমার সময় সূর্য ও চন্দ্র পৃথিবীর বিপরীত পার্শ্বে অবস্থিত থাকে। ঐ অবস্থাতেও ভরা কটাল হয়। সপ্তমী ও অষ্টমী তিথিতে সূর্য ও চন্দ্র পৃথিবীর সহিত প্রায় সমকোণে নত থাকে। ঐ অবস্থায় সূর্য ও চন্দ্রের আকর্ষণ পরস্পর বিপরীত দিকে ক্রিয়া করে। সেইজন্য জোয়ারের তেজ কম হয়। এইরূপ জোয়ারকে **মরা জোয়ার** (Neap ide) বলে। চিত্রে দেখা যায় যে A এর স্থানে চন্দ্রের আকর্ষণের জন্য জোয়ার এবং C স্থানে সূর্যের আকর্ষণের জন্য ভাটা।

পৃথিবীর মোট জলরাশি নির্দিষ্ট। সেইজন্য ভরা ও মরা জোয়ারের মধ্যবর্তী স্থানের জলতল নামিয়া যাওয়ার ফলে ঐ দুই স্থানে ভাটা হয়।

25. কৃত্রিম উপগ্রহ ও ওজনশূন্য অবস্থা (Artificial Satellite and weightless state)।

কৃত্রিম উপগ্রহ : আজ আমরা স্পুটনিক (Sputnik), রকেট প্রভৃতি মহা ক্ষমতাশালী ক্ষেপণাস্ত্রের সাহায্যে মানুষের মহাশূন্য অভিযানের কথা শুনিয়া বিস্ময়াভিভূত হইতেছি। অনন্ত মহাশূন্য পরিক্রমার স্বপ্ন মানুষ বহু হাজার বছর ধরিয়া করিয়া আসিয়াছে। সাধারণ মানুষ এইরূপ অসম্ভব চিন্তাধারাকে নিছক কল্পনা ছাড়া আর কিছুই ভাবিতে পারে নাই। কিন্তু আজ আর আমরা উহাকে শুধু কল্পনার বিষয় বলিতে পারি না। বিজ্ঞানীদের বহুদিনের স্বপ্ন আজ বাস্তবে পরিণত হইয়াছে। এইরূপ ক্ষেপণাস্ত্রের সাহায্যে চাঁদের দেশে যাইবার আশা পূর্ণ হইতে চলিয়াছে।

1957 সালের 4ঠা অক্টোবর রাশিয়া যে সর্বপ্রথম পৃথিবীর এক কৃত্রিম উপগ্রহ বা নকল চাঁদ (রুষ ভাষায় ইহার নাম স্পুটনিক, Sputnik) মহাশূন্যে উৎক্ষেপণ করিল তাহা সারা বিশ্বের মানুষকে চমকিত করিয়া দিয়াছে। এই 'নকল চাঁদ' পৃথিবী প্রদক্ষিণ শুরু করিল। বিজ্ঞানীদের মহাসাধনার এই মহাপ্রচেষ্টা মানব সভ্যতার ইতিহাসে আর এক অতি বিস্ময়কর অধ্যায়ের সূচনা করিল। মানুষ আজ আশা রাখে অদূর ভবিষ্যতে গ্রহান্তরে বা আসল চাঁদের দেশে পরিভ্রমণ করার।



চিত্র 29
পৃথিবী ও তিনটি রকেটসহ কৃত্রিম উপগ্রহ।

এই স্পুটনিক ঘণ্টায় 17000 হইতে 18000 মাইল বেগে ছুটিয়াছিল। প্রথম অবস্থায় ইহা পৃথিবী-পৃষ্ঠ হইতে 560 মাইল উর্ধ্বে থাকিয়া 1 ঘণ্টা 36 মিনিট 2 সেকেণ্ডে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করে। রাশিয়া ঐ বৎসরের 3রা নভেম্বর দ্বিতীয় স্পুটনিক উৎক্ষেপণ করে। উহাতে 'লাইকা' নামে একটি কুকুরকেও পাঠান হইয়াছিল। ইহার পর আমেরিকা দুইবার কৃত্রিম চন্দ্র আকাশে ছাড়িয়াছিল। রাশিয়া তৃতীয় স্পুটনিক ছাড়িয়াছিল 1958 সালের মে মাসে। ইহার পর রাশিয়া 1959 সালের 4ঠা জানুয়ারী তারিখে যে কৃত্রিম গ্রহটি ছাড়িয়াছিল তাহা প্রচণ্ড বেগে আকাশে উঠিয়া 36 ঘণ্টার মধ্যে চন্দ্রকে ছাড়াইয়া গিয়া শেষ পর্যন্ত সূর্যের কৃত্রিম গ্রহে পরিণত হইয়া সূর্যকে প্রদক্ষিণ করিতে শুরু করে। সূর্যকে একবার প্রদক্ষিণ করিতে উহার সময় লাগিবে প্রায় 15 মাস এবং 5 বৎসর পর পৃথিবীর খুব নিকটে আসিবে। শুধু কি তাই, উহার পরও রাশিয়া আর একটি চন্দ্র-রকেট (লুনিক) ছাড়িয়াছিল যাহা চন্দ্রে গিয়া পড়িয়াছে। রাশিয়ার এর পরের রকেটটি চন্দ্রের অদৃশ্য পৃষ্ঠের ছবি তুলিয়া আনিয়াছে। চন্দ্রের অপর পৃষ্ঠ কিরূপ তাহা যে কোনদিন জানা যাইবে একথা কি মানুষ কল্পনাও করিতে পারিয়াছিল ?

ইহার পর 1961 সালের এপ্রিলে মহাশূন্যে প্রথম অভিযাত্রী মানুষ গ্যাগারিন 'ভস্তক' (=প্রতীচী) নামধেয় মহাকাশযানে মহাকাশ পরিক্রমা করিয়া 1 ঘণ্টা 48 মিনিটে পূর্বনির্ধারিত স্থানে ফিরিয়া আসিয়াছেন। পৃথিবী হইতে ভস্তকের দূরত্ব ছিল 80—87 মাইল; একবার পৃথিবী প্রদক্ষিণ করিতে সময় লাগিয়াছিল 89 মি. 1 সে.। গ্যাগারিন তাঁহার মহাকাশ যাত্রার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করিয়াছেন।

ইহার পর 1961 সালেই মে মাসে আমেরিকা যুক্তরাজ্যের কমাণ্ডার এলান শেফার্ড মহাকাশ যাত্রা করেন। ঘণ্টায় 5 হাজার মাইল বেগে মহাশূন্যে পৌছিয়া সেখানে 16 মিনিট অবস্থানের পর তিনি পূর্বনির্দিষ্ট স্থানে ফিরিয়া আসেন। 1961 সালে জুলাই মাসে আমেরিকার দ্বিতীয় মহাকাশযাত্রী ক্যাপ্টেন ভার্জিল গ্রীসম 15 মিনিটকাল মহাশূন্যে অবস্থান করিয়া পৃথিবীতে ফিরিয়া আসেন।

1961 সালের আগষ্ট মাসে সোভিয়েট রাশিয়ার দ্বিতীয় মহাকাশচারী মেজর জেটপালেভিচ টিটভ ভস্তক-2 নামক মহাকাশযানটির সাহায্যে আকাশ-পরিক্রমায় যাত্রা করেন। তিনি 25 ঘণ্টা 18 মি. মহাশূন্যে বিচরণ করেন।

1962 সালের 11ই আগষ্ট শক্তিশালী মহাকাশযান ভস্তক-3 কক্ষপথে স্থাপিত হয়। ভস্তক-3এ ছিলেন আন্দ্রিয়ান নিকোলায়েভ; পুরাপুরি এক দিন এক রাত্রি পার হইবার আগেই আরও একটি মনুষ্যবাহী মহাকাশযান ভস্তক-4 নাক্ষত্রিক জগতে অনুপ্রবেশ দরে। ভস্তক-4এ ছিলেন পাভেল পোপোভিচ। একজন প্রায় 4 দিন 4 রাত্রি আর একজন 71 ঘণ্টা তাহাদের কক্ষপথে বাস করিয়াছিলেন।

1962 সালে 20শে ফেব্রুয়ারী কর্ণেল জন গ্লেন মহাকাশ পরিক্রমা করেন। ইহা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাফল্য। 1963 সালের মে মাসে গর্ডন কুপার ফেইথ-7 নামক মহাকাশ যান যোগে মহাকাশ যাত্রা করেন।

ইহার পর রাশিয়ার ভ্যালেরি বিকোভস্কি (28 বৎসর বয়স) ও বিশ্ব-প্রদক্ষিণে পৃথিবীর প্রথম মহাকাশচারিণী ভ্যালেন্টিনা তেরেসকোভার (26 বৎসর বয়স) যুগ্মভাবে দুইখানা স্বতন্ত্র মহাকাশযানে মহাকাশ যাত্রা শুরু হয় 1963 সালের জুন মাসে।

14ই জুন শুক্রবার কর্ণেল বিকোভস্কি মহাকাশ যাত্রা শুরু করেন। তাঁহার 33 বার পৃথিবী প্রদক্ষিণ করিবার পর তেরেসকোভা মহাকাশে উঠিয়া আসেন। তেরেসকোভা 16ই জুন রবিবার ভারতীয় স্টাণ্ডার্ড টাইম বেলা 3টায় পৃথিবী প্রদক্ষিণ শুরু করেন। বিকোভস্কির সাংকেতিক নাম 'বাজপাখী' আর পৃথিবীর প্রথম মহাকাশচারিণী 'ভ্যালেন্টিনার' সাংকেতিক নাম 'শঙ্খচিল'।

'শঙ্খচিল' হর্ষোৎফুল্ল কণ্ঠে বলিয়া উঠেন—পৃথিবীকে দেখিতে পাইতেছি...

চমৎকার···যন্ত্রপাতি চমৎকারভাবে কাজ করিতেছে। পৃথিবী প্রদক্ষিণে দুইখানা মহাকাশযানের গতির পার্থক্য হইতেছে মাত্র 6 সেকেণ্ড। তেরেসকোভার মহাকাশযানখানা নির্দিষ্ট সময়ে ও নির্দিষ্ট স্থানে তিন মাইলের মধ্যে—বিকোভস্কির মহাকাশযানের সঙ্গী হইয়াছিল। রুশিয়ার যুগল মহাকাশচারী 19শে জুন নির্বিঘ্নে পূর্ব পরিকল্পনা ও হিসাব অনুযায়ী নির্দিষ্টস্থানে অবতরণ করেন। পৃথিবীর সমস্ত বিজ্ঞানীকে বিস্মিত করিয়া দিয়া মস্কো রেডিও ঘোষণা করিয়াছে যে মহাকাশে দুই বা ততোধিক যানের মিলনের স্থান ও সময় নির্ভুলভাবে স্থির করিয়া দেওয়া সম্ভবপর। চন্দ্রলোক অভিযানের প্রচেষ্টায় সোভিয়েট রাশিয়াকর্তৃক চন্দ্রে প্রেরিত লুনা-9 (রাশিয়ানরা 1966 সালের 3রা ফেব্রুয়ারি ইহাকে চন্দ্রপৃষ্ঠে অবতরণ করান) পৃথিবীতে চাঁদের অনেক ছবি পাঠাইয়াছিল। লুনা-9এর চন্দ্রে অবতরণের আগে রাশিয়া আরও পাঁচবার চাঁদে নিরাপদে মহাকাশযান নামাবার চেষ্টা করিয়া ব্যর্থ হইয়াছিল।

620 পাউণ্ড ওজনের আমেরিকার প্রথম 'সারভেয়ার' মহাকাশযান যন্ত্রসম্ভার লইয়া 1966 সালের 2রা জুন চাঁদে স্বচ্ছন্দভাবে ও নিরাপদে নামিয়াছিল। উহা কয়েক সেকেণ্ড অন্তর অন্তর নানাপ্রকার তথ্য ও গুরুত্বপূর্ণ ছবি (10,000এর বেশী) পাঠাইয়াছিল। ঘণ্টায় ছয় হাজার মাইল বেগে চলিতে চলিতে হঠাৎ গতিবেগ প্রায় স্তব্ধ করিয়া সারভেয়ারটি ধীরে ধীরে 'পা' ফেলিয়া চাঁদের উপর নামে। এই মার্কিন সারভেয়ার টেলিভিসান চাঁদে তার অবতরণের নির্দিষ্ট এলাকার দশ মাইলের মধ্যে অবতরণ করায় পৃথিবীর ঐ উপগ্রহে ধীরে ধীরে রকেট নামিয়ে দিবার মার্কিন পরিকল্পনা পূর্ণ সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে। বিজ্ঞানের এই মহান সাফল্যে বিজ্ঞানী ও অনুসন্ধিৎসু মহল গভীর আনন্দবোধ করিতেছেন। বিশ্ব আজ চমকিত। সারভেয়ার টেলিভিসানটি যে স্থানে অবতরণ করিয়াছে, প্রথম মার্কিন চন্দ্রবিহারীরা ঐ জায়গাতেই নামিবেন বলিয়া মনে হয়। পৃথিবী হইতে 2 লক্ষ 40 হাজার মাইল দূরে চাঁদে পৌছাইতে টেলিভিসানটির 63½ ঘণ্টা লাগিয়াছে। এখন হইতে দু' বছরের মধ্যেই (সম্ভবত) কোন মার্কিন মহাকাশচারী চন্দ্রে যাইবেন।

আমেরিকার তৃতীয় উদ্যম সফল। মার্কিন মহাকাশযান 'জেমিনি-9' 1966 সালের 3রা জুন যাত্রা শুরু করিয়াছিল। এই দুঃসাহসিকতম অভিযানে ব্রতী হইয়াছিলেন বিমানবাহিনীর লেঃ কর্নেল টমাস স্ট্যাফোরড এবং নৌবহরের লেঃ কমাণ্ডার ইউজেন সারনন। একটি টাইটান রকেট মহাকাশযানটিকে উৎক্ষেপ করে। তার আগে যায় একটি অগ্রগামী কৃত্রিম উপগ্রহ 'আজেনা'। মহাকাশযান জেমিনি-9 এবং অগ্রগামী রকেট 'আজেনা'র সঙ্গে মিলন সম্ভব হয়। মহাকাশযাত্রার ইতিহাসে

এই ঘটনা নবতম দিকচিহ্ন। সারলনের এই অভিযান নানা কারণে দুঃসাহসিক। তিনিই প্রথম মানব-উপগ্রহ হিসাবে মহাকাশে পা দিলেন। দরজা খুলিয়া মহাশূন্যে পা বাড়াইবার আগে সারলন একবার দম নিলেন। পূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাইলেন নীচে নিরালম্ব বিশ্বের দিকে। তারপর শুরু করিলেন তাঁর বিস্ময়কর অভিযান। তিনি 5ই জুন ভারতীয় সময় রাত্রি 8টা 34 মিনিটে জেমিনি-9-এর দরজা খুলিয়া মহাকাশ বিচরণ শুরু করিয়া 2 ঘণ্টা 5 মিনিট কাল বাহিরে থাকিয়া তাঁর কেবিনে নিরাপদে ফিরিয়া আসেন। রকেট লাগানো উড়ন্ত চেয়ারে বসিয়া তিনি প্রায় দুইবার বিশ্ব প্রদক্ষিণ করিলেন। মহাকাশে 72 ঘণ্টা 21 মিনিট ধরিয়া পৃথিবী পরিক্রমার পর মহাকাশচারী স্টাফোরড এবং সারলন নিরাপদে পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন। মহাকাশে অবস্থানকালে তাঁহারা 45 বার পৃথিবী প্রদক্ষিণ করেন এবং প্রায় 12 লক্ষ মাইল ভ্রমণ করেন।

আমরা বিশ্বাস করি—'খোলো খোলো, হে আকাশ, স্তব্ধ তব নীল যবনিকা'—একদিন কবির এই প্রত্যাশা বিজ্ঞানীদের সাধনায় বাস্তব ও সত্য হইয়া দেখা দিবে, এবং সেই মহালগ্নটি দূরবর্তী নয়।

মহাবিজ্ঞানী নিউটনের সেই মহাকর্ষের নিয়মের সাহায্যেই উপগ্রহ উৎক্ষেপণ সম্ভব হইয়াছে। কোন বস্তুকে উপরে ছুঁড়িলে মাধ্যাকর্ষণের জন্য বস্তুটি নীচের দিকে নামিতে নামিতে আবার পৃথিবীতে ফিরিয়া আসে। পৃথিবীর আকর্ষণজনিত বলের জন্যই কোন বস্তুকে ভারী বলিয়া মনে হয়। সুতরাং যেখানে পৃথিবীর এই অভিকর্ষবলকে অন্য কোনরূপ বলের দ্বারা প্রশমিত করা যায় অর্থাৎ অভিকর্ষ বলের সমান ও বিপরীতমুখী বল বস্তুর উপর প্রয়োগ করা যায় সেখানে বস্তুর কোন ভার বা ওজন থাকিবে না। এই অবস্থাকেই বস্তুর **ভারশূন্য** (weightless state) বলে।

বিজ্ঞানীরা হিসাব করিয়া দেখিয়াছেন যে যদি কোন বস্তুকে ভূপৃষ্ঠ হইতে কমপক্ষে 560 মাইল উর্ধ্বে তুলিয়া দিয়া উহার মধ্যে ভূ-পৃষ্ঠের সমান্তরালভাবে ঘণ্টায় 17000 হইতে 18000 মাইল বেগ সঞ্চার করা যায়, উহা পৃথিবীর কৃত্রিম উপগ্রহে পরিণত হইবে এবং বৃত্তাকারে ঘুরিতে থাকিবে। এই অবস্থায় বস্তুটির উপর দুইটি বিপরীতমুখী বল ক্রিয়া করে, একটি অভিকেন্দ্র বল যাহা বস্তুটিকে পৃথিবীর কেন্দ্রের দিকে টানে, আর একটি অপকেন্দ্র বল, যাহা বস্তুটিকে মহাশূন্যে টানিয়া লইবার চেষ্টা করে। দুইটি সমান ও বিপরীত মুখী বল বস্তুটির উপর ক্রিয়া করার ফলে বস্তুটি ভারশূন্য অবস্থা প্রাপ্ত হইবে—যাহার ফলে বস্তুটি পৃথিবীর দিকে নামিয়া আসিবে না। মহাশূন্যে ছুটিয়াও যাইতে পারিবে না—পৃথিবীর চতুর্দিকে

উঠিবার সময় আমাদের কত কষ্ট হয়, তার কারণ পৃথিবীর আকর্ষণ-বল আমাদের উপর ক্রিয়া করিয়া নীচের দিকে টানিতে থাকে। এই টান না থাকিলে হঠাৎ পা হড়কাইয়া যাইলেও আমরা গড়াইতে গড়াইতে পড়িয়া যাইব না।

আমরা যদি খাট হইতে জোরে ঘরের মেঝেতে নামিয়া পড়ি তাহা হইলে মেঝের প্রতিক্রিয়া আমাদের অমনি ছাদের দিকে ঠেলিয়া দিবে, ছাদে গিয়া মাথা ঠেকিলেই ছাদের প্রতিক্রিয়ায় আবার মেঝের দিকে নামিয়া পড়িব। এইরূপ পরিস্থিতির জন্য আমরা নিশ্চয়ই নাচিতে থাকিব।

আমরা সহজেই এক দেওয়াল হইতে অন্য দেওয়ালে হাঁটিয়া যাইতে পারিব। একবার ঘুরিয়া দাঁড়াইতে চাহিলে বার বার আমাদের পাক খাইতে হইবে। জল দিয়া কুলি করিলে, খুব জোরে জল বাহির করিয়া না দিলে জল মুখের ভিতরই থাকিয়া যাইবে। কোন খাদ্যই গলার নালী দিয়া ভিতরে নামিবে না। সহজেই খাড়া দেওয়াল বহিয়া উঠিতে পারিব। কিন্তু মুস্কিল বাধিবে থামিতে। ঘড়ির পেণ্ডুলাম আর দুলিবে না। সুতরাং এই ভারশূন্যতার জন্য জীবনের সর্বস্তরে নানা বিপর্যয় দেখা দিবে। কিন্তু বিজ্ঞানীরা বলেন অভ্যাসের ফলে এরূপ বিপর্যয় কাটিয়ে ওঠা অসম্ভব হইবে না। বর্তমানে রাশিয়ায় ও আমেরিকায় ভবিষ্যতে অন্য গ্রহে বা চন্দ্রে যাইবার জন্য ভারশূন্য অবস্থায় জীবন যাপন করিবার অভ্যাস করান হইতেছে।

প্রশ্নাবলী

1. নিউটনের মহাকর্ষ সূত্রটি উদাহরণ দ্বারা ব্যাখ্যা কর। অভিকর্ষ ও অভিকর্ষজ ত্বরণ কাহাকে বলে ?

2. চন্দ্র সূর্য অপেক্ষা অনেক ছোট। পৃথিবীর জলের উপর চন্দ্রের টান বেশী, না সূর্যের টান বেশী বল। কেন এই টান বেশী ?

3. "বিভিন্ন আকারের ও বিভিন্ন পদার্থের বস্তু উপর হইতে নীচে নিক্ষেপ করিলে উহারা প্রায় একই সময় মাটিতে পড়ে।"—এই উক্তিটির সত্যতা পরীক্ষার দ্বারা প্রমাণ কর।

4. ভর ও ওজনের পার্থক্য বুঝাইয়া বল। পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে বস্তুর ভর একই থাকে কিন্তু ওজন পৃথক হয় কেন ? একটি বস্তুর ওজন কোথায় বেশী হইবে—মেরুতে, না নিরক্ষরেখায় ?

5. জ্যোতিষ্ক কাহাকে বলে ? সৌর জগতের সকল জ্যোতিষ্ক সূর্যের চতুর্দিকে কেন ঘুরে ?

6. জোয়ার-ভাটা কাহাকে বলে? উহাদের উৎপত্তির কারণ ব্যাখ্যা কর। ভরা কটাল ও মরা কটাল কাহাকে বলে?

7. কৃত্রিম উপগ্রহ কি? উহা কবে ও কোন্ দেশে সর্বপ্রথম আবিষ্কৃত হয়? কৃত্রিম উপগ্রহ উৎক্ষেপণ প্রণালী সংক্ষেপে বুঝাইয়া বল। কৃত্রিম উপগ্রহ উৎক্ষেপণে তিন পর্যায় বিশিষ্ট রকেট ব্যবহার করা হয় কেন?

8. ভারশূন্য অবস্থা সম্বন্ধে যাহা জান সংক্ষেপে বুঝাইয়া বল। চন্দ্র কেমন করিয়া পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করিতেছে?

9. ঠিক উত্তরটির পাশে '✓' চিহ্ন দাও :—

(i) দুই বস্তুর মধ্যে আকর্ষণ-বল উহাদের দূরত্বের সমানুপাতিক হয়।

(ii) এক খণ্ড পাথরকে পৃথিবী যে নিয়মে আকর্ষণ করে সূর্যও পৃথিবীকে সেই নিয়মে আকর্ষণ করে।

(iii) দুই বস্তুর মধ্যে আকর্ষণ-বল উহাদের ভরের গুণফলের সমানুপাতিক হয়।

(iv) বায়ুশূন্য স্থানে এক টুকরা কাগজ একটি পয়সা অপেক্ষা দ্রুত পড়ে।

(v) অমাবস্যা তিথিতে ভরা কটাল হয়।

(vi) পূর্ণিমা তিথিতে মরা কটাল হয়।

(vii) অষ্টমী তিথিতে ভরা কটাল হয়।

(viii) অষ্টমী তিথিতে মরা কটাল হয়।

10. শূন্যস্থান পূর্ণ কর :—

(i) — তিথিতে চন্দ্র ও সূর্য পৃথিবীর — দিকে এবং — পূর্ণিমা তিথিতে চন্দ্র ও সূর্য পৃথিবীর — দিকে থাকে বলিয়া এই দুই তিথিতে উভয়ের মিলিত — খুবই প্রবল হয়। ইহার ফলে ঐ দুই তিথিতে যে জোয়ার সৃষ্টি হয় তাহাকে — কটাল বলে।

(ii) পৃথিবী ও চাঁদ উভয়েরই — আছে। পৃথিবী হইতে যাত্রা করিয়া চাঁদের দিকে যাইতে থাকিলে পৃথিবীর আকর্ষণ ক্রমশঃ — ও চাঁদের আকর্ষণ — থাকে। এইভাবে যাইতে যাইতে কোন এক স্থানে পৃথিবী ও চাঁদের আকর্ষণ — হইবে। তখনই — — সম্মুখীন হইতে হইবে।

(iii) বিশ্বের যে কোন দুইটি বস্তু সর্বদা পরস্পরকে যে আকর্ষণ-বলে টানে তাহাকে — বলে। — এই সূত্রের আবিষ্কারক — বলিয়া ইহাকে — — সূত্র বলে।

চতুর্থ অধ্যায়

আলোক (Light)

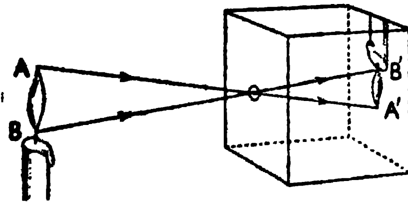
আলোকের সরলরেখায় গমন ; ছায়া ; গ্রহণ
(Light travels in a straight line ; shadows ; eclipse.)

27. আলোকের প্রকৃতি (Nature of light) **:** আলোক একপ্রকার শক্তি। যে বাহ্যিক কারণে আমাদের চক্ষুতে দর্শন অনুভূতির সৃষ্টি হয়, তাহাকে **আলোক** বলে। সকল শক্তির ন্যায় আলোক অদৃশ্য। আলোক আমরা দেখিতে পাই না। আলোক দ্বারা উদ্ভাসিত বস্তুকেই আমরা দেখি।

28. আলোক সরলরেখায় চলে : সর্বত্র সমধর্মী স্বচ্ছ মাধ্যমের মধ্য দিয়া আলোক সরলরেখায় গমন করে। অন্ধকার ঘরে জানালার সূক্ষ্ম ছিদ্র দিয়া সূর্যালোক আসিতে দিলে বায়ুতে ভাসমান ধূলিকণা-উদ্ভাসিত আলোক-রশ্মির পথকে সরল বলিয়া মনে হয়। মোটর গাড়ির হেড লাইটের আলো কুয়াশার মধ্য দিয়া যাইলে দেখা যায় যে, উহা সরলরেখায় ধাবিত হইতেছে।

পরীক্ষা : সূক্ষ্ম ছিদ্রমুখ ক্যামেরা (Pinhole Camera) : সূক্ষ্ম ছিদ্রমুখ ক্যামেরার সাহায্যে আলোক যে সরলরেখায় চলে তাহার প্রমাণ করা যায়। ইহা চারিদিকে ঘেরা একটি আয়তাকার বাক্স বিশেষ। ইহার সম্মুখের দেওয়ালে একটি সূক্ষ্ম ছিদ্র 'O' (চিত্র 31) এবং পশ্চাতের দেওয়ালে একটি ঘসাকাঁচ বা ফটোগ্রাফ পাত থাকে।

বাক্সের ভিতর হইতে আলোকের প্রতিফলন এড়াইবার জন্য উহার ভিতরটি কালো রঙ করা হয়। এখন ছিদ্রটির সম্মুখে একটি প্রজ্জলিত মোমবাতি ধরিলে ঘসা কাঁচের উপর আলোক-শিখার একটি উল্টা প্রতিচ্ছবি পড়িবে। শিখার A বিন্দু হইতে আগত আলোকরশ্মি O বিন্দুর ভিতর দিয়া সরলরেখায় চলিয়া ঘসা কাঁচে A' বিন্দুতে পতিত হয় এবং B বিন্দু হইতে আগত আলোকরশ্মি B' বিন্দুতে পতিত হয়। ফলে AB শিখার উল্টা প্রতিচ্ছবি $A'B'$ পাওয়া যায়। আলোক



চিত্র 31
সূক্ষ্ম-ছিদ্রমুখ ক্যামেরা

সরলরেখায় গমন না করিলে মোমবাতির আলোক-রশ্মির উল্টা প্রতিচ্ছবি সম্ভবপর হইত না। সুতরাং এই পরীক্ষা হইতে ইহাই প্রমাণিত হয় যে, **আলোক সরলরেখায় গমন করে।**

বস্তুর আকার, সূচীছিদ্র হইতে বস্তুর দূরত্ব এবং ক্যামেরা বাক্সের দৈর্ঘ্য—এই তিনটি জিনিসের উপর প্রতিচ্ছবির আকার নির্ভরশীল। বস্তুর আকার বাড়িলে বা কমিলে প্রতিচ্ছবির আকার যথাক্রমে বাড়িবে বা কমিবে।

সূক্ষ্মছিদ্রমুখ বা সূচীছিদ্র হইতে বস্তুটির দূরত্ব বাড়িলে প্রতিচ্ছবির আকার কমিবে কিন্তু ক্যামেরা হইতে বাক্সের দৈর্ঘ্য বাড়িলে প্রতিচ্ছবির আকার বাড়িবে। মনে রাখিও—

$$\frac{\text{প্রতিচ্ছবির আকার}}{\text{বস্তুর আকার}} = \frac{\text{ক্যামেরা বাক্সের দৈর্ঘ্য}}{\text{সূচীছিদ্র হইতে বস্তুর দূরত্ব}}$$

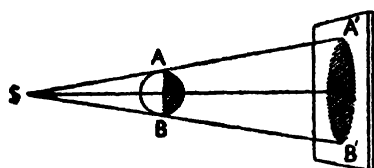
ছিদ্রটির আকার বড় হইবার ফল—যদি সূচীছিদ্রটি বড় করা যায় তবে প্রতিচ্ছবি উজ্জ্বলতর হইবে কিন্তু অস্পষ্টও হইয়া যাইবে। একটি একটি বড় ছিদ্রকে বহুসংখ্যক সূচীছিদ্রের সমষ্টি বলিয়া ধরা যাইতে পারে। প্রত্যেকটি সূচীছিদ্র এক একটি প্রতিচ্ছবির সৃষ্টি করিবে এবং এই প্রতিচ্ছবিগুলি একে অপরের উপর পড়িয়া আসল প্রতিচ্ছবিকে অস্পষ্ট করিবে। ছিদ্রটি খুব বড় হইলে নির্দিষ্ট আকারের কোন প্রতিচ্ছবি গঠিত হইবে না।

29. **ছায়া (Shadow) :** একটি আলোক উৎসের গতিপথে কোন অস্বচ্ছ বস্তু রাখিলে উহার পশ্চাতে খানিকটা স্থান জুড়িয়া অন্ধকার থাকে। ঐ অন্ধকারময় স্থানকে অস্বচ্ছ বস্তুর **ছায়া** (shadow) বলে। ছায়ার আকার বস্তুটির অনুরূপ হয়।

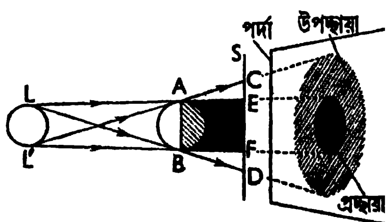
30. প্রচ্ছায়া ও উপচ্ছায়া (Umbra and Penumbra) : (i) আলোর উৎস (S) যদি বিন্দুসম হয় এবং অস্বচ্ছ বস্তুটি (AB) যদি বড় হয় তাহা হইলে প্রতিবন্ধকের পিছনে অবস্থিত পর্দায় বস্তুটির একটি বেশ ঘন কালো ছায়া A' B' পাওয়া যায়। ইহার নাম **প্রচ্ছায়া** (umbra)। পর্দা ও প্রতিবন্ধকের মধ্যে দূরত্ব বাড়াইলে ছায়ার আকার বাড়িবে এবং দূরত্ব কমাইলে ছায়ার আকার কমিবে (চিত্র 32)।

(ii) আলোক-উৎস যদি বিস্তৃত হয় অর্থাৎ বিন্দুর চেয়ে বড় হয় কিন্তু অস্বচ্ছ বস্তু অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর হয় তাহা হইলে দুই রকমের ছায়া পড়ে—একটি ঘন কালো প্রচ্ছায়া ও আর একটি হাল্কা কালো উপচ্ছায়া (Penumbra)। প্রথমটিতে

গাঢ় অন্ধকার, দ্বিতীয়টিতে আংশিক অন্ধকার থাকে। 33 চিত্রে দেখা যায় যে EF অংশ আলোক উৎস হইতে কোনরূপ আলোক পায় না। সেইজন্য এই অংশে



চিত্র 32
প্রচ্ছায়া।



চিত্র 33
প্রচ্ছায়া ও উপচ্ছায়া।

গাঢ় অন্ধকার থাকে। ইহাই **প্রচ্ছায়া** (Umbra) এবং CE ও FD অংশে বিস্তৃত আলোক উৎস হইতে কিছু আলো আসে। এই দুই অংশে আংশিক অন্ধকার থাকে। ইহাই **উপচ্ছায়া** (Penumbra)।

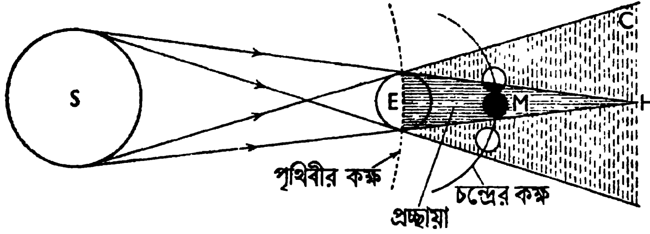
(iii) আলোক উৎস বিস্তৃত কিন্তু অস্বচ্ছ বস্তু অপেক্ষা বৃহত্তর হইলে পর্দার বিভিন্ন অবস্থানের উপর বিভিন্ন ছায়া পড়ে।

31. গ্রহণ (Eclipses) : গ্রহণে আলোক-রশ্মির সরলরেখায় গমনের জন্য ছায়ার উৎপত্তি একটি প্রাকৃতিক দৃষ্টান্ত।

অস্বচ্ছ বস্তু কর্তৃক ছায়ার সৃষ্টির ফলে সূর্য ও চন্দ্রগ্রহণ হয়। পৃথিবী ও চন্দ্র উভয়েই অস্বচ্ছ ও অপ্রভ পদার্থ। সূর্যের আলোক-রশ্মি উহাদের উপর পড়িয়া উহাদিগকে আলোকিত করে। চন্দ্র নিজ কক্ষপথে পৃথিবীর চারিদিকে নির্দিষ্ট সময়ে একবার ঘুরিয়া আসে। আবার পৃথিবী চন্দ্রকে লইয়া নিজ কক্ষপথে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে। এই পরিক্রমণের সময় অমাবস্যায় চন্দ্র যখন সূর্য ও পৃথিবীর মধ্যে আসিয়া পড়ে, তখন চন্দ্রের ছায়া পৃথিবীতে পড়িয়া সূর্যগ্রহণের সৃষ্টি করে এবং পূর্ণিমায় যখন চন্দ্র ও সূর্যের মধ্যে পৃথিবী আসিয়া পড়ে, তখন পৃথিবীর ছায়ার মধ্যে চন্দ্র প্রবেশ করিলে চন্দ্রগ্রহণ হয়। সুতরাং সূর্যগ্রহণের সময় চাঁদ অস্বচ্ছ বস্তু এবং চন্দ্রগ্রহণের সময় পৃথিবী অস্বচ্ছ বস্তুর কাজ করে।

চন্দ্রগ্রহণ (Lunar Eclipse) : এখানে সূর্য আলোক-উৎস, পৃথিবী অস্বচ্ছ পদার্থ এবং চন্দ্র পর্দা। পূর্ণিমায় পৃথিবী চন্দ্র ও সূর্যের মাঝখানে আসিয়া সূর্যালোকের গতিরোধ করে। তাহার ফলে সূর্যের (S) বিপরীত দিকে উহার ছায়া পড়ে। চন্দ্র (M) পৃথিবীর (E) এই ছায়ার মধ্যে প্রবেশ করিলে চন্দ্রগ্রহণ

হয় (34 চিত্র)। চন্দ্র পৃথিবীর প্রচ্ছায়া কর্তৃক সম্পূর্ণ আবৃত হইলে উহা আর দৃষ্টিগোচর হয় না। তখন চন্দ্রের **পূর্ণগ্রহণ** (Full Eclipse) হয়। আর চন্দ্র কতকাংশ প্রচ্ছায়া কর্তৃক এবং কতকাংশ উপচ্ছায়া কর্তৃক আবৃত হইলে চন্দ্রের

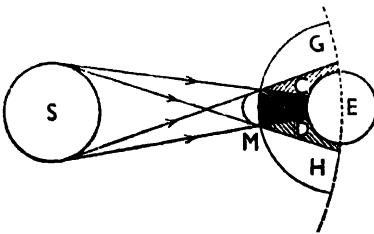


চিত্র 34
চন্দ্রগ্রহণ

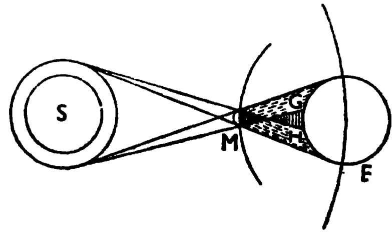
খণ্ডগ্রাস (Partial eclipse) হয়। চন্দ্রের সমস্ত অংশ উপচ্ছায়ার মধ্যে থাকিলে চন্দ্রগ্রহণ হয় না, কেবল উহার উজ্জ্বলতা কমিয়া যায়। পৃথিবীর আকার চন্দ্র অপেক্ষা বহুগুণ বড়। সেইজন্য পৃথিবীর প্রচ্ছায়া শঙ্কুর শীর্ষবিন্দু (H) সর্বদা চন্দ্রের কক্ষপথ ছাড়াইয়া যায়।

সুতরাং চন্দ্রের বলয় গ্রাস (Annular Eclipse) কখনও সম্ভব হয় না।

সূর্যগ্রহণ (Solar Eclipse) :—ইহা তিন প্রকার হইতে পারে। যথা (1) পূর্ণগ্রহণ, (2) খণ্ডগ্রাস ও (3) বলয় গ্রহণ।



চিত্র 35
সূর্যগ্রহণ (পূর্ণ ও আংশিক)



চিত্র 36
সূর্যগ্রহণ (বলয় গ্রাস)

অমাবস্থার দিন সূর্য (S) ও পৃথিবীর (E) মাঝখানে যখন চন্দ্র (M) আসিয়া পড়ে তখন সূর্য হইতে আলোকরশ্মি অস্বচ্ছ চন্দ্র কর্তৃক বাধাপ্রাপ্ত হইয়া ছায়ার সৃষ্টি করে। পৃথিবী চন্দ্রের ছায়ার মধ্যে প্রবেশ করিলে সূর্যগ্রহণ (Solar eclipse) হয়। চন্দ্র পৃথিবীর তুলনায় আকারে অনেক ছোট। সুতরাং পৃথিবীর খানিকটা অংশ CD

চন্দ্রের প্রচ্ছায়ার মধ্যে থাকিতে পারে এবং সেই অংশ হইতে সূর্যকে দেখাও যায় না— সেইজন্য ঐ অংশে **পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণ** হয়। *CG* ও *DH* অংশ উপচ্ছায়া। পৃথিবীর যে অংশ *CG* ও *DH* এর মধ্যে থাকে সেইসব অংশের লোক সূর্যের কিছু অংশ দেখিতে পায়। ঐ সকল স্থানে সূর্যের **খণ্ডগ্রহণ** হইবে (চিত্র 35)।

পৃথিবীর খুব কম অংশ চন্দ্রের প্রচ্ছায়ার মধ্যে পড়ে বলিয়া পৃথিবীর খুব অল্প স্থান হইতে সূর্যের পূর্ণ গ্রহণ দেখিতে পাওয়া যায়।

পৃথিবী আকারে চন্দ্র অপেক্ষা অনেক বড়। চন্দ্র, সূর্য ও পৃথিবীর মধ্যে পরস্পরের দূরত্বের সামান্য তারতম্য হওয়ায় সময়ে সময়ে এমন হয় যে সূর্যগ্রহণের সময়ে চন্দ্রের প্রচ্ছায়া পৃথিবীকে স্পর্শ করিবার পূর্বেই শেষ হইয়া যায় অর্থাৎ পৃথিবী চন্দ্রের প্রচ্ছায়া শঙ্কুর বাহিরে অবস্থান করে। সেইজন্য উহাকে বাড়াইয়া যে বিপরীত অপসারী শঙ্কু উৎপন্ন হয়, তাহা পৃথিবীকে স্পর্শ করে। 36 চিত্রে পৃথিবীর *GH* অংশে ঐ শঙ্কু স্পর্শ করিয়াছে। পৃথিবীর ঐ *GH* অংশে যে কোন স্থান হইতে সূর্যকে লক্ষ্য করিলে সূর্যের মাঝখানে একটি অন্ধকারাবৃত বৃত্তাকার অংশ এবং উহার চতুর্দিকে আলোকিত অংশ দেখিতে পাওয়া যাইবে। কালো চক্রের চারিদিকে সূর্যকে একটা উজ্জ্বল বলয়ের মত দেখায় বলিয়া ইহাকে সূর্যের **বলয়-গ্রাস** বা **বলয়-গ্রহণ** (Annular Eclipse) বলে।

সব অমাবস্যায় বা পূর্ণিমায় গ্রহণ হয় না কেন ?

চন্দ্রগ্রহণ বা সূর্যগ্রহণের সময় দেখায় যে, সূর্য, চন্দ্র এবং পৃথিবীকে প্রায় একই সরলরেখায় আসিতে হইবে। পৃথিবীর কক্ষতলের ও চন্দ্রের কক্ষতলের মধ্যে প্রায় 5° ব্যবধান আছে। ইহার ফলে প্রত্যেক পূর্ণিমাতেই চন্দ্র পৃথিবীর ছায়ার ভিতর আসে না—হয় উপরে কিংবা নীচে অবস্থান করে। সেইজন্য গ্রহণ হয় না। ঠিক এই কারণেই প্রত্যেক অমাবস্যাতেও চন্দ্রের ছায়া পৃথিবীর উপর পড়িতে পারে না। যে পূর্ণিমায় বা অমাবস্যায় চন্দ্র, সূর্য ও পৃথিবী এক সরলরেখায় আসিবে তখন গ্রহণ হইবে। প্রত্যেক অমাবস্যায় বা পূর্ণিমায় গ্রহণ না হইবার আর একটি কারণ চন্দ্র ও সূর্য হইতে পৃথিবীর দূরত্ব কমে বা বাড়ে।

আলো নির্দিষ্ট বেগে গমন করে

(Light travels with definite velocity)

32. **আলোর গতিবেগ** (velocity of light) **:** আলোকের একটা নির্দিষ্ট গতিবেগ আছে। বিজ্ঞানীরা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে আলো প্রতি সেকেণ্ডে

প্রায় 186,000 মাইল গতিবেগ লইয়া চলে। মিটারে প্রকাশ করিলে আলোর গতিবেগ প্রতি সেকেণ্ডে হয় 300,000,000 মিটার। সূর্য হইতে পৃথিবীর দূরত্ব প্রায় 9300,000,000 মাইল এবং সূর্য হইতে পৃথিবীতে আলোর পৌঁছাইতে সময় লাগে প্রায় 8·3 মিনিট। আলোর এই প্রচণ্ড গতিবেগের জন্য পৃথিবীর উপরে কোথাও আলো জ্বলিলে মনে হয় যে আমরা উহা তৎক্ষণাৎ দেখিতে পাই। ইহার কারণ আলোর গতিবেগের তুলনায় এই দূরত্ব খুবই কম।

সর্বাধুনিক পরিমাপ অনুযায়ী শূন্যে আলোর গতিবেগ প্রতি সেকেণ্ডে 186285 মাইল। আলোর গতিবেগ শব্দের গতিবেগ অপেক্ষা অনেক বেশী। শব্দের গতিবেগ প্রতি সেকেণ্ডে 1120 ফুট মাত্র। আকাশে বিদ্যুৎ চমকাইবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে আমরা উহা দেখিতে পাই কিন্তু তাহার বেশ কিছু সময় পরে আমরা উহার শব্দ শুনিতে পাই। ষ্টীমারের ধোঁয়া আগে আমাদের চক্ষে আসিয়া পৌঁছায়—তারপরে ভোঁয়ের শব্দ শুনিতে পাই। ইহা হইতে প্রমাণিত হয় যে আলোর গতিবেগ শব্দের গতিবেগ অপেক্ষা অনেক বেশী।

প্রশ্নাবলী

1. আলো যে সরলরেখায় চলে তাহা একটা পরীক্ষার দ্বারা বুঝাও।

2. সূচী-ছিদ্র ক্যামেরার বর্ণনা দাও এবং উহার ক্রিয়া ব্যাখ্যা কর। ইহার দ্বারা আর কি প্রমাণ করা যায়? ছিদ্র বড় করিলে কি ফল হইবে বর্ণনা কর। ছিদ্র হইতে ঘষা কাচের দূরত্ব বৃদ্ধি করিলে কি হয়?

3. গ্রহণের কারণ কি? সূর্যগ্রহণ কয় প্রকার ও কি কি? চিত্রের সাহায্যে সূর্যগ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণ ব্যাখ্যা কর।

4. আলো ও ছায়া সম্বন্ধে যাহা জান লিখ। সূর্য ও চন্দ্রগ্রহণের সময় আলো ও ছায়ার ক্রিয়া চিত্রের সাহায্যে ব্যাখ্যা কর।

5. প্রচ্ছায়া ও উপচ্ছায়ার পার্থক্য কি? পাখী যখন নীচু দিয়া উড়ে তখন উহার ছায়া মাটিতে পড়ে কিন্তু উপরে উঠিলে ছায়া দেখা যায় না কেন?

6. বলয়গ্রহণ কি? ইহা সূর্যের হয়, না চন্দ্রের হয়? ইহা কিরূপে হয়? প্রত্যেক অমাবস্যায় এবং পূর্ণিমায় গ্রহণ হয় না কেন?

7. নির্ভুল উক্তিগুলির পার্শ্বে '✓' চিহ্ন দাও?

(i) বিন্দুবৎ আলোক-প্রভব হইতে পর্দা সরাইলেও ছায়ার আকৃতির পরিবর্তন হয় না।

(ii) পৃথিবী ও সূর্যের মধ্যে চন্দ্র আসিলে সূর্যগ্রহণ হয়।

(iii) পূর্ণিমায় চন্দ্রগ্রহণ হয় না।

(iv) অমাবস্যায় সূর্যগ্রহণ হয়।

(v) পূর্ণিমায় সূর্যগ্রহণ হয়।

(vi) প্রতি অমাবস্যায় ও প্রতি পূর্ণিমায় গ্রহণ সম্ভবপর।

(vii) চন্দ্রের বলয়গ্রাস সম্ভবপর।

(viii) সূচী-ছিদ্র ক্যামেরায় লক্ষ্য বস্তুর উল্টা প্রতিচ্ছবির সৃষ্টি হয়।

(ix) আলোক-প্রভব ও অস্বচ্ছ পদার্থ সমান আকৃতির হইলেও প্রচ্ছায়ার পদার্থের সমান আকৃতি হয় না।

(x) চন্দ্র স্বচ্ছ ও স্বপ্রভ পদার্থ।

পঞ্চম অধ্যায়

আলোকের প্রতিফলন

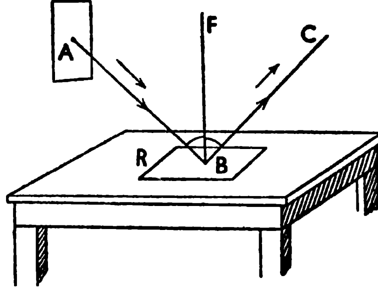
(Reflection of Light)

33. সমতলে প্রতিফলন (Reflection of light at plane surface): কোন স্বচ্ছ সমসত্ত্ব মাধ্যমে আলোক-রশ্মি সরলরেখায় গমন করে। কিন্তু উহা যখন এক মাধ্যমে চলিতে চলিতে অপর দ্বিতীয় মাধ্যমের মসৃণ তলে আপতিত হয়, তখন আপতিত আলোর কিছু অংশ দ্বিতীয় মাধ্যমের তল হইতে দুইটি নিয়মে পুনরায় প্রথম মাধ্যমে ফিরিয়া আসে, বা প্রতিফলিত (reflected) হয়। ইহাকে **আলোকের প্রতিফলন** (reflection of light) বলে।

মসৃণ তলকে বলা হয় **প্রতিফলক** (reflector)। আয়না, পারদতল, চক্‌চকে ধাতব পাত্র প্রভৃতির মসৃণ তলকে দর্পণ বলে। এইরূপ মসৃণ তল প্রতিফলকের কাজ করে। প্রতিফলক যত মসৃণ হইবে আলোক তত বেশী পরিমাণ প্রতিফলিত হইবে।

AB রশ্মি (চিত্র 37) প্রতিফলক *R*-এর উপর *B* বিন্দুতে আপতিত হইয়াছে। ইহাকে **আপতিত রশ্মি** (incident ray) বলে। উহা প্রতিফলক *R* এর *B* বিন্দুতে বাধা পাইয়া ভিন্নপথ *BC*-তে চলে। *BC* রেখাকে **প্রতিফলিত রশ্মি** (reflected ray) বলে। *B* বিন্দুকে আপতন বিন্দু (point of

incidence) বলে। আপতন বিন্দু হইতে প্রতিফলকের উপর লম্বরেখা *BF*-কে অভিলম্ব (normal) বলে। আপতিত রশ্মি *AB* এই অভিলম্বের সহিত যে



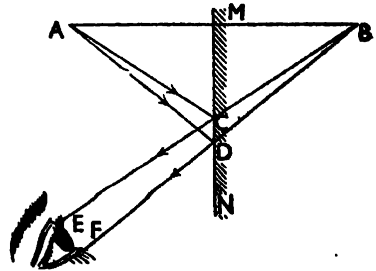
চিত্র 37
আলোকের প্রতিফলন

কোণ *ABF* করে তাহাকে আপতন কোণ (angle of incidence) এবং প্রতিফলিত রশ্মি *BC* ঐ অভিলম্বের সহিত যে কোণ *FBC* করে, তাহাকে প্রতিফলন কোণ (angle of reflection) বলে।

34. প্রতিফলনের নিয়ম (Laws of Reflection): মসৃণ পদার্থের উপর আলোর প্রতিফলন দুইটি নিয়ম দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়: (1) আপতিত রশ্মি, প্রতিফলিত রশ্মি ও আপতন বিন্দুতে অঙ্কিত অভিলম্ব একই সমতলে অবস্থান করে। (2) আপতন কোণ সর্বদা প্রতিফলন কোণের সমান হইবে অর্থাৎ $\angle ABF = \angle FBC$. (চিত্র 37)

35. সমতল দর্পণে প্রতিবিম্ব (Image by a plane mirror):

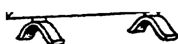
A বস্তুটিকে দর্পণ *MN*-এর ভিতর দিয়া দেখিলে বস্তুটির প্রতিবিম্ব *B*-তে দেখা যাইবে। দর্পণ হইতে *B*-এর দূরত্ব দর্পণ হইতে *A*-এর দূরত্বের সমান। অর্থাৎ বস্তু ও তাহার প্রতিবিম্ব দর্পণ (প্রতিফলক) হইতে সমান সমান দূরে থাকে। প্রতিফলিত রশ্মিদ্বয় *CE* ও *DF* দর্পণের সম্মুখে মিলিত হয় না। উহাদিগকে দর্পণের পশ্চাৎ দিকে বর্ধিত করিয়া দেখা যায় যে উহারা *B* বিন্দুতে মিলিত হইয়াছে



চিত্র 38
সমতল দর্পণে প্রতিবিম্ব

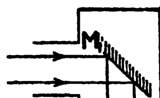
সুতরাং B বিন্দু A-এর অসদ্‌বিম্ব। সুতরাং সমতল দর্পণে গঠিত প্রতিবিম্ব অসৎ হইবে এবং দর্পণ হইতে বস্তুর ও তাহার প্রতিবিম্বের দূরত্ব সমান হইবে (চিত্র 38)।

36. পার্শ্বীয় পরিবর্তন (Lateral Inversion) : দর্পণে বস্তুর প্রতিবিম্ব উল্টা ধরনের হয়। আয়নার সম্মুখে দাঁড়াইলে আমাদের ডান হাতকে বাম হাত বলিয়া এবং বাম হাতকে ডান হাত বলিয়া মনে হয়। পুকুরের জলে পাশের গাছের প্রতিবিম্ব উল্টা। একটি কাগজে '*R*' অক্ষরটি লিখিয়া আয়নার সামনে ধরিলে (চিত্র 39) দেখা যাইবে যে প্রতিবিম্ব উল্টাইয়া গিয়াছে। প্রতিবিম্বের এই পরিবর্তনকে **পার্শ্বীয় পরিবর্তন** বলা হয়। ইহাও আলোর প্রতিফলনের নির্দিষ্ট নিয়মানুসারেই হয়।



চিত্র 39
প্রতিবিম্বের পার্শ্বীয় পরিবর্তন

37. সরল পেরিস্কোপ (Simple Periscope) : সরল পেরিস্কোপে দুইটি সমতল সমান্তরাল দর্পণে (চিত্র 40) পর পর দুইটি প্রতিফলনের নীতির সাহায্য লওয়া হইয়াছে। M_1 ও M_2 সমান্তরাল দর্পণ দুইটি একটি ফ্রেমে বা ধাতব নলে আটকানো থাকে। দর্পণ দুইটিকে পরস্পর সমান্তরাল রাখিয়া ইচ্ছামত এদিক ওদিক যে কোন কোণে ঘুরান যায়। ফ্রেমটিকে খাড়া অবস্থায় রাখিয়া নীচের দর্পণের (M_2) দিকে তাকাইলে বহু দূরের জিনিস দেখা যায়। উপরের দর্পণটিকে খুব দূরের কোন দ্রব্যের দিকে মুখ করিয়া রাখা হয়। দূরের কোন বস্তু হইতে আলোক-রশ্মি M_1 দর্পণে পড়িয়া অক্ষ বরাবর প্রতিফলিত হইয়া M_2 দর্পণে পড়ে এবং পুনরায় উহা হইতে প্রতিফলিত হইয়া দর্শকের চোখে পৌছায়। সুতরাং বাধার জন্য দূরের বস্তু সোজাসুজি দেখিতে না পাইলেও এই যন্ত্রের সাহায্যে এইভাবে দেখা যায়। এই যন্ত্রের সাহায্য লইয়া কলিকাতার গড়ের মাঠে বহু লোক ভীড়ের মধ্যেও পিছন হইতে খেলা দেখিতে পায়। যুদ্ধক্ষেত্রে পরিখার মধ্যে লুকাইয়া শত্রুসৈন্যের কার্যকলাপ লক্ষ্য করিতে এবং সাবমেরিন হইতে জলের উপরের কোন জাহাজ লক্ষ্য করিতেও এই পেরিস্কোপ ব্যবহার করা হয়।



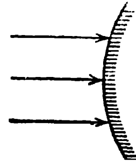


চিত্র 40
সরল পেরিস্কোপ

গোলীয় দর্পণে আলোকের প্রতিফলন
(Reflection of light at spherical Mirror)

38. অবতল ও উত্তল দর্পণ (Concave and Convex Mirrors) :

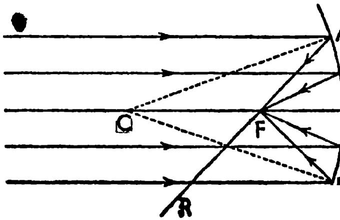
যদি কোন ফাঁপা গোলকের বাহির তল (surface) মসৃণ ও চকচকে হয় এবং ঐ তল হইতে আলোকরশ্মি প্রতিফলিত হয় তাহা হইলে তাহাকে **উত্তল দর্পণ** (convex mirror) বলে (চিত্র 41a) । আর যখন গোলকের ভিতর তলের মসৃণ ও চকচকে কোন অংশ হইতে আলোকরশ্মির প্রতিফলন হয় তখন তাহাকে **অবতল দর্পণ** (concave mirror) বলে (চিত্র 41b) ।



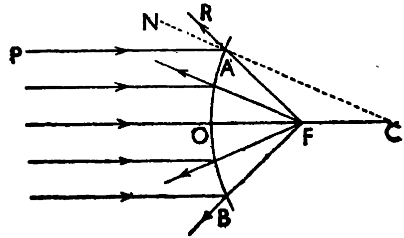
চিত্র 41a
উত্তল দর্পণ

চিত্র 41b
অবতল দর্পণ

42 (a ও b) চিত্রের অবতল ও উত্তল দর্পণের মধ্য-বিন্দু (O)-কে মেরু (pole) বলে। অবতল ও উত্তল দর্পণের মূল গোলকের কেন্দ্রকে (C) বক্রতাকেন্দ্র (centre of curvature) বলে। বক্রতাকেন্দ্র ও মধ্যবিন্দুর সংযোগকারী সরলরেখাটিকে



চিত্র 42a
অবতল দর্পণ



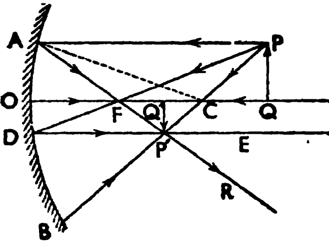
চিত্র 42b
উত্তল দর্পণ

(OC) দর্পণের প্রধান অক্ষ (principal axis) বলে। প্রধান অক্ষ (OC)-এর সমান্তরাল আলোকরশ্মি (PA) গোলীয় অবতল দর্পণের (চিত্র 42a) আপতন-বিন্দু (A) হইতে প্রতিফলিত হইয়া প্রতিফলিত রশ্মি AR প্রধান অক্ষের একটি নির্দিষ্ট বিন্দু (F) দিয়া যায় এবং উত্তল দর্পণের (চিত্র 42b) অক্ষের উপর নির্দিষ্ট বিন্দু F হইতে আসে বলিয়া মনে হয়। এই বিন্দুকে দর্পণের প্রধান ফোকাস বলে (principal focus)। প্রধান ফোকাস ও মেরুর মধ্যে যে দূরত্ব (OF) তাহাকে ফোকাস দূরত্ব (focal length) বলে। অবতল দর্পণের ফোকাস বিন্দুটি (F) সৎ

অর্থাৎ বাস্তব (real) এবং উত্তল দর্পণের ফোকাস বিন্দুটি (F) অসদ্‌বিন্দু (virtual) অর্থাৎ ইহার কোন সত্তা নাই।

39. গোলীয় দর্পণে প্রতিবিম্বের সৃষ্টি (Formation of image by mirror).

(A) অবতল দর্পণ : (1) বক্রতা-কেন্দ্রের বাহিরে বস্তুর অবস্থান :—

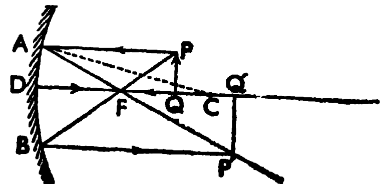


চিত্র 43a
বক্রতা কেন্দ্র (C)-এর বাহিরের বস্তু

(43a চিত্রে) বস্তু (PQ) দর্পণের বক্রতা-কেন্দ্র (C)-এর বাহিরে প্রধান অক্ষ (OCQ)-এর উপর লম্বভাবে অবস্থিত। P বিন্দু হইতে যে রশ্মি (PA) প্রধান অক্ষের সমান্তরাল ভাবে আসিয়া দর্পণে প্রতিফলিত হয় তাহা প্রতিফলনের পর মুখ্য ফোকাস (F) বিন্দুর মধ্য দিয়া (AR) চলিয়া যায়। প্রতিফলন কোণ PAC = প্রতিফলিত কোণ FAC।

P বিন্দু হইতে যে রশ্মি (PCB) বক্রতা-কেন্দ্রের মধ্য দিয়া না যাইয়া দর্পণে পড়ে তাহা দর্পণের অভিলম্ব হওয়ায় প্রতিফলনের পর C-এর মধ্য দিয়া পুনরায় সে পথেই ফিরিয়া আসিবে। P বিন্দু হইতে একটি রশ্মি ফোকাস (F) ধরিয়া দর্পণে পড়িয়া প্রধান অক্ষের সমান্তরাল (DE) হইয়া প্রতিফলিত হয়। AR, BC এবং DE রশ্মি পরস্পর P' বিন্দুতে মিলিত হয়। অতএব P' হইল P-এর বাস্তব (real) প্রতিবিম্ব। P' হইতে প্রধান অক্ষের উপর লম্ব টানিলে উহা প্রধান অক্ষকে Q' বিন্দুতে ছেদ করিবে। এই $P'Q'$-ই PQ-এর বাস্তব প্রতিবিম্ব (real image) বা সদ্‌বিম্ব। এই প্রতিবিম্ব সং, উল্টা এবং লক্ষ্য বস্তু PQ হইতে ছোট।

(2) বক্রতা-কেন্দ্র C এবং প্রধান ফোকাস F-এর মধ্যে বস্তুর অবস্থিতি হইলে (চিত্র 43b) লক্ষ্য-বস্তু PQ-এর যে প্রতিবিম্ব $P'Q'$ হয় তাহা সং, উল্টা এবং PQ হইতে বড় এবং ঐ বিম্ব বক্রতা-কেন্দ্রের বাহিরে হইবে।



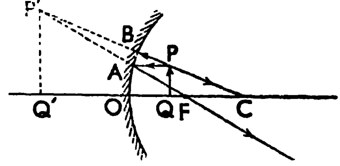
চিত্র 43b
F এবং C-এর মধ্যে বস্তু

(3) প্রধান ফোকাস-এর উপর লক্ষ্য-বস্তুর অবস্থান হইলে বস্তু হইতে আগত আলোক-রশ্মিগুলি দর্পণে প্রতিফলিত হইবার পর সমান্তরাল হইবে

এবং এইজন্য তাহারা অসীমে মিলিত হয়। এই ক্ষেত্রে প্রতিবিম্ব সৎ, উল্টা ও লক্ষ্যবস্তু হইতে আকারে খুব বড়।

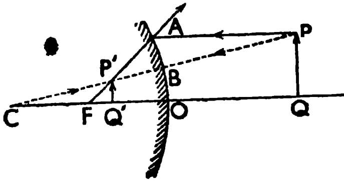
(4) বক্রতা-কেন্দ্রের উপর লক্ষ্যবস্তুর অবস্থান হইলে বক্রতা-কেন্দ্রের উপরই প্রতিবিম্ব পড়িবে। এক্ষেত্রে প্রতিবিম্ব সৎ, উল্টা ও লক্ষ্যবস্তুর সমান আকারের হইবে।

(5) লক্ষ্যবস্তু মেরু ও ফোকাসের মধ্যে অবস্থিত হইলে প্রতিবিম্ব অসৎ, সোজা ও লক্ষ্যবস্তু অপেক্ষা বড় হইবে এবং উহা দর্পণের পশ্চাতে গঠিত হইবে (চিত্র 43c)।



চিত্র 43c
মেরু ও ফোকাসের মধ্যে বস্তু

(B) **উত্তল দর্পণ :** 44 চিত্রে লক্ষ্য-বস্তু PQ প্রধান অক্ষের উপর লম্বভাবে অবস্থিত। P বিন্দু হইতে প্রধান অক্ষ (QOC)-এর সহিত সমান্তরাল ভাবে রশ্মি (PA) টানিলে দর্পণে প্রতিফলিত হইবার পর প্রধান ফোকাস F হইতে আসিতেছে বলিয়া মনে হয়। আর P বিন্দু হইতে বক্রতা C বিন্দুর মধ্য দিয়া PBC রশ্মি দর্পণের অভিলম্ব হওয়ায় প্রতিফলনের পর আবার সেই পথেই ফিরিয়া আসে। এই প্রতিফলিত রশ্মিদ্বয় পরস্পরকে ছেদ করে না। কিন্তু রশ্মি-দ্বয়কে পশ্চাতে বাড়াইলে তাহারা P' বিন্দুতে মিলিত হয়। এক্ষেত্রে P' হইল লক্ষবস্তু P-এর প্রতিবিম্ব। প্রধান অক্ষের উপর $P'Q'$ লম্ব টানিলে $P'Q'$-ই PQ-এর প্রতিবিম্ব হইবে। এই প্রতিবিম্ব অসৎ, সোজা এবং PQ অপেক্ষা আকারে ক্ষুদ্রতর। উত্তল দর্পণের সম্মুখে যে কোন দূরত্বে লক্ষ্যবস্তু স্থাপন করিলে উহার প্রতিবিম্ব সর্বক্ষেত্রেই অসৎ, সোজা এবং লক্ষ্যবস্তু অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর হইবে।



চিত্র 44
উত্তল দর্পণে প্রতিবিম্ব গঠন

প্রশ্নাবলী

1. আলোর প্রতিফলন কাহাকে বলে? প্রতিফলনের নিয়ম কি কি?

2. প্রতিবিম্ব বলিতে কি বোঝ? প্রতিবিম্ব কয় প্রকার? উহাদের মধ্যে পার্থক্য কি? প্রতিবিম্বের পার্শ্বীয় পরিবর্তন কাহাকে বলে?

3. আলোক-রশ্মির প্রতিফলনের নিয়ম বল। কোন বিন্দুপ্রভব হইতে নির্গত

আলোকরশ্মি সমতল দর্পণ কর্তৃক প্রতিফলিত হইয়া যে একটি বিন্দু হইতে অপসৃত হয় তাহা দেখাও। ঐ বিন্দুকে কি বলে? উহার প্রকৃতি কিরূপ?

[H. S. Exam. 1960]

4. সমতল দর্পণ কিরূপে প্রতিবিম্ব সৃষ্টি করে ছবি আঁকিয়া বুঝাইয়া দাও। আয়নায় আলো পড়িলে চক্চকে দেখায় কিন্তু দেওয়ালে আলো পড়িলে চক্চকে দেখায় না কেন?

5. চিত্রসহ একটি সরল পেরিস্কোপের গঠন ও কার্য-প্রণালী ব্যাখ্যা কর।

6. অবতল ও উত্তল দর্পণ কাহাকে বলে? উহাদের (i) মধ্যবিন্দু, (ii) প্রধান অক্ষ, (iii) প্রধান ফোকাস ও (iv) ফোকাস-দূরত্ব কাহাকে বলে তাহা চিত্রের সাহায্যে বুঝাইয়া দাও।

7. নির্ভুল উক্তিগুলির পার্শ্বে '✓' চিহ্ন দাও :—

(i) আয়নার জন্য সমতল দর্পণের পরিবর্তে অবতল দর্পণও ব্যবহার করা যাইতে পারে।

(ii) অবতল দর্পণের অক্ষ ও বক্রতা-কেন্দ্রের উপর অবস্থিত লক্ষ্য-বস্তুর প্রতিবিম্ব অবশীর্ষ ও সং।

(iii) উত্তল দর্পণের সাহায্যে কখনও সংপ্রতিবিম্ব পাওয়া যায় না।

(iv) অবতল দর্পণের মেরু ও ফোকাসের মধ্যে লক্ষ্যবস্তু রাখিলে সং, অবশীর্ষ ও আকারে ছোট প্রতিবিম্ব পাওয়া যায়।

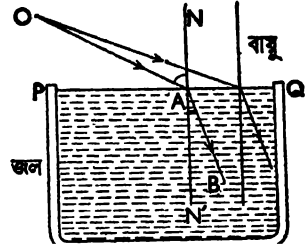
ষষ্ঠ অধ্যায়

সমতলে আলোকের প্রতিসরণ

(Refraction of light at a plane surface)

40. **আলোকের প্রতিসরণ (Refraction of light) :** সমসত্ত্ব মাধ্যমে আলোক-রশ্মি সরলরেখায় চলে। কিন্তু আলোক-রশ্মি যখন এক মাধ্যমের ভিতর দিয়া সরলপথে চলিতে চলিতে অন্য আর এক স্বচ্ছ মাধ্যমে প্রবেশ করে তখন উহার গতিপথ অভিমুখ পরিবর্তন করে। এই দুই মাধ্যমের বিভেদতলে আলোক-রশ্মির গতির অভিমুখের পরিবর্তনকে **আলোকের প্রতিসরণ** (Refraction of light)।

বলে। ধর, একটি আলোক-রশ্মি বায়ু-মাধ্যমে OA সরলরেখায় (চিত্র 45) আসিয়া একটি জলপূর্ণ কাচের পাত্রের উপর তির্যকভাবে আপতিত হইল। আলোক-রশ্মি এই বার জলের ভিতর প্রবেশ করিবে। জলের ভিতর আলোক-রশ্মি OA পথ হইতে বিভিন্ন পথে যাইবে—বায়ু ও জলের বিভেদতল PQ-এর A বিন্দুতে আলোকের প্রতিসরণ হইবে। OA রেখা A বিন্দুতে বাঁকিয়া গিয়া AB সরলরেখা ধরিয়া জলমাধ্যমে চলিতে থাকিবে। OA-কে আপতিত রশ্মি (incident ray), AB-কে প্রতিসৃত রশ্মি (refracted ray) এবং বিভেদতল PQ-এর উপর অবস্থিত A বিন্দুকে আপতন বিন্দু (point of incidence) বলে। A বিন্দুতে NAN' অভিলম্ব (normal)। আপতিত রশ্মি ও অভিলম্বের মধ্যস্থিত $\angle OAN$-কে আপতন কোণ (angle of incidence) এবং প্রতিসৃত রশ্মির সহিত অভিলম্বের কোণ $\angle BAN'$-কে প্রতিসরণ কোণ (angle of refraction) বলে।



চিত্র 45
আলোক প্রতিসরণ

41. প্রতিসরণের সূত্রাবলী (Laws of refraction) : এক মাধ্যম হইতে অন্য মাধ্যমে যাইবার সময়ে আলোক-রশ্মির যে প্রতিসরণ হয় তাহা নিম্নলিখিত নিয়মানুযায়ী হইয়া থাকে।

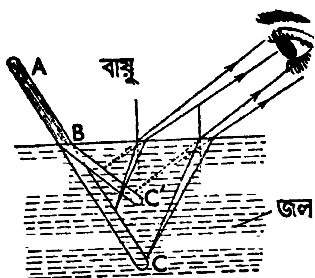
(1) আপতিত রশ্মি, আপতন বিন্দুতে বিভেদতলের উপর অঙ্কিত অভিলম্ব ও প্রতিসৃত রশ্মি সর্বদা এক সমতলে থাকে।

(2) আপতন কোণের সাইন (sine) ও প্রতিসৃত কোণের সাইনের অনুপাত সর্বদা ধ্রুবক হয়। ইহাকে **স্নেলের সূত্র** (Snell's law) বলে। এই ধ্রুবকের মান দুই মাধ্যমের প্রকৃতি ও আলোকের রং-এর উপর নির্ভর করে, আপতন কোণের মানের উপর নির্ভর করে না।

আপতন কোণ OAN-কে i, এবং প্রতিসরণ কোণ BAN'-কে r ধরিলে $\frac{\text{Sin } i}{\text{Sin } r}$ ধ্রুবক হয়। এই ধ্রুবককে μ (মিউ) দ্বারা সূচিত করা হয়। ইহাকে **প্রতিসরাঙ্ক** (Refractive Index) বলে।

42. প্রতিসরণের কয়েকটি সাধারণ দৃষ্টান্ত (Some Common examples of Refraction) :

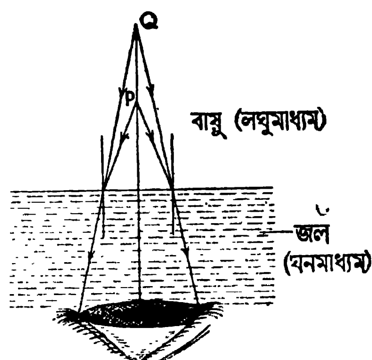
(i) একটি লাঠি তির্যক্ ভাবে খানিকটা জলে ডুবাইলে, উহা জলের মধ্যে হেলিয়া আছে মনে হইবে (চিত্র 46)। খাড়া ভাবে ডুবাইলে খাড়াই আছে দেখা যাইবে। *ABC* একটি সোজা লাঠি। উহার *BC* অংশ জলে ডুবানো আছে। লাঠিটিকে জলের উপর তির্যক্ ভাবে রাখিলে এবং জলের উপর হইতে দেখিলে ইহাকে বাঁকা বলিয়া বোধ হয়। ইহা *BC′* অবস্থায় আছে দেখাইবে। এখানে ঘন মাধ্যমে বস্তুটি আছে এবং লঘু মাধ্যম বায়ু হইতে দেখা হইতেছে



চিত্র 46
প্রতিসরণের উদাহরণ

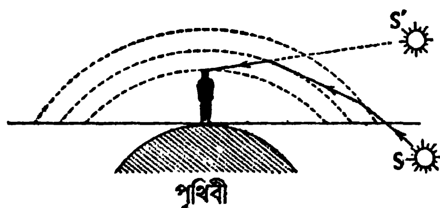
(ii) জলের মধ্য হইতে দেখিলে বায়ুতে স্থিত বস্তুকে দূরে বলিয়া মনে হয়

বায়ুতে অবস্থিত একটি বস্তু। জলের ভিতর চোখ রাখিয়া দেখিলে বস্তুটিকে দূরে *Q* স্থানে অবস্থিত বলিয়া মনে হইবে। *P* হইতে আলোকরশ্মি জলমাধ্যমে প্রবেশ করিয়া লম্ব অভিমুখে প্রতিসৃত হইবে (চিত্র 47)। ঐ আলোকরশ্মি চোখে আসিয়া পড়িবে এবং উহাদের বর্ধিত করিলে *Q* বিন্দুতে মিলিত হইবে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে লঘু মাধ্যমে (বায়ু) অবস্থিত বস্তুকে ঘন মাধ্যম (জল) হইতে দেখিলে বস্তু দূরে বলিয়া মনে হইবে। এই কারণে মাছ বা অন্যান্য জলজ প্রাণীরা পরিষ্কার জলের ভিতর হইতে কোন নিকটের বস্তু দূরে দেখিয়া থাকে।



চিত্র 47
প্রতিসরণের উদাহরণ

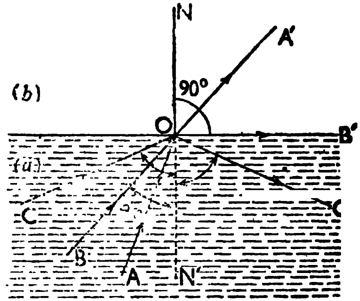
(iii) সূর্য দিগন্তরেখার নীচে চলিয়া যাইলেও পৃথিবী অবস্থিত বলিয়া মনে হইবে। বায়ুমণ্ডলের প্রতিসরণের জন্য সূর্যের এইরূপ আপাত উন্নতি ঘটিয়া থাকে (চিত্র 48)।



চিত্র 48
সূর্যের আপাত উন্নতি

43. আভ্যন্তরীণ পূর্ণ প্রতিফলন ও সঙ্কট কোণ (Total Internal Reflection and Critical angle) :

49 চিত্রে a ঘনতর ও b লঘুতর মাধ্যম। AO আলোকরশ্মি a মাধ্যম হইতে b মাধ্যমে যাইলে প্রতিসৃত হইয়া OA' পথে অভিলম্ব হইতে দূরে সরিয়া যাইবে। আপতন কোণ যত বাড়িবে, প্রতিসৃত কোণ তত বড় হইবে। বাড়িতে বাড়িতে এমন একটি আপতন কোণ আসিবে যখন প্রতিসৃত রশ্মি উভয় মাধ্যমের বিভেদতলের সমান্তরাল হইবে অর্থাৎ প্রতিসরণ কোণ 90° হইবে। এই অবস্থায় আপতন কোণকে সঙ্কট কোণ (Critical angle) বলে। সুতরাং আলোকরশ্মি যখন ঘনতর মাধ্যম হইতে লঘুতর মাধ্যমে এমনভাবে প্রবেশ করে যে প্রতিসৃত কোণ 90° হয় সেই সময় আপতিত রশ্মি যে আপতন কোণ সৃষ্টি করে, তাহাকে **সঙ্কট কোণ** বলে। ইহার পর আপতন কোণ যদি আরও বৃদ্ধি পায়, তাহা হইলে আলোকরশ্মি প্রতিসৃত না হইয়া প্রতিফলনের নিয়মানুযায়ী সম্পূর্ণ প্রতিফলিত হইবে। 49 চিত্রে $\angle BON' = \theta_c$ হইল সঙ্কট কোণ। $\angle CON'$ সঙ্কট কোণ BON' অপেক্ষা বড়। সেইজন্য আলোকরশ্মি OC' এমনভাবে প্রতিফলিত হইবে যে $\angle CON' = C'ON'$.

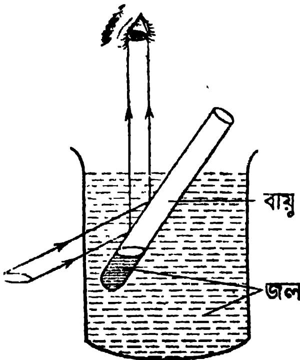


চিত্র 49
আভ্যন্তরীণ পূর্ণ প্রতিফলন ও সঙ্কট কোণ

ইহাকেই **আভ্যন্তরীণ পূর্ণ প্রতিফলন** (Total Internal Reflection) বলে।

44. পূর্ণ প্রতিফলনের দৃষ্টান্ত :

একটি কাচের পাত্র জলপূর্ণ করিয়া তাহাতে আংশিক জলপূর্ণ একটি পরখ নল (Test tube) কাত করিয়া বসাইয়া উপর হইতে দেখিলে নলের খালি অংশ খুব উজ্জ্বল দেখায়। আলোকরশ্মি জল হইতে গিয়া টিউবের



চিত্র 50

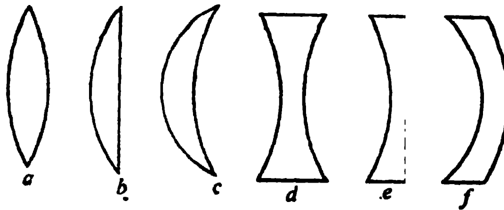
অভ্যন্তরস্থ বায়ুতে প্রবেশ করিতে চায় এবং আপতন কোণ সঙ্কট কোণের অধিক হইলেই পূর্ণ প্রতিফলিত হইয়া চোখে প্রবেশ করে বলিয়া টিউবের কিছু অংশ চক্‌চকে দেখায়। টিউব যদি জলপূর্ণ করা যায় তাহা হইলে পূর্ণ প্রতিফলন হইবে না এবং ফলে উহার উজ্জ্বলতা আর থাকিবে না। টেষ্ট টিউবটি কাত করিয়া রাখিতে হইবে।

লেন্স (Lens)

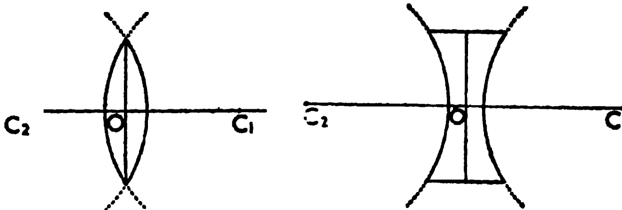
45. লেন্স (Lens) :

কোন স্বচ্ছ প্রতিসারক (Refracting) মাধ্যমকে যদি দুইটি বর্তুলাকার (Spherical) বা গোলাকার অথবা একটি গোলাকার ও একটি সমতল তল দ্বারা সীমাবদ্ধ করা যায়, তাহা হইলে সেই মাধ্যমকে **লেন্স** (Lens) বলে। সাধারণতঃ লেন্স কাচ, কোয়ার্টজ, প্লাষ্টিক ইত্যাদি দ্বারা তৈয়ারী হয়।

লেন্স প্রধানতঃ দুই প্রকার :—যথা উত্তল (Convex) বা অভিসারী (Converging) এবং অবতল (Concave) বা অপসারী (Diverging)। যে লেন্সের মধ্যভাগ মোটা এবং প্রান্তের দিকটা সরু তাহাকে **উত্তল লেন্স** বলে (চিত্র 51 *a, b, c*)। আর যে লেন্সের মধ্যভাগ অবনত বা সরু এবং প্রান্তের দিকটা মোটা তাহাকে **অবতল লেন্স** বলে (চিত্র 51 *d, e, f*)। চশমা এই সকল লেন্স দ্বারা তৈয়ারী করা হয়। যাহারা ক্ষীণ দৃষ্টি (Short-sighted) তাহারা অবতল লেন্স ব্যবহার করে। যাহারা দূরের জিনিস দেখিতে পায় কিন্তু নিকটের জিনিস দেখিতে পায় না (Long-sighted) তাহারা উত্তল লেন্স ব্যবহার করে। লেন্সের সাহায্যে আলোর প্রতিসরণ-ক্রিয়া হইয়া থাকে।



চিত্র 51
উত্তল ও অবতল লেন্স

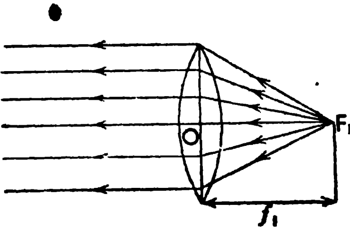


চিত্র 52

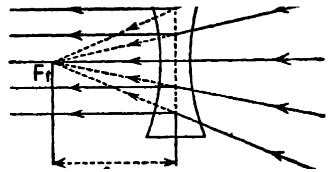
প্রধান অক্ষ—লেন্সের দুই বক্রতা-কেন্দ্র-বিন্দু সংযোগকারী সরলরেখাকে প্রধান অক্ষ বা অক্ষ বলে (Principal axis) বলে। 52 চিত্রে C_1C_2 হইল প্রধান অক্ষ।

আলোক-কেন্দ্র : লেন্সের প্রধান অক্ষের উপর অবস্থিত এমন একটি বিন্দু আছে যে, কোন রশ্মি ঐ বিন্দুর মধ্য দিয়া যাইলে প্রতিসরণের জন্য উহার দিক বিচ্যুতি হয় না, উহা অপরিবর্তিত পথে নির্গত হইয়া আসে। ঐ বিন্দুকে লেন্সের **আলোক-কেন্দ্র** (Optical Centre) বলে। 52 চিত্রে O আলোক-কেন্দ্র। অবশ্য স্বল্পবেধ লেন্স (Thin lens) এর ক্ষেত্রেই এই সংজ্ঞা প্রযোজ্য। কিন্তু সাধারণভাবে আলোক কেন্দ্রের সংজ্ঞা এইরূপ : লেন্সে প্রতিসৃত হইবার পর যে সকল প্রতিসৃত রশ্মি আপতিত রশ্মির সমান্তরাল হইয়া বাহির হইয়া আসে তাহা অবশ্যই প্রধান অক্ষের উপরে অবস্থিত একটি নির্দিষ্ট বিন্দুর মধ্য দিয়া যায়। এই নির্দিষ্ট বিন্দুটিকে লেন্সের **আলোক-কেন্দ্র** বলে।

ফোকাস ও ফোকাস দূরত্ব : উত্তল লেন্সের প্রধান অক্ষের উপর অবস্থিত একটি বিন্দু হইতে অপসৃত আলোক-রশ্মি লেন্সে প্রবেশ করিয়া প্রতিসরণের পর প্রধান অক্ষের সমান্তরাল হয় এবং অবতল লেন্সের প্রধান অক্ষের উপর অবস্থিত এই বিন্দুর অভিমুখে আগত রশ্মি প্রতিসরণের পর প্রধান অক্ষের সমান্তরাল হয়।



চিত্র 53a
উত্তল লেন্সের প্রধান প্রধান ফোকাস



চিত্র 53b
অবতল লেন্সের প্রথম প্রধান ফোকাস

এই বিন্দুটিকে লেন্সের **প্রথম প্রধান ফোকাস** (First Principal Focus) বলে। 53a চিত্রে F_1কে প্রথম প্রধান ফোকাস বলে। উত্তল লেন্সের সং ফোকাস (real focus), কিন্তু অবতল লেন্সের ফোকাস অসং (virtual)। ঐ বিন্দু হইতে লেন্সের আলোক-কেন্দ্রের দূরত্বকে **প্রথম ফোকাস দূরত্ব** (First focal length) বলে। f_1 প্রথম ফোকাস দূরত্ব।

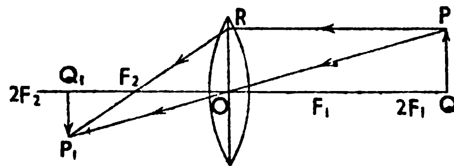
যখন উত্তল লেন্সের উপর আলোক-রশ্মি প্রধান অক্ষের সমান্তরাল হইয়া আপতিত

হয়, তখন উহারা লেন্স দ্বারা প্রতিসৃত হইয়া প্রধান অক্ষের উপর এক বিন্দুতে আসিয়া মিলিত হয়।

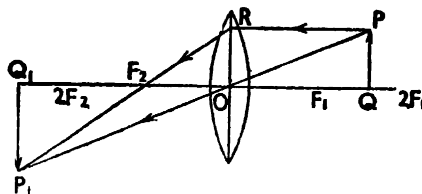
আবার, অবতল লেন্সে প্রধান অক্ষের সমান্তরাল সকল আলোকরশ্মি লেন্সে প্রতিসরণের পর একটি নির্দিষ্ট বিন্দু হইতে বাহির হইয়া আসিতেছে বলিয়া মনে হয়। উভয় ক্ষেত্রেই লেন্সের এই বিন্দুকে **দ্বিতীয় প্রধান ফোকাস** (Second Principal Focus) বলে। সুতরাং প্রত্যেক লেন্সের দুইদিকে দুইটি ফোকাস আছে।

46. **উত্তল লেন্সে প্রতিসরণ ও প্রতিবিম্ব গঠন (Refraction by Convex lens and formation of image) :**

(i) 54*a* চিত্রে *PQ* লক্ষ্য বস্তুটি ফোকাস দূরত্বের দ্বিগুণের অধিক দূরে লম্বভাবে অবস্থিত। F_1 ও F_2 যথাক্রমে প্রথম ও দ্বিতীয় প্রধান ফোকাস। বস্তুর *P* বিন্দু হইতে প্রধান অক্ষের সমান্তরাল রশ্মির (*PR*) প্রতিসরণের পর দ্বিতীয় প্রধান ফোকাসের মধ্য দিয়া চলিয়া যাইবে। আর একটি রশ্মি *PO* লেন্সের আলোক-কেন্দ্র *O* এর মধ্য দিয়া যাইয়া প্রতিসরণের পর সেইপথেই চলিতে থাকিবে। এই দুইটি প্রতিসৃত রশ্মি P_1 বিন্দুতে মিলিত হয়। অতএব এই P_1 বিন্দু *P* বিন্দুর প্রকৃত প্রতিবিম্ব। P_1 হইতে প্রধান অক্ষের উপর P_1Q_1 লম্ব টানিলে P_1Q_1 হইবে *PQ* এর প্রতিবিম্ব। এই প্রতিবিম্ব সং, উল্টা ও ক্ষুদ্রতর হয়।

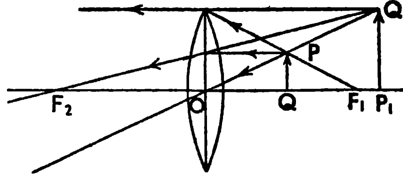


(ii) আবার *54 b* চিত্রে লক্ষ্য বস্তুটির অবস্থিতি ফোকাস দূরত্ব অপেক্ষা বেশী কিন্তু তাহার দ্বিগুণ অপেক্ষা কম। এরূপ স্থলে P_1Q_1 প্রতিবিম্বটি সং, উল্টা বা অবশীর্ষ ও বড় হয়।



চিত্র 54b

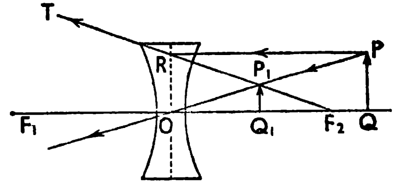
(iii) লক্ষ্য বস্তুর দূরত্ব ফোকাস দূরত্ব অপেক্ষা কম হইলে, প্রতিবিম্বটি অসং, খাড়া বা সমশীর্ষ এবং বড় হইবে (চিত্র 54c)। সং বিম্ব চোখে দেখা যায়, পর্দায়



চিত্র 54c

ধরা যায়। অসং বিম্ব চোখে দেখা যায় বটে কিন্তু পর্দায় ধরা যায় না।

47. অবতল লেন্সে প্রতিসরণ ও প্রতিবিম্ব গঠন (Refraction by a concave lens and formation of images) : 55 চিত্রে লক্ষ্যবস্তু *PQ* প্রধান অক্ষের উপর লম্বভাবে অবস্থিত। বস্তুর *P* বিন্দু হইতে প্রধান অক্ষের সহিত সমান্তরাল রশ্মিটি লেন্সে প্রতিসরণের পরে এইভাবে বাঁকিয়া যাইবে যে তাহা দ্বিতীয় প্রধান ফোকাস F_2 বিন্দু হইতে আসিতেছে বলিয়া মনে হয়।



চিত্র 55
অবতল লেন্সে প্রতিবিম্ব

আর এক রশ্মি *PO* আলোক-কেন্দ্র *O*-এর মধ্য দিয়া যাইয়া লেন্সে প্রতিসরণের পর দিক পরিবর্তন না করিয়া একই রেখায় চলিতে থাকিবে। প্রতিসৃত এই দুইটি রশ্মি পরস্পরের সহিত মিলিত হয় না। সুতরাং এক্ষেত্রে প্রকৃত বিম্ব গঠিত হয় না। *RT* রশ্মিকে পশ্চাৎ দিকে বর্ধিত করিলে *PO* রেখার সহিত P_1 বিন্দুতে মিলিত হয়। P_1 বিন্দু হইতে অক্ষের উপর P_1Q_1 লম্ব টানিলে উহাই *PQ* লক্ষ্যবস্তুর প্রতিবিম্ব হইবে। এই প্রতিবিম্ব অসং, সোজা ও ক্ষুদ্রতর এবং ইহা বস্তুর সহিত লেন্সের একই দিকে অবস্থিত।

প্রশ্নাবলী

1. আলোকের প্রতিসরণ কাহাকে বলে ? আলোকের প্রতিসরণের নিয়মগুলি বিবৃত কর এবং ছবি আঁকিয়া বুঝাইয়া দাও।

2. নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর দাও :—

(*i*) একটি জলপূর্ণ পাত্রে একটি আঙুল আংশিকভাবে ডুবাইলে বাঁকা দেখায় কেন ?

(*ii*) একটি জলপূর্ণ পাত্র একটু অগভীর মনে হয় কেন ?

(*iii*) অস্ত যাইবার পরও সূর্যকে কিছুক্ষণ দেখা যায় কেন ?

3. প্রতিসরণের সংজ্ঞা লিখ। আভ্যন্তরীণ পূর্ণ প্রতিফলন ও সংকট কোণ কাহাকে বলে ছবি আঁকিয়া পরিষ্কারভাবে বুঝাইয়া দাও। নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে সংকট কোণ পাওয়া যাইবে কিনা বল :—

(*i*) আলোকরশ্মি বায়ু হইতে কাঁচে যাইতেছে।

(*ii*) আলোকরশ্মি কাঁচ হইতে বায়ুতে যাইতেছে।

পূর্ণ প্রতিফলন জনিত কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ কর এবং একটির ব্যাখ্যা কর।

4. লেন্স কাহাকে বলে ? লেন্স কয় প্রকার ও কি কি ? প্রত্যেক প্রকারের ছবি আঁক। একটি লেন্সের (*i*) প্রধান অক্ষ, (*ii*) প্রধান ফোকাস, (*iii*) বক্রতা-কেন্দ্র এবং (*iv*) ফোকাস দূরত্ব উপযুক্ত চিত্রের সাহায্যে ব্যাখ্যা কর।

5. নিম্নলিখিত প্রতিবিম্বগুলি পাইতে হইলে কোন্ ধরনের লেন্স ব্যবহার করিবে এবং বস্তু কোথায় রাখিবে, নির্দেশ কর :—(*i*) বিবর্ধিত সং প্রতিবিম্ব, (*ii*) বিবর্ধিত অসং প্রতিবিম্ব, (*iii*) ক্ষুদ্রতর সং প্রতিবিম্ব, (*iv*) ক্ষুদ্রতর অসং প্রতিবিম্ব এবং (*v*) সমান আকারের সং প্রতিবিম্ব। প্রত্যেক ক্ষেত্রে পরিষ্কার ছবি আঁক।

Objective type questions :—

6. শূন্যস্থান পূর্ণ কর : (i) উত্তল লেন্সকে — লেন্স বলা হয়।

(*ii*) জলে নিমজ্জিত মুদ্রাকে — জল উপরে দেখা যায়।

(*iii*) আপতন কোণের সাইন ও প্রতিসৃত কোণের সাইনের অনুপাত সর্বদা — হয়।

(*iv*) অবতল লেন্স সর্বদা —প্রতিবিম্ব গঠন করে।

(v) হাল্কা মাধ্যম হইতে ঘন মাধ্যমে আলোকরশ্মি প্রতিসৃত হইলে উহা অভিলম্বের দিকে — যায়।

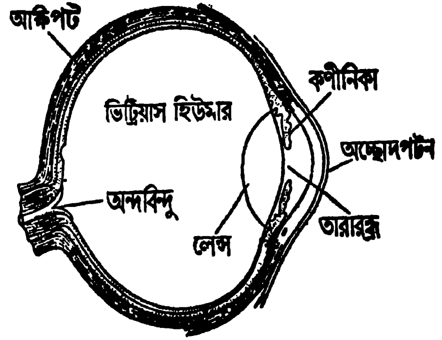
(*vi*) কোন মাধ্যমের প্রতিসরাঙ্ক আলোকের — উপর নির্ভর করে।

7. যখন কোন কিছু—(*a*) হইতে আগত রশ্মিগুচ্ছ—(*b*) বা প্রতিসৃত হইয়া অন্য কোন কিছুতে—(c) হয় বা অন্য কোন কিছু হইতে—(*d*) হইতেছে বলিয়া মনে হয়, তখন ঐ দ্বিতীয় বিন্দুকে প্রথম বিন্দু প্রভবের—(*e*) বলা হয়।

সপ্তম অধ্যায়

চক্ষু একটি লেন্স (The eye as lens)

48. চক্ষু (Eye) :—মানুষের চক্ষু প্রকৃতিদত্ত একটি অলোকীয় যন্ত্র বলা যাইতে পারে। চক্ষু একটি উত্তল লেন্স বিশেষ। ইহা বিভিন্ন প্রকার দূরে অবস্থিত লক্ষ্যবস্তুর সৎ ও উল্টা প্রতিবিম্ব অক্ষিপট (Retina) নামক আলোক-সুগ্রাহী পর্দার উপর গঠিত করে। উহার অনুভূতি মস্তকে পৌঁছাইলেই আমরা দেখিতে পাই। চক্ষু-গোলক (Eye ball) প্রায় গোলাকার। ইহা একটি কোটরে (socket) মধ্যে অবস্থিত এবং চারি পাশের পেশীর সাহায্যে এদিক ওদিক ঘুরিতে পারে। চক্ষুগোলকে সম্মুখে সাদা শক্ত তন্তুর যে আবরণটি থাকে তাহার স্বচ্ছ অংশের নাম **অচ্ছোদ-পটন** (cornea)। ইহার মধ্য দিয়া আলোকরশ্মি চক্ষুর ভিতরে প্রবেশ করে। অচ্ছোদপটনের আবরণের পশ্চাতে যে কালো পেশীনির্মিত অস্বচ্ছ গোলাকার পর্দা আছে তাহাকে **কণীনিকা** (Iris) বলে। কণীনিকার মাঝের ছিদ্রকে **তারারন্ধ্র** (Pupil) বলে। ইহার পিছনে আছে একটি স্বচ্ছ উভোত্তল (Double convex) লেন্স বা অক্ষিমুকুর। লেন্সটি পেশী ও লম্বমান তন্তু দ্বারা ভিতরের তন্তুর আবরণের সহিত যুক্ত থাকে। লেন্সের সম্মুখে জলের ন্যায় একপ্রকার তরল পদার্থ আছে, তাহাকে Aqueous humour বলে। এবং পশ্চাদ্‌ভাগে জেলির মত তরল ও স্বচ্ছ পদার্থ আছে, তাহাকে vitreous humour বলে। অচ্ছোদপটন, aqueous humour এবং vitreous humour এই কয়টি মিলিয়া একটি অভিসারী সমবায় গঠন করে। ইহার পর আছে অক্ষিপট (Retina)। চক্ষুর এই অংশটি আলোক-সুগ্রাহী চক্ষুস্নায়ু (optic nerve) দ্বারা অক্ষিপটের সহিত সংযুক্ত। চক্ষুস্নায়ু যেখানে চক্ষুর ভিতর প্রবেশ করিয়াছে সেখানে আলো পড়িলে সাড়া পাওয়া যায় না। এই অংশকে **অন্ধবিন্দু** (Blind spot) বলে।

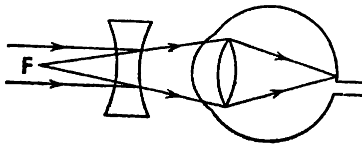


চিত্র 56
চক্ষু

চক্ষুর ক্রিয়া (Action of the eye) :—লক্ষ্যবস্তু খুব কাছে থাকিলে উহা হইতে আগত আলোক-রশ্মি তারারন্ধ্রের ভিতর দিয়া লেন্সে প্রবেশ করে ও অক্ষিপটের পশ্চাতে বস্তুর প্রতিবিম্ব গঠিত হয়। এই প্রতিবিম্ব সং, উল্টা ও ক্ষুদ্রতর হয়। প্রতিবিম্ব গঠন হইলে স্নায়ু এই অনুভূতি মস্তকে পৌঁছাইয়া দেয় ও আমাদের দর্শনের অনুভূতি জাগায়। কিন্তু বস্তু দেখিতে হইলে অক্ষিপটের উপর প্রতিবিম্ব পড়া চাই। তাই চোখের লেন্সের সহিত সংযুক্ত সক্রিয় পেশীগুলির সাহায্যে লেন্সের পৃষ্ঠের বক্রতা বাড়াইয়া লেন্সের ফোকাস-দূরত্ব কমাইয়া দেয় এবং ইহারই ফলে অক্ষিপটের পশ্চাতের উল্টা প্রতিবিম্বটি অক্ষিপটের উপর আসিয়া পড়ে ও বিশেষ মানসিক অবস্থার জন্য (mental interpretation) উহাকে আমরা সোজা দেখি। চক্ষুর এই যে বিশেষ ক্ষমতা তাহাকে চক্ষুর **উপযোজন ক্ষমতা** (Accomodation) বলে। উপযোজন ক্ষমতা সম্পূর্ণ প্রয়োগ করিয়া যে নিকটতম বিন্দুতে লক্ষ্যবস্তুকে স্পষ্টভাবে দেখা যায় তাহাকে **নিকট বিন্দু** (Near point) বলে। এই নিকটবিন্দু অপেক্ষা নিকটবর্তী কোন কিছু হইতে লক্ষ্যবস্তুকে স্পষ্ট দেখা যায় না। চক্ষু হইতে নিকট কিছুর দূরত্বকে সুস্পষ্ট দৃষ্টির **ন্যূনতম দূরত্ব** (Least distance of distinct vision) বলে। সুস্থ স্বাভাবিক চক্ষুর পক্ষে এই দূরত্ব প্রায় 25 সে. মি.। উপযোজন ক্ষমতা প্রয়োগ না করিয়া যে দূরতম বিন্দুতে কোন ক্ষুদ্র লক্ষ্যবস্তু থাকিলে চক্ষু বস্তুকে স্পষ্টভাবে দেখিতে পায় তাহাকে **দূরবিন্দু** (Far point) বলে।

49. চক্ষুর ত্রুটি ও তাহার প্রতিকার (Defects of the eye and their remedy) : আমাদের চক্ষুতে মোট চারি প্রকারের দোষ দেখা দিতে পারে, যথা—(*i*) স্বল্প দৃষ্টি (Short sight বা Myopia), (*ii*) দীর্ঘ দৃষ্টি (Long sight বা Hypermetropia), (*iii*) ক্ষীণ দৃষ্টি বা চাল্‌সে (Presbyopia), (*iv*) বিষমদৃষ্টি (Astigmatism)।

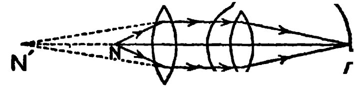
(*i*) **স্বল্প দৃষ্টি ও তাহার দোষ সংশোধন** :—দূরবর্তী লক্ষ্যবস্তু হইতে আগত সমান্তরাল আলোকরশ্মি লেন্সের উপর আপতিত হইয়া প্রতিসরণের পর অক্ষিপটের উপর প্রতিবিম্ব গঠন না করিয়া তাহার সম্মুখে থাকে। এজন্য বস্তুটিকে স্পষ্ট দেখা যায় না। চোখের এই ত্রুটিকে **স্বল্পদৃষ্টি** বলে। স্বল্পদৃষ্টি চক্ষুলেন্সের ফোকাস-দূরত্ব কম বা অক্ষিগোলকের দৈর্ঘ্য বেশী হইলে চক্ষুর এই ত্রুটি হয়। এই ত্রুটি সংশোধন করিতে হইলে



চিত্র 57a

অবতল লেন্সের চশমা ব্যবহার করিতে হইবে (চিত্র 57a)। এই ত্রুটি থাকিলে দূরের বস্তু স্পষ্ট দেখা যায় না।

(*ii*) **দীর্ঘ দৃষ্টি ও তাহার দোষ সংশোধন :**—চক্ষুর এই ত্রুটি থাকিলে কাছের বস্তু স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায় না কিন্তু দূরের বস্তু স্পষ্ট দেখা যায়। এইরূপ একটি দুষ্ট চক্ষুর অক্ষিগোলক খুব ছোট, ফোকাস-দূরত্ব বেশী। ইহাতে চক্ষুর লেন্সের প্রধান ফোকাস-বিন্দু চক্ষুর অক্ষিপটের উপর না পড়িয়া তাহার পশ্চাতে পড়িয়া থাকে। নিকটবর্তী লক্ষ্যবস্তুর ক্ষেত্রে উপযোজন ক্ষমতা সর্বোচ্চ সীমায় প্রয়োগ করিয়াও অক্ষিপটের উপর প্রতিবিম্ব গঠন করা যায় না। এই দোষযুক্ত চক্ষুর নিকট-বিন্দু N' স্বাভাবিক চক্ষুর নিকট-বিন্দু N অপেক্ষা দূরবর্তী অর্থাৎ ইহার নিকটবিন্দু 25 সে. মি. অপেক্ষা বেশী হয়। সুতরাং এইরূপ একটি দুষ্ট চক্ষুর সম্মুখে উপযুক্ত ফোকাস-দূরত্ব-বিশিষ্ট **উত্তল লেন্সের** চশমা ব্যবহার করিয়া এই ত্রুটি সংশোধন করা যায় (চিত্র 57b)।



চিত্র 57b

(*iii*) **ক্ষীণদৃষ্টি :** বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সাধারণতঃ চোখের সংলগ্ন পেশীগুলির স্থিতিস্থাপকতা শক্তি খানিকটা কমিয়া যায় এবং তাহার জন্য উপযোজন ক্ষমতাও কমিয়া যায় এবং নিকটের লক্ষ্যবস্তুর প্রতিবিম্ব অক্ষিপটের পশ্চাতে পড়ে। সেইজন্য বৃদ্ধ বয়সে লোকে বই, খবরের কাগজ দূরে সরাইয়া লইয়া পড়েন। উত্তল লেন্সযুক্ত চশমা ব্যবহার করিলে ক্ষীণদৃষ্টি বা চাল্‌সেজনিত অসুবিধা দূর হয়।

(*iv*) **বিষমদৃষ্টি :**—এই ত্রুটি থাকিলে একই দূরত্বে অবস্থিত অনুভূমিক ও উল্লম্ব রেখাকে চক্ষু সমান স্পষ্টতার সহিত দেখিতে পায় না। অচ্ছোদপটনের ও লেন্সতলের বক্রতার অসমতার জন্যই চক্ষুর এই ত্রুটি দেখা যায়। এই ত্রুটি প্রতিকারের জন্য **বেলনাকৃতি** (cylindrical) **লেন্সের** চশমা ব্যবহৃত হয়।

প্রশ্নাবলী

1. চক্ষুর বিভিন্ন অংশ ছবি আঁকিয়া বর্ণনা কর।

2. চক্ষুর ত্রুটি কয় প্রকার এবং কেমন করিয়া ঐ ত্রুটিসকল সংশোধন করা যায় চিত্রের সাহায্যে ব্যাখ্যা কর।

3. ঠিক উত্তরগুলির পার্শ্বে '√' চিহ্ন দাও :—

(*i*) স্বল্পদৃষ্টি লোক দূরের বস্তু স্পষ্ট দেখিতে পায়।

(*ii*) দীর্ঘদৃষ্টি লোক কাছের বস্তু স্পষ্ট দেখিতে পায়।

(*iii*) ক্ষীণদৃষ্টি লোক উত্তল লেন্সযুক্ত চশমা ব্যবহার করিয়া চক্ষুর অসুবিধা দূর করে।

(*iv*) দীর্ঘদৃষ্টি লোকের চক্ষুর অক্ষিপটের পশ্চাতে লক্ষ্যবস্তুর প্রতিবিম্ব গঠিত হয়

অষ্টম অধ্যায়

প্রিজম ও আলোক বিচ্ছুরণ

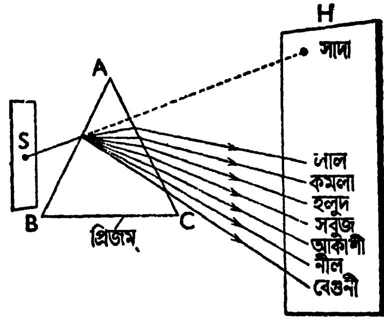
(Prism and dispersion of light)

50. **প্রিজম** (Prism) : দুইটি পরস্পর হেলানো সমতল পৃষ্ঠদ্বারা সীমাবদ্ধ কোন স্বচ্ছ মাধ্যমকে **প্রিজম** বলে। সমতল পৃষ্ঠ দুইটিকে প্রতিসরণ পৃষ্ঠ বলে। এই দুই প্রতিসরণ তলের (চিত্র 58) (*ABFE* এবং *ACDE*) মধ্যবর্তী কোণকে **প্রতিসরণ কোণ** (Refracting angle) বলে, যথা $\angle BAC$। পৃষ্ঠ দুইটি যে সরলরেখায় মিলিত হয় উহাকে **প্রিজমের প্রান্ত** (edge) বলে। প্রান্তরেখাগুলি পরস্পর সমান্তরাল। চিত্রে *AE* হইতেছে প্রান্ত। প্রান্তের বিপরীত দিকে প্রিজমের যে পৃষ্ঠ থাকে উহাকে **প্রিজমের ভূমি** (base) বলে।

চিত্র 58
প্রিজম

51. **আলোকের বিচ্ছুরণ** (Dispersion of light) : 1666 খ্রীষ্টাব্দে বিখ্যাত বিজ্ঞানী স্যার আইজাক নিউটন আলোকের বিচ্ছুরণ অবিষ্কার করেন। তিনি দেখান যে সূর্যরশ্মি (সাদা আলো) কাচের প্রিজমের ভিতর দিয়া যাইলে সাতটি বর্ণের রশ্মিতে বিভক্ত হইয়া পড়ে। আলোক-রশ্মি তরঙ্গ আকারে বিচ্ছুরিত হয়। এই তরঙ্গের দৈর্ঘ্য (wave length) বড়, ছোট দুইই হইতে পারে।

এই দৈর্ঘ্য বড় হইলে আলো লাল প্রতীয়মান হইবে। আবার উহা খুব ছোট হইলে বেগুনী রঙের মনে হইবে। এই লাল ও বেগুনী তরঙ্গের মধ্যে তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের ক্রমানুসারে আলো যথাক্রমে কমলা, হলুদ, সবুজ আকাশী, নীল রঙের মনে হইবে।



চিত্র 59
আলোর বিচ্ছুরণ

পরীক্ষা : একটি অস্বচ্ছ পর্দার *S* একটি অতি সূক্ষ্ম ছিদ্র (চিত্র 59) দিয়া সূর্যরশ্মি (সাদা আলো রশ্মি) প্রবেশ করিয়া প্রিজম *ABC*-এর প্রতিসারক তল *AB*-এর উপর আপতিত হইল। প্রতিসরণের পর নির্গত আলোক-রশ্মি যখন পর্দা *H*-এর উপর পড়িবে তখন পর্দায় একটি বিভিন্ন বর্ণবিশিষ্ট পাটি (Band) দেখিতে পাওয়া যাইবে। এখানে আলোক-রশ্মি প্রথমে বায়ু হইতে কাচে ও কাচ হইতে বায়ুতে দুইবার প্রতিসৃত হয়। প্রতিসরণের সময় ভিন্ন ভিন্ন তরঙ্গ তাহাদের দৈর্ঘ্য অনুসারে বিভিন্ন অনুপাতে বাঁকিয়া যায়। পাটির নিম্নপ্রান্ত হইতে উপর পর্যন্ত যে সাতটি বর্ণ হয় তাহারা যথাক্রমে বেগুনী (Violet), নীল (Indigo), আকাশী (Blue), সবুজ (Green), হলুদ, (Yellow), কমলা (Orange) এবং লাল (Red)। 'VIBGYOR' বা 'বেনীআসহকলার' কথাটি মনে রাখিলে বিশ্লিষ্ট রঙের পর পর নামও মনে থাকিবে। সাদা আলোকের এইরূপ বিভিন্ন বর্ণের আলোকে বিশ্লেষণকে **বিচ্ছুরণ** (dispersion) বলে। আর ঐ রঙিন পাটিকে **বর্ণালী** (spectrum) বলে। ইহার দ্বারা নিউটন প্রমাণ করিলেন যে সাদা আলোর প্রকৃতি (composition) যৌগিক—ইহা সাতটি বিভিন্ন মূল বর্ণের আলোকের (monochromatic light) সমষ্টি। সুতরাং যৌগিক আলোর বিচ্ছুরণ সম্ভব, একবর্ণের আলোকের বিচ্ছুরণ সম্ভব নহে। মনে রাখিতে হইবে প্রিজম নিজে বর্ণালীর বিভিন্ন বর্ণ সৃষ্টি করে না। ইহা শুধু সাদা আলোক রশ্মির মধ্যে অবস্থিত সাতটি বর্ণকে পৃথক করিয়া দেয়।

52. রামধনু (Rainbow) **:** মেঘস্থিত জলকণাগুলি ছোট ছোট প্রিজমের কাজ করে। সূর্যকিরণ ঐ সকল জলকণার উপর আপতিত হইয়া প্রতিসৃত হয়। ফলে আলোকের বিচ্ছুরণ হয় ও বর্ণালী সৃষ্টি হয়। ইহাই **রামধনু**।

53. বর্ণ (Colour) **:** সাদা আলোর বিশ্লেষণ হইতেই পদার্থের বর্ণ সৃষ্টি

হয়। যে বস্তুর যে বর্ণ সেই বস্তু সেই রঙ ছাড়া বাকি ছয়টি রঙই শোষণ করিয়া লয়। ফলে ঐ অবশিষ্ট আলোকটি আমাদের চক্ষে আসিয়া পড়ে। কালো বস্তু সকল আলোক শোষণ করিয়া লয়, ফলে কোন রঙই আমাদের চক্ষে আসিয়া পড়ে না। সবুজ পাতা সাদা আলোর সবুজটি ব্যতীত সব রঙই শোষণ করিয়া লয়। সবুজ রঙটি আমাদের চক্ষুকে আঘাত করে বলিয়া সবুজ পাতা সবুজ দেখায়। একটি লাল জবাফুলকে সবুজ আলোতে রাখিলে ফুলটি সবুজ রঙটিকে শোষণ করিয়া লইবে। সেইজন্য কোন আলোর অভাবে লাল ফুলটিকে কালো দেখাইবে।

প্রশ্নাবলী

1. আলোকের বিচ্ছুরণ বলিতে কি বোঝ ব্যাখ্যা কর। বর্ণালী কাহাকে বলে? আলো বিচ্ছুরিত হয় কেন?

2. শূন্যস্থান পূরণ কর :—

(*i*) সাদা আলো প্রিজমের ভিতর দিয়া গেলে — রঙে বিভক্ত হয়।

(*ii*) প্রিজমের সাহায্যে সাদা আলোকের বিভিন্ন বর্ণের আলোকে বিশ্লেষণকে — বলে।

(*iii*) প্রিজম কর্তৃক সাদা আলোকের বিশ্লেষণের কারণ সাদা আলোর মধ্যে যে সাতটি মূল বর্ণের আলো আছে তাহাদের — বিভিন্নতা।

(*iv*) সবুজ পাতা লাল আলোর মধ্যে ধরিলে — মনে হইবে কারণ পাতা— আলোক শুষিয়া লইবে।

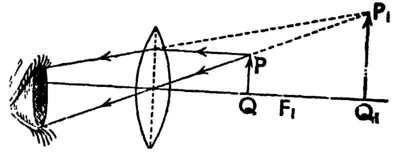
(*v*) এক বর্ণের আলোকের — সম্ভব নহে।

3. রঙিন পদার্থের বর্ণ সম্বন্ধে কি জান বল।

নবম অধ্যায়

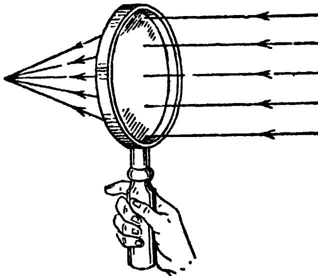
আলোক যন্ত্র (Optical Instrument)

54. বিবর্ধক বা বীক্ষণ কাঁচ (Magnifying glass) বা **সরল অনুবীক্ষণ** (Simple Microscope) :—এই বীক্ষণ কাঁচ উত্তল লেন্স ছাড়া কিছুই নহে। এই লেন্সের ফোকাস দূরত্বের মধ্যে কোন লক্ষ্য বস্তু রাখিলে লেন্সের পশ্চাতে ঐ বস্তুর একটি সোজা, অসং বৃহত্তর প্রতিবিম্ব দেখা যায় (চিত্র 60)। *PQ* লক্ষ্যবস্তুর অসং প্রতিবিম্ব P_1Q_1। সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম রেখা বা ছোট ছোট লেখা খালি চোখে দেখা যায় না। পড়িবার জন্য এই লেন্স ব্যবহার করা হয়। সেইজন্য এই লেন্সকে **বিবর্ধক কাঁচ** বা **সরল অনুবীক্ষণ** (Simple Microscope) বলে।



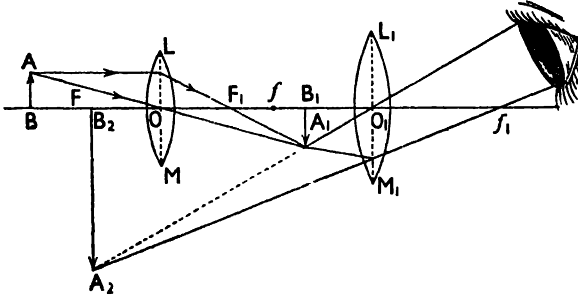
চিত্র 60
বিবর্ধক কাচ

55. আতসী কাঁচ (Burning glass) : ইহাও একটি উত্তল লেন্স। এই লেন্সকে লইয়া সূর্যরশ্মির সম্মুখে ধরিলে রশ্মিগুলি প্রতিসরণের পর লেন্সের দ্বিতীয় প্রধান ফোকাসে কেন্দ্রীভূত হইবে ও সেই স্থানে এতই প্রচুর তাপ উৎপন্ন হয় যে একখানা কাগজ রাখিলে কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই জ্বলিয়া উঠিবে (চিত্র 61)। বীক্ষণ কাঁচকে এইভাবে জ্বালানোর কার্যে ব্যবহার করিলে ইহাকে **আতসী কাঁচ** বলা হইয়া থাকে।


চিত্র 61
আতসী কাচ

56. অনুবীক্ষণ যন্ত্র (Compound microscope : অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বস্তুকে (যেমন জীবাণু, রক্তকণিকা প্রভৃতি) খালি চক্ষুতে দেখা যায় না। সেইগুলি দেখিতে হইলে অনুবীক্ষণ যন্ত্র (চিত্র 62) ব্যবহার করিতে হয়। *LM* ও L_1M_1 দুইটি উত্তল লেন্স। লক্ষ্য বস্তুটি (*AB*) অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র লেন্স *LM* এর

সম্মুখে রাখিতে হয়। *LM*কে objective বলে। ইহার ফোকাস দূরত্ব *OF*, OF_1। অপর লেন্সটিকে (L_1M_1) যাহা চক্ষুর সম্মুখে থাকে Eye-Piece বলে।

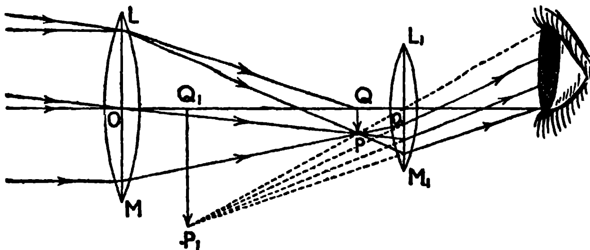


চিত্র 62

অনুবীক্ষণ যন্ত্র

O_1f, O_1f_1 ইহার ফোকাস দূরত্ব। *LM* এর ফোকাস দূরত্ব L_1M_1 এর ফোকাস দূরত্ব অপেক্ষা কম। বস্তুটি (*AB*) *LM* এর ফোকাসের বাহিরে থাকার জন্য A_1B_1 বিবর্ধিত সং অবশীর্ষ বিম্ব গঠিত হইয়াছে। কিন্তু এই সং বিম্বটি L_1M_1 লেন্সের ফোকাস *f*-এর মধ্যে গঠিত হওয়ায় ইহার বিবর্ধিত অসং বিম্ব A_2B_2 গঠিত হইয়াছে। এই বিবর্ধিত (A_2B_2) বিম্বটিই আমরা Eye-Piece দ্বারা দেখিতে পাই।

57. দূরবীক্ষণ যন্ত্র বা টেলিস্কোপ (Telescope): মাইক্রোস্কোপে যেমন নিকটের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বস্তুকে বড় দেখায়, টেলিস্কোপে তেমনি দূরের জিনিস



চিত্র 63

এ্যাস্ট্রোনমিক্যাল টেলিস্কোপ

বড় দেখায়। বহুদূরের বস্তুর যে প্রতিবিম্ব চক্ষুর অক্ষিপটে আসিয়া পৌঁছে তাহা এতই ক্ষুদ্র যে পরিষ্কারভাবে দেখা যায় না। সেইজন্য টেলিস্কোপের সাহায্যে দূরের বস্তুকে পরিষ্কারভাবে দেখা যায়, যেমন দূরের চন্দ্র, তারা ইত্যাদি পরিষ্কারভাবে

পর্যবেক্ষণ করা যায়। 63 চিত্রে LM টেলিস্কোপের অবজেকটিভ (Objective) লেন্স ও L_1M_1 আই-পিস (Eye-piece) লেন্স। দুইটিই উত্তল লেন্স। অবজেকটিভ লেন্সের ফোকাস দূরত্ব ও ব্যাস খুব বেশী এবং আই-পিস লেন্সের ফোকাস দূরত্ব খুব কম। অনন্ত দূরের লক্ষ্য বস্তুর সং বিম্ব আই-পিস লেন্সের ফোকাস দূরত্বের মধ্যে থাকে। সেইজন্য তাহার একটি বড় অসদ্‌বিম্ব (P_1Q_1) গঠিত হয়। ইহা লক্ষ্য-বস্তুর উল্টা এবং বড় প্রতিবিম্ব।

আলোক চিত্রগ্রাহী ক্যামেরা (Photographic Camera) ও ম্যাজিকলণ্ঠন (Magic lantern)এ উত্তল লেন্স ব্যবহৃত হয়।

58. ম্যাজিক লণ্ঠন (Magic lantern) : ম্যাজিক লণ্ঠনের উদ্দেশ্য : ইহার সাহায্যে কাঁচ বা প্লাসটিকের ফলকের (plate) উপর আঁকা ছবি বা নক্সা (slide) একটি পর্দার উপর বড় করিয়া দেখান হয়) 63(a) চিত্রে ম্যাজিক লণ্ঠনের সাহায্যে একটি ছবি কেমন করিয়া বড় হইয়া পর্দার উপর পড়ে তাহা দেখান হইয়াছে। এই যন্ত্রে নিম্নলিখিত অংশগুলি পর পর সাজান থাকে :—

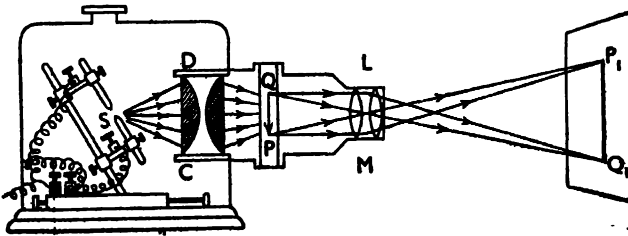
(1) অত্যুজ্জ্বল আলোকের উৎস S : সাধারণতঃ আর্ক দীপ (Arc lamps) ব্যবহার করা হয়।

(2) উত্তল কনডেনসার লেন্স CD (Condensing lens)।

(3) স্লাইড : ইহাতে সাধারণতঃ কাঁচের বা প্লাসটিকের ফলকের উপর ফটোগ্রাফ কিংবা কাঁচের উপর কোন চিত্র অঙ্কন করা থাকে। এই স্লাইডে অঙ্কিত চিত্র PQ বস্তুর কাজ করে। ইহাকে উল্টা করিয়া রাখা হয়।

(4) উত্তল অবজেকটিভ লেন্স LM বা focussing লেন্স : ইহা সাধারণতঃ দুইটি উত্তোত্তল লেন্সের সমবায়ে গঠিত হয়। ইহা একত্রে রশ্মিগুলিকে অভিসারী করে।

(5) ছবি প্রতিফলিত করিবার লম্বা সাদা কাপড়ের পর্দা P_1Q_1।



চিত্র 63(a)

ম্যাজিক লণ্ঠনে ছোট বস্তু পর্দার উপর বড় দেখাইতেছে।

ক্রিয়া : আলোর উৎস S হইতে আগত অপসারী আলোর রশ্মিগুচ্ছ প্রথমে কনডেনসার লেন্সের (CDএর) উপর পড়ে। উহা হইতে অপসৃত অভিসারী আলোক-রশ্মি দ্রব্য (slide) PQ-এর উপর পড়ে। ইহাতে দ্রব্যটিকে উজ্জ্বল করে। ইহার পর দ্রব্য হইতে আলোর রশ্মি অবজেকটিভ লেন্স LM-এর উপর পড়ে। এই অবজেকটিভ লেন্স হইতে অপসৃত আলোর রশ্মি স্লাইডের চিত্রকে P_1Q_1 পর্দার উপর বড় করিয়া প্রতিবিম্বিত করে। এই প্রতিবিম্ব সৎ (real), বিবর্ধিত (magnified) এবং উল্টা (inverted)।

প্রশ্নাবলী

1. নিম্নলিখিত আলোকীয় যন্ত্রগুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ ও কার্যপ্রণালী বর্ণনা কর :—
(i) বীক্ষণ কাঁচ, (ii) অনুবীক্ষণ যন্ত্র, (iii) টেলিস্কোপ।
2. অনুবীক্ষণ যন্ত্র ও টেলিস্কোপের ক্রিয়ার সাদৃশ্য দেখাও।
3. কি কি আলোক-যন্ত্রে উত্তল লেন্স ব্যবহার করা হয় ?
4. ম্যাজিক লণ্ঠনের উদ্দেশ্য কি ? চিত্রের সাহায্যে বিভিন্ন অংশগুলি দেখাইয়া উহার ক্রিয়া বর্ণনা কর।

দশম অধ্যায়

তাপ (Heat)

তাপের উৎস (Sources of Heat)

59. তাপের স্বরূপ কি ?

গরম জলে, সাধারণ কলের জলে, বরফে হাত দিলে আমাদের বিভিন্ন অনুভূতি হয়। বরফে হাত দিলে শীতল লাগে, আগুনে হাত দিলে গরম লাগে। আবার সাধারণ কলের জল অপেক্ষা বরফ অধিক শীতল বলিয়া মনে হয়। শীতল এবং গরম অনুভূতির বাহ্যিক কারণ হইল তাপ। ফুটন্ত জলে হাত দেওয়া যায় না, আবার ঐ জল খোলা জায়গায় রাখিয়া দিলে কিছুক্ষণ পরে উহা শীতল হইলে স্বাভাবিক ভাবেই হাত দিতে পারি। ঠাণ্ডা জল উনানে বসাইলে উহা গরম হইয়া উঠে। সুতরাং যে বাহ্যিক কারণ সমূহের জন্য প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোন ঠাণ্ডা বস্তু গরম হইয়া উঠে বা গরম বস্তু ঠাণ্ডা হইয়া যায়, তাহাকেই **তাপ** (Heat) বলা হয়। আলোকের মতন তাপও একপ্রকার **শক্তি**।

60. তাপের প্রধান প্রধান উৎস (Main sources of heat) :—
নিম্নলিখিত উৎস হইতে আমরা তাপ পাইয়া থাকি। যথা—

(i) প্রাকৃতিক উৎস—সূর্য (Sun),

(ii) যান্ত্রিক উৎস—ঘর্ষণ (Mechanical action),

(iii) রাসায়নিক ক্রিয়া—দহন (Chemical reaction),

(iv) বৈদ্যুতিক উৎস (Electricity)।

(i) **সূর্য** :—প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে আমরা যে তাপই পাই না কেন সকল প্রকারের তাপই মূলতঃ সূর্যের দান।

সূর্য হইতে যে প্রচণ্ড তাপ ও আলো বিকীর্ণ হয় তাহাতে পৃথিবী ও সৌর জগতের অন্যান্য গ্রহ ও উপগ্রহ তাপ ও আলো পাইয়া থাকে। খাদ্য, জ্বালানী, কঠিন, তরল, গ্যাসীয় বায়ু, জল ইত্যাদি হইতে যে তাপ পাই তাহাও প্রকৃতপক্ষে সূর্যেরই দান। সূর্যের কিরণ হইতে আমরা প্রত্যক্ষভাবে তাপ পাই।

(ii) **যান্ত্রিক উৎস** :—ঘর্ষণের ফলে তাপের সৃষ্টি হয়। শীতকালে আমরা হাতে হাত ঘষিয়া হাতগুলিকে গরম করি। শীতকালে অরণ্যে শুষ্ক ডালে ডালে ঘর্ষণ হইয়া দাবানলের সৃষ্টি হয়। যন্ত্রপাতি শান দিবার সময় যন্ত্র এত গরম হইয়া উঠে যে আগুনের ফুলকি বাহির হয়।

(iii) **রাসায়নিক উৎস** :—কোন পদার্থ অন্য পদার্থের সহিত রাসায়নিক ক্রিয়া করিলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাপের উদ্ভব হয়। চুনে জল দিলে পরস্পরের মধ্যে রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলে প্রচুর তাপ উৎপন্ন হয়।

(iv) **বৈদ্যুতিক উৎস** :—যে কোন ধাতুর তারের মধ্য দিয়া বিদ্যুৎ প্রবাহিত হইলে তাপের উদ্ভব হয়। বৈদ্যুতিক চুল্লী (Domestic electric heater) এইভাবে প্রচুর তাপ উৎপন্ন করে। ইহা ছাড়াও পদার্থের পরিবর্তনের জন্য খানিকটা তাপ বাহির হয়। পৃথিবীর গর্ভে প্রচুর তাপ সঞ্চিত আছে।

প্রশ্নাবলী

1. বস্তু যতই ঠাণ্ডা বা গরম হউক না কেন, উহার মধ্যে কিছু না কিছু তাপ থাকে—উদাহরণ দ্বারা এই উক্তির সত্যতা প্রমাণ কর।

2. সাধারণতঃ কি কি উপায়ে তাপ উৎপন্ন হয় ?

3. নির্ভুল উক্তির পার্শ্বে '✓' চিহ্ন দাও :—

(i) পাথরে পাথরে ঘষিলে তাপের সৃষ্টি হয়।

(ii) যন্ত্রপাতি শান দিবার সময় যে তাপের উদ্ভব হয় তাহা তড়িৎ শক্তির রূপান্তর।

(iii) কয়লা পুড়িলে যে তাপের উদ্ভব হয় তাহা রাসায়নিক শক্তির রূপান্তর।

(iv) পটকা ফাটিবার সময় তড়িৎ উৎপন্ন হয়।

(v) শীতোষ্ণতার বাহ্যিক কারণ তাপ।

(vi) ঠাণ্ডা বস্তুর মধ্যে কিছু তাপ থাকে না।

একাদশ অধ্যায়

তাপের ফল (Effects of Heat)

61. তাপের ফল : কোন বস্তুতে তাপ প্রয়োগ করিলে বা কোন্ বস্তু হইতে তাপ অপসারিত হইলে নিম্নলিখিত ফল দেখা যায় :—

(i) **উষ্ণতার পরিবর্তন :**—কোন বস্তুতে তাপ দিলে তাহার উষ্ণতা বৃদ্ধি পায় এবং ঐ বস্তু হইতে তাপ নিষ্ক্রান্ত হইলে উহার উষ্ণতা হ্রাস পায়।

(ii) তাপ প্রয়োগের ফলে অধিকাংশ পদার্থের আয়তন বৃদ্ধি পায় এবং তাপ অপসারণে বস্তুর আয়তন হ্রাস পায়।

(iii) তাপ প্রয়োগে কঠিন পদার্থকে তরল পদার্থে বা তরল পদার্থকে বাষ্পীয় পদার্থে পরিণত করা যায়। তাপ অপসারণ করিলে বাষ্পীয় পদার্থকে তরল পদার্থে বা তরল পদার্থকে কঠিন পদার্থে পরিণত করা যায়। অর্থাৎ তাপ প্রয়োগে বস্তুর অবস্থান্তর ঘটে।

উত্তাপ   উত্তাপ
বরফ ⟶ জল ⟶ জলীয় বাষ্প (ষ্টীম)
⟵   ⟵
শীতল   শীতল।

(iv) **ভৌত গুণাগুণের পরিবর্তন :**—তাপের আধিক্য ঘটিলে সকল পদার্থের ভৌত গুণাগুণের কিছু পরিবর্তন হয়। কঠিন পদার্থ উচ্চ উষ্ণতায় সাধারণতঃ অপেক্ষাকৃত কম স্থিতিস্থাপক (Elastic) বা অধিকতর নমনীয় (Plastic) হইয়া পড়ে। উষ্ণতা বৃদ্ধিতে তরল পদার্থের দ্রাবক শক্তি বৃদ্ধি পায়। উষ্ণতা বৃদ্ধিতে গ্যাসের চাপ বৃদ্ধি পায়।

(v) **রাসায়নিক পরিবর্তন** :—তাপ প্রয়োগে বহুক্ষেত্রে রাসায়নিক সংযোজন বা বিয়োজন ঘটে। যেমন, তাপে ক্যালসিয়াম কার্বনেট, চিনি প্রভৃতি যৌগিক পদার্থ বিশ্লিষ্ট হয়। কয়লাকে উত্তপ্ত করিলে কয়লার কার্বন বায়ুর অক্সিজেনের সহিত যুক্ত হইয়া কার্বন ডাইঅক্সাইড নামে যৌগিক পদার্থের সৃষ্টি হয়।

(vi) **তড়িতের উৎপত্তি** :—তাপ প্রয়োগে বৈদ্যুতিক শক্তির সৃষ্টি ও বৈদ্যুতিক গুণাগুণেরও পরিবর্তন হইয়া থাকে। দুইটি বিভিন্ন ধাতুর দুইটি তার যোগ করিয়া একটি জোড়া মুখে তাপ প্রয়োগ করিলে বর্তনীর তারে তড়িৎ প্রবাহিত হয়।

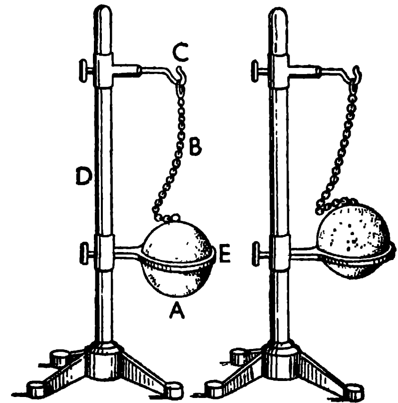
(vii) **আলোকের উৎপত্তি** : তাপ প্রয়োগে আলোক শক্তির বিকাশ সম্ভব হইয়া থাকে। অধিক তাপ প্রয়োগে বস্তু যখন শ্বেত-তপ্ত (white hot) হইয়া উঠে তখন ঐ বস্তু হইতে আলোক সৃষ্টি হয়। তাছাড়া দাহ্য পদার্থে তাপ প্রয়োগ করিলেও আলোক উৎপন্ন হয়।

(viii) **প্রাণনাশ** : তাপের আধিক্যে জীবনের বিনাশ হইয়া থাকে।

62. কঠিন পদার্থের প্রসারণ (Expansion of solids) :—

কয়েকটি ব্যতিক্রমের ক্ষেত্র বাদ দিলে কঠিন পদার্থ তাপে প্রসারিত হয়।

বল ও আংটা পরীক্ষা ((Ball and Ring Experiment) :—64 চিত্রে *A* একটি পিতলের গোলক, *B* শিকল, *C* হুক। গোলকটি শিকলে লাগাইয়া হুক হইতে ঝুলাইয়া দেওয়া হয়। স্ট্যাণ্ডের (*D*) নীচের অংশে *E* একটা আংটা। গোলকটির মাপ এরূপ হইবে যেন ঠাণ্ডা অবস্থায় উহা আংটার মধ্য দিয়া গলিয়া যায় (চিত্র 64 a)। বার্ণারের সাহায্যে গোলকটিকে একটু দূরে রাখিয়া যথেষ্ট উত্তপ্ত করা হইল। এখন দেখা যাইবে যে উহা আংটার মধ্য দিয়া গলিয়া যাইতেছে না (চিত্র 64 b)। কিন্তু বলটি ঠাণ্ডা হইলে সহজেই আংটার মধ্য দিয়া পুনরায় গলিয়া যাইতেছে। ইহা হইতে প্রমাণিত হয় যে তাপ প্রয়োগে কঠিন পদার্থের প্রসারণ ঘটে।

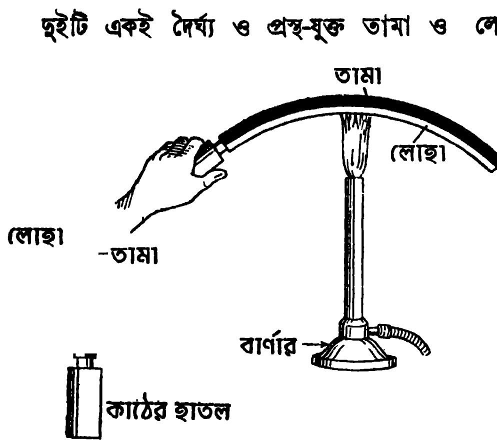


চিত্র 64 (a) চিত্র 64 (b)
বল ও আংটার পরীক্ষা

(a) বিভিন্ন কঠিন পদার্থের প্রসারণ বিভিন্ন :—

তাপে কঠিন পদার্থের প্রসারণ পদার্থের উপর নির্ভর করে। বিভিন্ন কঠিন পদার্থ যে বিভিন্ন পরিমাণে প্রসারিত হয় তাহা নিম্নলিখিত পরীক্ষার দ্বারা প্রমাণ করা যায়।

দুইটি একই দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ-যুক্ত তামা ও লোহার পাত একসঙ্গে রিভেট (rivet) করিয়া সংযুক্ত করা হইয়াছে। উহার একপ্রান্তে একটি কাঠের হাতল লাগানো থাকে ধরিবার সুবিধার জন্য। সাধারণ তাপমাত্রায় ইহা সরল অবস্থায় থাকে (চিত্র 65 a)। উহাকে বার্ণারের সাহায্যে সমান ভাবে গরম করিলে (চিত্র 65 b) দেখা যাইবে যে ধনুকের মত বাঁকিয়া গিয়াছে। লোহার পাতটি ভিতরের দিকে এবং তামার পাতটি বাইরের দিকে বাঁকিয়া গিয়াছে। ইহা হইতে প্রমাণিত হয় যে একই মাপের দুইটি বিভিন্ন ধাতুর প্রসারণ বিভিন্ন। এক্ষেত্রে, একই তাপমাত্রার বৃদ্ধির জন্য লোহার প্রসারণ অপেক্ষা তামার প্রসারণ অধিক। সুতরাং প্রসারণ পদার্থের প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল।



চিত্র 65 (a) চিত্র 65 (b)

তামা ও লোহার প্রসারণ পরীক্ষা

(b) কঠিন পদার্থের প্রসারণের কয়েকটি ব্যবহারিক প্রয়োগ :—

(i) রেল লাইনের রেলের মাঝে মাঝে অর্থাৎ জোড়ার মুখে একটু ফাঁক থাকে। সূর্যতাপে এবং রেলের চাকার ঘর্ষণজনিত তাপে লোহার রেল গরম হইয়া লম্বায় বাড়িয়া যায়। এই ফাঁকটুকু না থাকিলে রেল লাইন বাঁকিয়া যাইত এবং তাহার ফলে গাড়ি চলিতে পারিত না।

(ii) গরুর গাড়ীর চাকায় যে লোহার বেড় (Tyre) থাকে তাহার ব্যাস চাকার ব্যাস অপেক্ষা একটু ছোট রাখা হয়। বেড়টিকে সমভাবে উত্তপ্ত করিলে উহার প্রসারণ ঘটে। তখন উহাকে সহজেই কাঠের চাকার উপর বসান যায়।

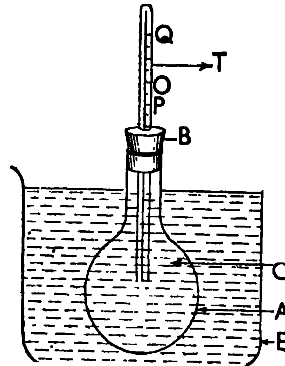
বসানোর সঙ্গে সঙ্গেই জল ঢালিয়া উহাকে শীতল করা হয়। তাপসংকোচনে সংকুচিত হইয়া চাকার উপর দৃঢ়ভাবে আটকাইয়া যায়।

(iii) কখনও কখনও কাঁচের ছিপি বোতলের মুখে আটকাইয়া যায়। এই অবস্থায় বোতলের মুখে সাবধানে তাপ দিলে বোতলের মুখ বড় হয় এবং ছিপিটি সহজেই খুলিয়া যায়।

63. তরল পদার্থের প্রসারণ (Expansion of liquids) :—

উত্তাপে কঠিন পদার্থের ন্যায় তরল পদার্থেরও প্রসারণ হয়। কিন্তু কঠিন পদার্থ অপেক্ষা তরল পদার্থ অনেক বেশী প্রসারিত হয়। তরল পদার্থের প্রসারণের পরীক্ষা দেওয়া হইল :—

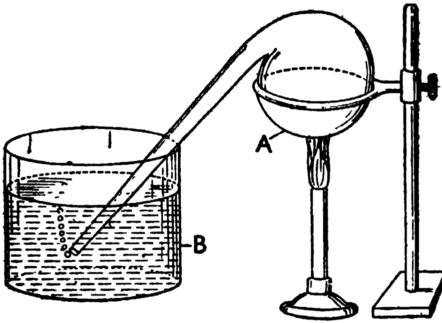
66 চিত্রে A একটি সরু গলাবিশিষ্ট কাচের ফ্লাস্ক, উহা রঙীন জলে পূর্ণ করা হয়। ফ্লাস্কের ছিপি (B) দিয়া আগাগোড়া সমান ছিদ্র ক্ষুদ্র একটি কাচের নল (T) লাগান হয়। ফ্লাস্কটিকে ছিপির দ্বারা ভালভাবে মুখ বন্ধ করিলে রঙীন জল ঐ নলের O বিন্দু পর্যন্ত পৌঁছায়। এইবার ফ্লাস্কটিকে হঠাৎ একটি গরম জল পূর্ণ পাত্রে (E) বসাইলে দেখা যাইবে যে নলের ভিতরে রঙীন জল প্রথমতঃ O অংশের নীচে P পর্যন্ত নামিয়া আসে। তারপর যতই উষ্ণতা বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে ততই নলের মধ্যে জলের লেভেল O বিন্দুকে ছাপাইয়া Q বিন্দুতে পৌঁছাইয়াছে। এইরূপ হইবার কারণ কি? গরম জলের সংস্পর্শে আসিয়া প্রথমে ফ্লাস্কটির আয়তন বৃদ্ধি পাইয়াছে। উহার ভিতর রঙীন জলের আয়তন বৃদ্ধি পায় নাই। তাপের প্রভাবে তরল পদার্থের প্রসারণ কঠিন পদার্থ অপেক্ষা বেশী। এইজন্য কাচের ভিতরের জল উত্তপ্ত হইলে উহার আয়তন বৃদ্ধি পাইয়া Q বিন্দুতে পৌঁছায়। সুতরাং উহাদের আয়তন প্রসারণ প্রকৃতপক্ষে P অংশ হইতে Q অংশ পর্যন্ত এবং কাচের আয়তন প্রসারণ O অংশ হইতে P অংশ পর্যন্ত। সুতরাং তরলের প্রকৃত প্রসারণ (PQ)=তরলের আপাতত প্রসারণ (OQ)+পাত্রের প্রসারণ (OP)। ফ্লাস্কে জল ছাড়া অন্য কোন তরল পদার্থ লইয়া পরীক্ষা করিলেও অনুরূপ ফল পাওয়া যায়।



চিত্র 66
তরল পদার্থের প্রসারণ পরীক্ষা

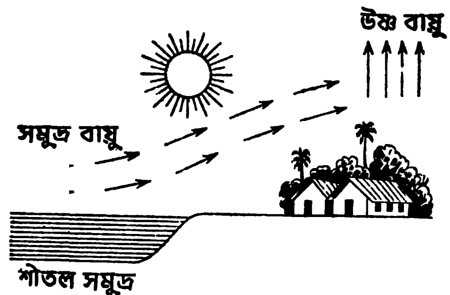
64. গ্যাসীয় বা বায়বীয় পদার্থের উপর তাপের ক্রিয়া (Effect of heat on gases) :—গ্যাসকে উত্তপ্ত করিলে কঠিন ও তরল পদার্থ অপেক্ষা অনেক বেশী প্রসারিত হয়। বাতাসে পরিপূর্ণ একটি কাচের গোলকের মুখ ছিপি দিয়া বন্ধ করিয়া উত্তপ্ত করিলে বাতাসের আয়তন এতই বৃদ্ধি পায় যে হয় পাত্রটি সশব্দে ফাটিয়া যাইতে পারে, আর তা না হইলে ছিপিটি বুলেটের মত ছিটকাইয়া বাহির হইয়া যায়।

পরীক্ষা : 67 চিত্রে *A* একটি বায়ুপূর্ণ বকযন্ত্র (Retort)। উহার মুখ জলপূর্ণ পাত্রের (*B*) জলের মধ্যে ডুবাইয়া যন্ত্রটির তলায় বার্ণার জ্বালাইয়া উত্তপ্ত করিলে দেখা যাইবে যে উহার ভিতর-কার বাতাস উত্তপ্ত ও প্রসারিত হইয়া বুদবুদের আকারে জল ভেদ করিয়া বাহির হইতেছে। এখন উহাকে ঠাণ্ডা করিলে বাতাস সঙ্কুচিত হয় এবং সেইজন্য বকযন্ত্রের ভিতরে জল প্রবেশ করিতে থাকে।



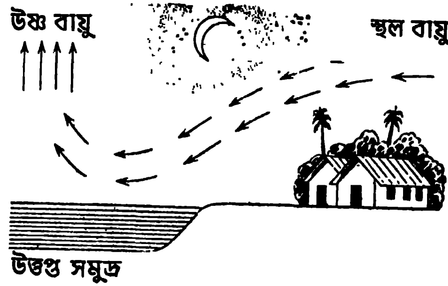
চিত্র 67
গ্যাসীয় পদার্থের প্রসারণ পরীক্ষা

65. স্থলবায়ু ও সমুদ্রবায়ু (Land and Sea Breezes) : নানা কারণে বায়ুমণ্ডলে তাপের ও বায়ু-চাপের তারতম্যের জন্য বায়ুপ্রবাহের সৃষ্টি হয়। বায়ু সর্বদাই উচ্চচাপযুক্ত স্থান হইতে নিম্নচাপযুক্ত স্থানের দিকে প্রবাহিত হয়। দিনের বেলায় রৌদ্রের তাপে জলভাগ অপেক্ষা স্থলভাগ অধিক উত্তপ্ত হয়। স্থলভাগ শীঘ্র উত্তপ্ত হইয়া উঠে এবং শীঘ্র শীতল হইয়া যায়। জলভাগ অপেক্ষাকৃত বিলম্বে উত্তপ্ত ও শীতল হয়। স্থলভাগের উপরিস্থিত উত্তপ্ত বায়ু হাল্‌কা



চিত্র 68a

হইয়া উপরে উঠিয়া যায়। তখন সমুদ্রের উপরিস্থিত শীতল ও ভারী বায়ু সেই স্থান পূর্ণ করিবার জন্য স্থলভাগের নিম্নচাপের অভিমুখে প্রসারিত হইতে থাকে। ইহাকেই **সমুদ্রবায়ু** (sea breeze) বলে (চিত্র 68a)। রাত্রিকালে মাটি (স্থলভাগ) যত শীঘ্র ঠাণ্ডা হয় সমুদ্রের জল তত শীঘ্র হয় না। সেইজন্য



চিত্র 68b
শীতল স্থলভাগ

সমুদ্রের উপরিস্থিত বায়ু হাল্‌কা হইয়া উপরে উঠিয়া যায়, এবং স্থলভাগের উপরিস্থিত ঠাণ্ডা ও ভারী বায়ু সমুদ্র অভিমুখে প্রবাহিত হইতে থাকে। এই বায়ু প্রবাহকে **স্থলবায়ু** (land breeze) বলে (চিত্র 68b)। এই দুই বায়ু-প্রবাহের জন্য সমুদ্র উপকূলের জলবায়ু সমভাবাপন্ন।

প্রশ্নাবলী

1. তাপের উৎস সম্বন্ধে যাহা জান লিখ।

2. তাপের ফলগুলি বর্ণনা কর।

3. কঠিন পদার্থ যে তাপ প্রয়োগে প্রসারিত হয় তাহা একটি পরীক্ষা দ্বারা বুঝাও।

4. "তাপ প্রয়োগে তরল পদার্থ আয়তনে বাড়ে।"—একটি পরীক্ষার বর্ণনা দিয়া এই সত্যটি প্রমাণ কর।

5. তাপ প্রয়োগে গাসীয় পদার্থ যে প্রসারিত হয় তাহার একটি পরীক্ষার বর্ণনা দাও।

6. স্থলবায়ু ও সমুদ্রবায়ুর উৎপত্তি হয় কেন?

7. বিজ্ঞান সম্মত ব্যাখ্যা কর :—

(i) রেল লাইনের মধ্যে ফাঁক রাখা হয় কেন?

(ii) পাহাড়ের গাত্রে অনেক সময় ফাটল দেখা যায় কেন ?

(iii) গরুর গাড়ীর চাকায় লোহার বেড় কি প্রকারে লাগানো হয় ?

(iv) দুইটি বিভিন্ন ধাতুর রিভেট করা পাত উত্তপ্ত করিলে বাঁকিয়া যায় কেন ?

(v) বিভিন্ন ধরনের শিশি-বোতলের ধাতুনির্মিত ঢাক্‌না অনেক সময় সহজে খুলিতে পারা যায় না। কেমন করিয়া খুলিবে ?

(vi) দিবাভাগে সমুদ্রের উপর হইতে স্থলভাগের দিকে বায়ু প্রবাহিত হয় কেন ?

দ্বাদশ অধ্যায়

তাপ ও তাপমাত্রা : তাপমান যন্ত্র

(Heat and Temperature: Thermometers)

66. তাপ ও তাপমাত্রা (Heat and Temperature) : ফুটন্ত জলে হাত দিলে গরম বোধ হয়, সাধারণ কলের জলে হাত দিলে ঠাণ্ডা বোধ হয়, আবার বরফের জলে হাত দিলে তদপেক্ষা ঠাণ্ডা বোধ হয়। সুতরাং প্রত্যেক বস্তুতেই কিছু পরিমাণ তাপ আছে। বস্তু আপাতভাবে গরম বা ঠাণ্ডা বোধ হইলেও তাপ তাহাতে থাকিতেই হইবে ; যদিও তাপের পরিমাণের তারতম্য ঘটিতে পারে। কোন পদার্থ ঠাণ্ডা কি গরম এই অনুভূতিকেই পদার্থের **তাপমাত্রা** বলা হয়। যে পদার্থে হাত দিলে ঠাণ্ডা বলিয়া মনে হয় তাহার তাপমাত্রা কম বলা হয়, আর যে পদার্থ স্পর্শ করিলে গরম লাগে তাহার তাপমাত্রা বেশী বলা হয়। আবার জ্বলন্ত দেশলাই কাঠির তাপমাত্রা পাত্রের ফুটন্ত জল অপেক্ষা অনেক বেশী, কিন্তু পাত্রের জলের মোট তাপ দেশলাই কাঠির মোট তাপ অপেক্ষা বেশী। সুতরাং পদার্থের তাপ বেশী থাকিলেই যে তাপমাত্রা বেশী হইবে তাহার কোন অর্থ নাই।

67. তাপ ও তাপমাত্রার পার্থক্য : সাধারণ ভাবে তাপ ও উষ্ণতা বা তাপমাত্রা এক মনে হইলেও উহারা এক বস্তু নহে। (1) তাপ এক প্রকার **শক্তি,** কিন্তু তাপমাত্রা বস্তুর এক **তাপীয়** (thermal) অবস্থা।

(2) বস্তু তাপ গ্রহণ করিলে উহার তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায় এবং তাপ ছাড়িয়া দিলে তাপমাত্রা হ্রাস পায়। অর্থাৎ তাপকে **কারণ** (cause) এবং তাপমাত্রা হইল উহার **ফল** (effect)।

(3) কিছু পরিমাণ জলের সহিত ইহার তলের (level) যে পার্থক্য, তাপের সহিত তাপমাত্রারও সেই পার্থক্য। দুইটি বস্তুর মধ্যে যাহার তাপমাত্রা বেশী তাহার মোট তাপ কম তাপমাত্রা সম্পন্ন বস্তুটির দিকে যাইবে।

(4) দুইটি বস্তুর তাপমাত্রা এক হইলেই যে সমপরিমাণ তাপ থাকিবে তাহার কোন অর্থ নাই। আবার দুই বস্তুর সম পরিমাণ তাপ থাকিলেই উহাদের তাপ-মাত্রা এক হইবে তাহারও কোন অর্থ নাই। একটি বড় বালতির জলে ও একটি ছোট বালতির জলে সমান পরিমাণ তাপ প্রয়োগ করিলে দেখা যাইবে যে ছোট বালতির তাপমাত্রা অধিক হইয়াছে।

68. **থার্মোমিটারস্ (Thermometers):** যে যন্ত্রের সাহায্যে কোন বস্তুর তাপমাত্রা মাপা যায় তাহাকে **থার্মোমিটার** বা **উষ্ণতামাপক যন্ত্র** বলে। থার্মোমিটার নানা ধরনের নির্মিত হয়। (1) তরল (পারদ ও অ্যালকোহল) থার্মোমিটার ; (2) গ্যাস থার্মোমিটার ; (3) প্লাটিনাম রেজিসটান্স থার্মোমিটার (platinum resistance thermometer) ; (4) থার্মোকাপল্ (Thermo-couple).

পারদ থার্মোমিটার (Mercury-in-glass thermometer): 69a চিত্রে একটি পারদ থার্মোমিটার দেখানো হইয়াছে। পারদ থার্মোমিটার তৈয়ারি করিতে হইলে প্রথমে সমান প্রস্থচ্ছেদ বিশিষ্ট এবং দুই মুখ খোলা একটি কাঁচের কৈশিক নল (capillary tube) l লইয়া উত্তমরূপে পরিষ্কার করা হয় এবং উহার পর ইহাকে সম্পূর্ণ শুষ্ক করিয়া লইয়া নলটির একপ্রান্ত উত্তপ্ত করিয়া সেই প্রান্তে একটি বাল্ব B (চিত্র 69b) ফুঁ দিয়া তৈয়ারি করা হয়। নলের খোলা মুখের একটু নীচে উত্তাপদ্বারা গরম করিয়া এবং তারপর টানিয়া ঐ নলের শীর্ষভাগে একটি সরু গলা (neck) সৃষ্টি করা হয়। ঐ গলার সরু মুখে একটি রবার টিউব (t) লাগাইয়া উহার সহিত একটি ছোট ফানেল (F) সংযুক্ত করিয়া উহার মধ্যে বিশুদ্ধ পারা ঢালা হয়। নলের প্রস্থচ্ছেদ খুব সূক্ষ্ম বলিয়া মধ্যস্থ বায়ুচাপ ঐ পারাকে নলের মধ্যে প্রবেশ করিতে দেয় না। এইবার বাল্বটিকে গরম করিলে বায়ু প্রসারিত হইয়া পারদের মধ্য দিয়া বাহির হইয়া আসিবে। তারপর বাল্বটিকে ঠাণ্ডা করিলে বায়ু সঙ্কুচিত হইবে এবং তাহার ফলে কিছু পরিমাণ পারদ বাল্বের মধ্যে প্রবেশ করিবে। বাল্বটিকে এইভাবে বারবার গরম ও ঠাণ্ডা করিয়া নলের মধ্যে পারা প্রবেশ করাইয়া বাল্বটি পুরা (নলের খানিকটা পর্যন্ত) পারার দ্বারা ভর্তি করিয়া ফানেলটি সরাইয়া দেওয়া হয়।

তারপর বাল্‌বটিতে ক্রমশঃ তাপ দিয়া পারা স্ফীত করিতে থাকিলে ঐ পারা যখন নলটি পুরাপুরি ভর্তি করিয়া C বিন্দুতে পৌঁছায় তখন ব্লো পাইপের শিখা দ্বারা নলের মুখটি তাড়াতাড়ি বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। ইহার পর নলটি ঠাণ্ডা করিলে





চিত্র 69a
পাদর থার্মোমিটার



চিত্র 69b
পারদ থার্মোমিটার প্রস্তুত করণ

পারদ সঙ্কুচিত হইয়া নলটির বাল্‌ব ও উহার উপরের কিছু অংশ জুড়িয়া থাকে। এইরূপে পারদ থার্মোমিটার প্রস্তুত করা হয়।

থার্মোমিটারের নলটির প্রস্থচ্ছেদ সর্বত্র সমান না হইলে একই তাপমাত্রা পরিবর্তনে পারদ নলের সর্বত্র সমানভাবে অগ্রসর হইবে না। ফলে তাপমাত্রা নির্ভুলভাবে মাপা যাইবে না।

69. **থার্মোমিটারের স্থিরাঙ্ক ও স্কেল (Fixed points and scales) :** থার্মোমিটারের স্থিরাঙ্ক বলিতে কোন নির্দিষ্ট উষ্ণতাকে বুঝায়। উষ্ণতা নির্ণয়ের জন্য থার্মোমিটারের নলের গায়ে দাগ কাটা হয়। ইহাকে **স্কেল** বলে। এইজন্য

দুইটি নির্দিষ্ট উষ্ণতাকে স্থির বলিয়া ধরিয়া লওয়া হইয়াছে। এই দুইটি নির্দিষ্ট উষ্ণতাকে থার্মোমিটারের **স্থিরাঙ্ক** (fixed points) বলে। একটিকে **নিম্ন স্থিরাঙ্ক** (lower fixed point) ও অপরটিকে **উচ্চ স্থিরাঙ্ক** (upper fixed point) বলা হয়। প্রথমে পারা ভরা থার্মোমিটারকে বিশুদ্ধ বরফের গুঁড়ার মধ্যে দাঁড় করাইয়া রাখা হয়। বরফের ঠাণ্ডায় থার্মোমিটারের পারা সঙ্কুচিত হইয়া প্রায় উহার বাল্‌বটির কাছে নামিয়া আসিবে ও স্থির থাকিবে। তখন পারার মাথার কাছে একটি দাগ দেওয়া হয়। এই দাগকে 0°C শূন্য ডিগ্রী **সেণ্টিগ্রেড** (Centigrade) বলা হয়। ইহাই থার্মোমিটারের **নিম্ন স্থিরাঙ্ক** (lower fixed point)। তারপর থার্মোমিটারটিকে ফুটানো জলের বাষ্পে রাখা হয়। পারা গরমে নলের মধ্য দিয়া উঠিতে থাকিবে। যখন দেখা যাইবে পারা আর উঠিতেছে না, স্থির হইয়া আছে, তখন তাহার মাথায় একটি দাগ কাটা হয়। এই দাগটিকে (100°C) এক শত ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড বলা হয়। উহা থার্মোমিটারের **ঊর্ধ্ব স্থিরাঙ্ক** (upper fixed point)। ফারেনহাইট থার্মোমিটারের স্কেলে নিম্ন স্থিরাঙ্ক $32°F$ ও ঊর্ধ্ব স্থিরাঙ্ক $212°F$। সচরাচর সেন্টিগ্রেড স্কেল ও ফারেনহাইট স্কেলের থার্মোমিটার ব্যবহৃত হয়।

70. **উষ্ণতা পরিমাপের পদ্ধতি :**—উষ্ণতা পরিমাপের তিনটি পদ্ধতি চলিত আছে :—(1) **সেণ্টিগ্রেড** (Centigrade) **:**—এই পদ্ধতিতে হিমাঙ্ককে $0°$ এবং স্ফুটনাঙ্ককে 100° ধরিয়া দুই মানবিন্দুর মধ্যবর্তী স্থানকে 100 সমান ভাগে ভাগ করা হয় এবং প্রত্যেক ভাগের নাম ডিগ্রী।

(2) ফারেনহাইট (Fahrenheit) :—এই পদ্ধতিতে হিমাঙ্ককে 32° এবং স্ফুটনাঙ্ককে 212° ধরিয়া দুই মানববিন্দুর মধ্যবর্তী স্থানকে 180 সমান ভাগে ভাগ করা হয়। উহা ডাক্তার, আবহাওয়াবিদ্‌ ও এঞ্জিনিয়ারগণ ব্যবহার করেন। উপরোক্ত দুইপ্রকার স্কেলের তুলনা করিলে দেখা যায় যে—

$$1°C = \left(\frac{180}{100}\right)^{\circ} F = \left(\frac{9}{5}\right)^{\circ} F.$$

(3) রেমার (Reaumar) :—এই পদ্ধতিতে হিমাঙ্ককে 0° এবং স্ফুটনাঙ্ককে 80° ধরিয়া দুই মানবিন্দুর মধ্যবর্তী স্থানকে 80 সমান ভাগে ভাগ করা হয়।

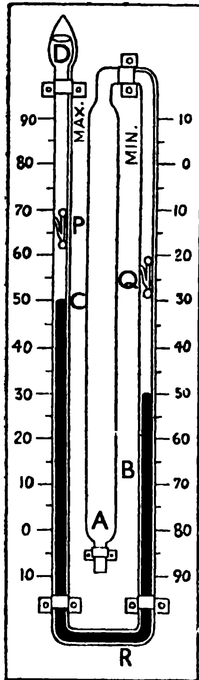
$$1°C = \left(\frac{80}{100}\right)^{\circ} R = \left(\frac{4}{5}\right)^{\circ} R.$$

71. সিক্সের চরম ও অবম থার্মোমিটার (Six's maximum and minimum thermometer) :

দিনরাত্রির মধ্যে প্রতি মুহূর্তেই বায়ুর তাপমাত্রার পরিবর্তন হইতেছে। সেন্টিগ্রেড

বা ফারেনহাইট থার্মোমিটার সাহায্যে সারাদিনের মধ্যে সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রা নির্ণয় করিতে হইলে একজন মানুষকে সব সময় থার্মোমিটারের সম্মুখে বসিয়া থাকিতে হইবে। কিন্তু ইহা মোটেই সুবিধাজনক নহে। চরম ও অবম থার্মোমিটারের সাহায্যে স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে কোন নির্দিষ্ট সময়ে আবহাওয়ার সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রা নির্ণয় করা যায়।

সিক্সের চরম ও অবম থার্মোমিটারে (চিত্র 70) বাল্‌ব A-এর সহিত একটি লম্বা U কাচ-নলের একপ্রান্ত সংযুক্ত থাকে। অপর প্রান্তে D আর একটি বাল্‌ব। A বাল্‌ব এবং B নলের কিয়দংশ কোহল (alcohol) দ্বারা পূর্ণ করা হয়। কাচ নলের BRC অংশ পারদপূর্ণ করা হয়। C হইতে D বাল্‌বের কিয়দংশ পর্যন্ত কোহল পূর্ণ। D এর উপর অংশ কোহল বাষ্পপূর্ণ। থার্মোমিটারের কোহল প্রসারিত হইলে এই বাল্‌বে আসিয়া জমা হয়। U নলের দুই পারদ-স্তম্ভের উপর দুইটি ইস্পাত-নির্মিত সূচক (P এবং Q) থাকে। ইহাদের আকৃতি ডাম্বেলের ন্যায় এবং ইহারা প্রত্যেকেই স্প্রিংযুক্ত। ঐ স্প্রিংয়ের চাপে ইহারা নলের গায়ে লাগিয়া থাকে। U নলের গা বাহিয়া দুইটি স্কেল (ফারেনহাইট দাগ কাটা) থাকে একটি স্কেলে উচ্চ হইতে নিম্নে (চরম স্কেল) এবং অপরটিতে নিম্ন হইতে উচ্চে (অবম স্কেল) দাগ কাটা থাকে। প্রথমে একটি চুম্বক দ্বারা বাহির হইতে P ও Q সূচকদ্বয়কে টানিয়া C এবং B পারদস্তম্ভের সংস্পর্শে রাখা হয়। তাপমাত্রা বাড়িতে থাকিলে A বাল্‌বের কোহল আয়তনে বাড়িয়া B পারদ-প্রান্তকে নীচের দিকে ঠেলিয়া দিবে এবং C-প্রান্তে সূচক P-কে উপরের দিকে ঠেলিবে। Q সূচকটি যথাস্থানে থাকিয়া যায়। গরিষ্ঠ স্কেল হইতে P সূচকের অবস্থান পাঠ করিলে দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা পাওয়া যাইবে। আর তাপমাত্রা কমিলে A বাল্‌বে কোহল আয়তনে কমিবে এবং পারদ-স্তম্ভ ডানদিকের খাড়া নলে উঠিয়া যাইবে। Bতে অবস্থিত সূচকটি ইহার ফলে উপর দিকে উঠিয়া যায়। এইভাবে ডানদিকের



চিত্র 70
সিক্সের চরম ও অবম থার্মোমিটার

নিম্নিষ্ঠ স্কেল হইতে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা পাওয়া যাইবে। এই থার্মোমিটার আবহাওয়া-বিদ্গণ ব্যবহার করেন।

71(a). থার্মোমিটারে পারদ ও কোহল ব্যবহারের সুবিধা ও অসুবিধা (Advantages and disadvantages of using mercury and alcohol in a thermometer) :

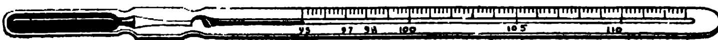
(i) পারদের স্ফুটনাঙ্ক 357°C এবং হিমাঙ্ক −39°C কিন্তু কোহলের স্ফুটনাঙ্ক 78°C এবং হিমাঙ্ক −130°C। সুতরাং পারদ থার্মোমিটারের সীমা (range) বেশী কিন্তু কোহল থার্মোমিটার দ্বারা নিম্নমানের উষ্ণতা মাপা যায়।

(ii) পারদ তাপের সুপরিবাহী বলিয়া ইহা উষ্ণ বস্তুর সংস্পর্শে আসামাত্রই বস্তু উষ্ণতা গ্রহণ করিতে পারে। কিন্তু কোহল তাপের সুপরিবাহী নয়।

(iii) বিভিন্ন উষ্ণতায় পারদের প্রসারণের হার সর্বত্র সমান। কিন্তু কোহলের প্রসারণের হার উষ্ণতা বৃদ্ধির সঙ্গে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। (iv) সমান আয়তনের কোহল নির্দিষ্ট তাপমাত্রা বৃদ্ধির জন্য পারদ অপেক্ষা কম তাপ গ্রহণ করিবে। ইহা কোহল থার্মোমিটারের সুবিধা। (v) পারদ চকচকে ও অস্বচ্ছ তরল পদার্থ বলিয়া কাঁচের ভিতর ইহার অবস্থান ভালভাবে বোঝা যায়। কিন্তু কোহলের ক্ষেত্রে—রঙ করিয়া লইতে হয়। (vi) পারদ কাঁচ ভিজায় না। সেইজন্য মসৃণভাবে নলের উপরে উঠিতে পারে না। কোহল কাঁচ ভিজায় এবং কাঁচের নলে মসৃণভাবে উঠিয়া যায়। (vii) কোহল উদ্বায়ী এবং কোহল সূত্রের উপরে থার্মোমিটারের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে ইহাকে বাষ্প জমিয়া থাকে। ফলে কোহলের বাষ্প বেশ কিছু চাপ প্রয়োগ করে। ইহা একটি অসুবিধা।

72. ডাক্তারি থার্মোমিটার (Clinical Thermometer) :

মানবদেহের তাপ পরীক্ষা করিবার জন্য ডাক্তারেরা এই থার্মোমিটার ব্যবহার করিয়া থাকেন। ইহা একটি সর্বোচ্চ উষ্ণতামাপনী বিশেষ পাল্লার ফারেনহাইট থার্মোমিটার। ইহাতে সাধারণতঃ 95° ডিগ্রী হইতে 110° ডিগ্রী ফারেনহাইট



চিত্র 71
ডাক্তারী থার্মোমিটার

পর্যন্ত দাগ কাটা থাকে। এই থার্মোমিটারের বাল্বের কাছে রন্ধ্র খুব সঙ্কুচিত এবং একটু বাঁকা (*A*) (চিত্র 71)। এইজন্য মানুষের দেহের তাপমাত্রা

অনুযায়ী পারদ প্রসারিত হইয়া ঐ সঙ্কুচিত স্থান দিয়া সহজে অগ্রসর হয় কিন্তু দেহের বাহিরে থার্মোমিটার আনিলে পারদ ঐ স্থান দিয়া বাল্‌বে ফিরিয়া আসিতে পারে না। সুতরাং তাপমাত্রা বা দেহের উষ্ণতা পড়িবার সুবিধা হয়। ঝাঁকুনি দিলে পারদ বাল্‌বে ফিরিয়া আসে এবং পুনরায় থার্মোমিটার ব্যবহার করা যায়।

প্রশ্নাবলী

1. তাপ ও তাপমাত্রার সংজ্ঞা লিখ। উহাদের মধ্যে পার্থক্য কি ?

2. থার্মোমিটার কাহাকে বলে ? কয়েকপ্রকার থার্মোমিটারের নাম বল। পারদ থার্মোমিটার তৈয়ারি করিবার পদ্ধতি বর্ণনা কর।

3. থার্মোমিটারের হিমাঙ্ক ও স্ফুটনাঙ্ক নির্ণয়ের পদ্ধতি সংক্ষেপে বর্ণনা কর।

4. সেন্টিগ্রেড, ফারেনহাইট ও রেমার থার্মোমিটারের তুলনা কর।

5. চরম ও অবম থার্মোমিটারের ক্রিয়া একটি সুন্দর চিত্র আঁকিয়া বর্ণনা কর।

ইহা কোন্ কাজের জন্য ব্যবহৃত হয় ? থার্মোমিটারে পারদ ও কোহল ব্যবহারের সুবিধা ও অসুবিধা গুলির আলোচনা কর।

6. ডাক্তারি থার্মোমিটারের বিশেষত্ব কি ?

7. নির্ভুল উক্তিগুলির পার্শ্বে '✓' চিহ্ন দাও :—

(i) ডাক্তারি থার্মোমিটারে কোন রোগীর জ্বর দেখিবার পর আবার উহা ব্যবহার করিতে হইলে ঝাঁকাইয়া নলের পারদকে কুণ্ডের পারদের সহিত একত্র করিতে হয়।

(ii) থার্মোমিটারের নলের ছিদ্রের ব্যাস সর্বত্র সমান না হইলেও চলে।

(iii) তাপ ও উষ্ণতার মধ্যে কোন পার্থক্য নাই।

(iv) উষ্ণতা স্পর্শানুভূতির দ্বারা সঠিক বোঝা যায় না।

(v) হিমাঙ্ক নির্ণয় করিবার সময় থার্মোমিটারের নল সম্পূর্ণ বরফে না ডুবিয়া থাকিলে ভুল হয়।

(vi) $9°F = 4°R$

ত্রয়োদশ অধ্যায়

তাপে অবস্থার পরিবর্তন
(Change of State)

73. গলন ও গলনাঙ্ক (Melting and Melting point) :

পদার্থ কঠিন, তরল ও গ্যাসীয় বা বায়বীয়—এই তিন অবস্থায় থাকিতে পারে। তাপ প্রয়োগে যখন কঠিন পদার্থ তরলে বা তরল হইতে বায়বীয় অবস্থাতে, এবং তাপ হরণ করিয়া বায়বীয় পদার্থকে (যেমন জলীয় বাষ্পকে জলে) তরল বা তরলকে কঠিন অবস্থাতে পরিবর্তিত করা হয় তখন তাহাকে পদার্থের **অবস্থা পরিবর্তন** (Change of State) বলা হয়। কঠিন পদার্থে তাপ প্রয়োগ করিতে থাকিলে উহার তাপমাত্রা ক্রমেই বাড়িতে থাকে। ক্রমে এমন একটি অবস্থা আসে যখন তাপ প্রয়োগ করিলেও তাপমাত্রার কোন পরিবর্তন না হইয়া পদার্থ গলিতে আরম্ভ করে। কঠিন পদার্থ সম্পূর্ণ গলিয়া তরলে পরিণত না হওয়া পর্যন্ত উহার তাপমাত্রা একই থাকে। ইহাকে পদার্থের **গলন** (melting) বলে। কোন নির্দিষ্ট চাপে যে তাপমাত্রায় কঠিন পদার্থ তরলে পরিণত হয় তাহাকে ঐ পদার্থের **গলনাঙ্ক** (melting point) বলে। বায়ুমণ্ডলের স্বাভাবিক চাপে বরফ $0°C$এ গলিয়া যায়। সুতরাং বরফের গলনাঙ্ক $0°C$। ন্যাপথালীন $80°C$এ গলিয়া যায়, তামা $1083°C$এ গলিয়া যায়; সুতরাং ন্যাপথালীন ও তামাব গলনাঙ্ক যথাক্রমে $80°C$ এবং $1083°C$।

74. কঠিনীভবন ও হিমাঙ্ক (Solidification and Freezing point) :

একটি পাত্রে জল লইয়া উহাকে একটি হিমমিশ্রণের মধ্যে রাখিলে দেখা যাইবে যে ইহার তাপমাত্রা হ্রাস পাইতেছে। তাপ কমিতে কমিতে যখন $0°C$এ আসিবে তখন জল জমিয়া বরফ হইবে। যতক্ষণ পর্যন্ত না সমস্ত জল জমিয়া বরফে পরিণত হইতেছে ততক্ষণ পর্যন্ত তাপমাত্রা $0°C$এ থাকিবে। তরল অবস্থা হইতে এইরূপে পদার্থের কঠিন অবস্থা প্রাপ্তির নাম **কঠিনীভবন** (Solidification)। কোন নির্দিষ্ট চাপে তরল পদার্থ যে তাপমাত্রায় জমিতে আরম্ভ করে তাহাকে উক্ত তরলের **হিমাঙ্ক** (Freezing point) বলে। বরফ জল $0°C$এ জমিয়া বরফে পরিণত হয়। সুতরাং জলের হিমাঙ্ক $0°C$। কাজেই বরফের **গলনাঙ্ক** ও **হিমাঙ্ক** এক। কিন্তু

উহারা ধ্রুবক নহে। চাপের উপর উহারা নির্ভর করে। কেলাসিত (crystalline) পদার্থ মাত্রেরই গলনাঙ্ক ও হিমাঙ্ক অনুরূপ ; কিন্তু মোম, কাঁচ প্রভৃতি অকেলাসিত (non-crystalline) পদার্থের গলনাঙ্ক ও হিমাঙ্ক এক নহে।

কয়েকটি পদার্থের গলনাঙ্ক

পদার্থ	গলনাঙ্ক	পদার্থ	গলনাঙ্ক
বরফ	0°C	ন্যাপথালিন	80°C
সীসা	327°C	পারদ	39°C
এ্যালুমিনিয়াম	600°C	টিন	232°C
গ্লিসারিন	18°C	গন্ধক	112·8°C
তামা	1083°C	সোনা	1063°C
দস্তা	960°C	স্যালফিউরিক	
প্লাটিনাম	1755°C	এ্যাসিড	103°C

75. **বাষ্পীভবন বা বাষ্পায়ণ ও স্ফুটন** (Evaporation and boiling): যে কোনও তাপমাত্রায় তরল পদার্থের বাষ্পীয় অবস্থায় পরিবর্তনের প্রক্রিয়াকে **বাষ্পীভবন** বলে। কোন তরলের বায়বীয় অবস্থাকে উক্ত তরলের **বাষ্প** (vapour) বলে। তরল পদার্থ দুইটি উপায়ে বাষ্পে পরিণত হইতে পারে, যথা—(i) বাষ্পায়ণ (Evaporation) এবং (ii) স্ফুটন (Boiling or Ebulition)।

(*i*) **বাষ্পায়ণ:** যে কোন তাপমাত্রায় কেবলমাত্র উপরতল হইতে ধীরে ধীরে তরল পদার্থের বাষ্পে পরিণত হওয়ার পদ্ধতিকে **বাষ্পায়ণ** বলে। একটি বড় মুখবিশিষ্ট পাত্রে অল্প পরিমাণ জল লইয়া খোলা জায়গায় রাখিয়া দিলে তাহা অতি ধীরে ধীরে বাষ্প হইয়া উবিয়া যায় (চিত্র 72)। গ্রীষ্মের সময় পুকুরের জল বাষ্পীভবনের জন্য আস্তে আস্তে কমিয়া যায়। সকল তরলের বাষ্পায়ণের হার সমান নহে। কোন্ পদার্থ কত দ্রুত বাষ্পীভূত হইবে তাহা তাহার স্ফুটনাঙ্কের (boiling point-এর) উপর নির্ভর করে। বর্ষাকালে ভিজা কাপড় তাড়াতাড়ি শুকায় না, কেননা বাতাসে প্রচুর জলীয় বাষ্প থাকে। বায়ু যত শুকনো



চিত্র 72
পাত্র হইতে জল বাষ্পে পরিণত হইতেছে

হইবে, বাষ্পীভবনও তত দ্রুত হইবে। হাওয়া থাকিলে জল তাড়াতাড়ি বাষ্পীভূত হয়। পাখার দ্বারা শরীরে হাওয়া দিলে ঠাণ্ডা অনুভব করি, কেননা হাওয়া লাগিয়া শরীরের ঘাম খুব তাড়াতাড়ি বাষ্পীভূত হয়। জলের এই অবস্থার পরিবর্তনের জন্য প্রয়োজনীয় তাপ শরীর হইতে লয়, ফলে দেহে তাপ কমিলে ঠাণ্ডা বোধ হয়। বাষ্পায়ণ তরল পদার্থের উপরিতল (surface) হইতে হইয়া থাকে। কম বায়ুচাপেও বাষ্পীভবন দ্রুত হয়। সুতরাং বাষ্পীভবন তরল পদার্থের (1) স্ফুটনাঙ্ক, (2) বায়ুর গতিবেগ, (3) বায়ুর শুষ্কতা, (4) তরল ও তরল-সংলগ্ন বায়ুর উষ্ণতা, (5) বৃষ্টির পরিসর ও (6) বায়ুর চাপের উপর নির্ভর করে।

(*ii*) **স্ফুটন ও স্ফুটনাঙ্ক** (Boiling and Boiling point): একটি নির্দিষ্ট উষ্ণতায় তরল পদার্থ ফুটিতে থাকে এবং উহার সমস্ত অংশ অত্যন্ত দ্রুত বাষ্পে পরিণত হয়। উষ্ণতা বৃদ্ধি করিয়া তরল পদার্থকে বায়বীয় পদার্থে রূপান্তরিত করার নাম **স্ফুটন**। যতক্ষণ না সমস্ত তরল পদার্থ বাষ্পে পরিণত হইতেছে, ততক্ষণ উষ্ণতা একই থাকিবে। যে নির্দিষ্ট উষ্ণতায় স্ফুটন সংঘটিত হয় তাহাকে **স্ফুটনাঙ্ক** (Boiling point) বলে। স্বাভাবিক বায়ুর চাপে বিশুদ্ধ জলের স্ফুটনাঙ্ক 100°*C*, পারদের স্ফুটনাঙ্ক 357°*C*, কোহলের স্ফুটনাঙ্ক 78°*C*, অক্সিজেনের স্ফুটনাঙ্ক 183°*C* ।

বাষ্পায়ণ ও স্ফুটনের পার্থক্য (Difference between Evaporation and Boiling) :—

বাষ্পায়ণ বা বাষ্পীভবন	স্ফুটন
1. বাষ্পায়ণ একটি ধীরগতি প্রক্রিয়া।	1. স্ফুটন তরল পদার্থটিকে দ্রুত বাষ্পে পরিণত করে।
2. বাষ্পায়ণে তরল পদার্থটির কেবলমাত্র উপরের তল হইতে বাষ্প নির্গত হইতে থাকে।	2. স্ফুটনকালে তরলের সকল স্থান হইতেই বাষ্প নির্গত হয়।
3 বাষ্পায়ণ সব উষ্ণতাতেই হয়।	3. স্ফুটন একটি নির্দিষ্ট উষ্ণতাতেই ঘটিয়া থাকে।

76. **লীন-তাপ** (Latent heat) : আমরা লক্ষ্য করিয়াছি যে কোন পদার্থে ক্রমশঃ তাপ প্রয়োগ করিলে পদার্থের উষ্ণতার পরিবর্তন হয়; কিন্তু পদার্থের অবস্থান্তর হইতে থাকিলে আর উষ্ণতা বৃদ্ধি পায় না। অথচ অবস্থান্তরের জন্য

তাপ প্রদান করিতে হয়। তাপমাত্রা পরিবর্তন না করিয়া কোন পদার্থের অবস্থান্তর হইলেই উহা কিছু তাপ গ্রহণ বা বর্জন করে যাহার বাহ্যিক প্রকাশ হয় না। এই তাপকেই **লীন-তাপ** (latent heat) বলা হয়। কারণ এই তাপ পদার্থে **লীন** (hidden) হইয়া থাকে।

গলনের লীন-তাপ (Latent heat of fusion):—একক ভরযুক্ত কোন পদার্থের তাপমাত্রার পরিবর্তন না ঘটাইয়া, শুধু গলাইতে অর্থাৎ কঠিন হইতে তরলে পরিণত করিতে যে পরিমাণ তাপের প্রয়োজন হয় তাহাকে ঐ পদার্থের **গলনের লীন তাপ** বলে। বরফ গলনের লীনতাপ 80 ক্যালরি বলিতে ইহাই বুঝাইবে যে $0°C$ উষ্ণতায় 1 গ্রাম বরফকে $0°C$ উষ্ণতায় 1 গ্রাম জলে পরিণত করিতে 80 ক্যালরি তাপের প্রয়োজন হয়।

বাষ্পীভবনের লীন-তাপ (Latent heat of vaporisation):—তাপমাত্রার পরিবর্তন না করিয়া কোনও একক ভরযুক্ত তরল পদার্থকে শুধু বাষ্পে পরিণত করিতে যে তাপ লাগে তাহাকে ঐ পদার্থের **বাষ্পীভবনের লীন-তাপ** বলে।

· 77. **বাষ্পায়ণে শৈত্যের সঞ্চার** (Cooling caused by evaporation): *তরল পদার্থ বাষ্পে পরিণত হইতে গেলে লীন-তাপ গ্রহণ করে।* বাহির হইতে এই নীল-তাপ সরবরাহ না হইলে, তরল নিজ দেহ হইতে অথবা পারিপার্শ্বিক হইতে তাপ সংগ্রহ করে। ফলে তরল অথবা পারিপার্শ্বিক শীতল হইয়া পড়ে। বাষ্পায়ণে শৈত্যের সঞ্চার হয় তাহা কয়েকটি উদাহরণ হইতে স্পষ্ট বোঝা যাইবে :—

(*i*) হাতে ইথার বা স্পিরিট ঢালিলে হাত ঠাণ্ডা বোধ হয়। ইথার বা স্পিরিট উদ্বায়ী পদার্থ। উদ্বায়ী তরল অতি শীঘ্র বাষ্পে রূপান্তরিত হয় ইহার জন্য প্রয়োজনীয় লীন-তাপ উহা হাত হইতেই সংগ্রহ করে। ফলে হাত খুব শীতল হয়। এইজন্য জ্বর হইলে কপালে ওডিকোলনের পটি বা জলপটি দেওয়া হয়। জলপটি হইতে জল বাষ্পীভূত হইবার সময় দেহ হইতে তাপ লয় এবং ইহাতে জ্বর কমিয়া যায়।

(*ii*) মাটির কুঁজার বা কলসীর জল বেশী ঠাণ্ডা থাকে। মাটির কুঁজায় অসংখ্য ছিদ্র থাকে, উহাদের ভিতব দিয়া জল চোঁয়াইয়া বাহির হইয়া ধীরে ধীরে বাষ্পে পরিণত হয়। ইহার জন্য প্রয়োজনীয় লীনতাপ জল হইতেই সংগ্রহ করিতে হয় বলিয়া জল ঠাণ্ডা হইয়া যায়। পিতল বা অন্য ধাতুনির্মিত পাত্রে ছিদ্র থাকে না বলিয়া জল উবিয়া যাইতে পারে না।

(iii) **ইথার ঠাণ্ডা করিয়া বরফ তৈয়ারী** (Preparation of ice by cooling ether) :

পরীক্ষা : একটি কাঁচের পাত্রে (বীকারে) খানিকটা ইথার লইয়া উহাকে একটি কাঁচের ডিসে বসান হয়। এইবার ডিসে একটু জল ঢালিয়া দেওয়া হয় এবং একটি কাঁচের নল ইথারের মধ্যে ডুবাইয়া উহার ভিতর ক্রমাগত ফুঁ দেওয়া হয়। এইরূপ করিলে ইথার দ্রুত বাষ্পীভূত হইতে থাকে এবং ইহার জন্য প্রয়োজনীয় লীনতাপ জল হইতেই সংগৃহীত হয়। ইহার ফলে বীকারের বাহিরের জল বরফ হইয়া বীকারকে আটকাইয়া ধরে।

প্রশ্নাবলী

1. পদার্থের গলন ও কঠিনীভবন কাহাকে বলে? ন্যাপথালিনের গলনাঙ্ক ৪0°C বলিতে কি বুঝায়? পদার্থের গলনাঙ্ক ও হিমাঙ্ক কি এক?

2. বাষ্পায়ণ ও স্ফুটন কাহাকে বলে? উহাদের মধ্যে পার্থক্য কি?

3. নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির বিজ্ঞানসম্মত উত্তর দাও :—

(i) হাতে ইথার ঢালিলে হাত ঠাণ্ডা হয় কেন?

(ii) মাটির কুঁজায় জল রাখিলে জল ঠাণ্ডা হয়, কিন্তু পিতল বা অন্য ধাতুনির্মিত পাত্রে রাখিলে ঠাণ্ডা হয় না কেন?

(iii) ভিজা কাপড় গায়ে শুকানো উচিত নয় কেন?

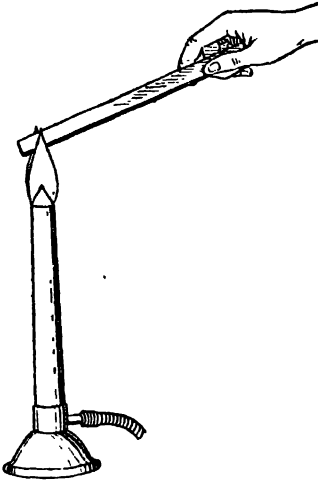
(iv) কুকুরেরা জিহ্বা দিয়া শ্বাস লয় কেন?

4. কোন্ কোন্ কারণের উপর বাষ্পায়ণের হার নির্ভর করে?

চতুর্দশ অধ্যায়

তাপ সঞ্চালন (Transmission of heat)

78. **তাপ সঞ্চারণ প্রণালী** (How heat travels): যে স্থানের উষ্ণতা অধিক সেই স্থান হইতে কম উষ্ণতাবিশিষ্ট স্থানে তাপ প্রবাহিত হয়। এক স্থান হইতে অন্য স্থানে তিনটি পদ্ধতিতে তাপের প্রবাহ বা সঞ্চালন হইয়া থাকে। যথা (1) পরিবহণ (Conduction), (2) পরিচলন (Convection) ও (3) বিকিরণ (Radiation).

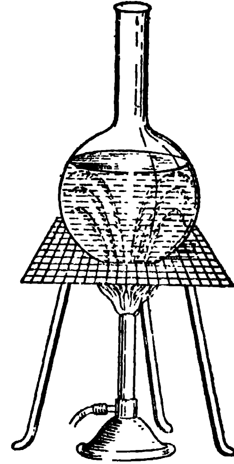


চিত্র 73
তাপের পরিবহণ

তাপ পরিবহণ (Conduction of heat):—এক টুকরা লোহার পাতের একপ্রান্ত বুনসেন বার্ণারে ধরিয়া অপর প্রান্ত হাত দিয়া ধরিলে কিছু সময় পরে হাতে বেশ গরম বোধ হইবে (চিত্র 73)। এইক্ষেত্রে পাতের যে প্রান্ত আগুনের সংস্পর্শে থাকে প্রথমে সেই প্রান্তের কণাগুলি তাপ গ্রহণ করিয়া উত্তপ্ত হইবে। এই উত্তপ্ত কণাগুলি পার্শ্ববর্তী ঠাণ্ডা কণাকে সেই তাপ প্রদান করে, অথচ নিজে স্থান ত্যাগ করে না। এইরূপে উত্তাপ কণা হইতে কণাতে সঞ্চারিত হইয়া অবশেষে অন্য প্রান্তে পৌছায় এবং সম্পূর্ণ পাতটি উষ্ণ হইয়া উঠে। সুতরাং যে পদ্ধতিতে তাপ পদার্থের মধ্য দিয়া উষ্ণতর অংশ হইতে শীতলতর অংশে সঞ্চারিত হয় অথচ ইহার জন্য পদার্থের কণাগুলির কোন স্থান পরিবর্তন হয় না, তাহাকে **পরিবহণ** বলে। তাপ পরিবহণের জন্য কোন জড় মাধ্যমের প্রয়োজন। কঠিন জড় মাধ্যমের অণুগুলি সুদৃঢ় বলিয়া পরিবহণ বেশী হয়; পারদ ব্যতীত তরলে তদপেক্ষা কম, গ্যাসে অত্যন্ত কম হইয়া থাকে।

তাপের পরিচলন (Convection of heat):—যে প্রণালীতে পদার্থের

উত্তপ্ত কণাগুলি নিজেরাই উষ্ণতর অংশ হইতে শীতলতর অংশে গমন করিয়া তাপ লইয়া যায় তাহাকে **পরিচলন** বলে। তাপ তরল ও গ্যাসীয় পদার্থে সাধারণতঃ এই উপায়ে সঞ্চারিত হয়।



চিত্র 74
তাপের পরিচলন

তরল পদার্থে তাপ পরিচলনের পরীক্ষা:—একটি কাঁচের ফ্লাস্কে (চিত্র 74) খানিকটা জল লইয়া উহার ভিতর পটাসিয়াম পারম্যাঙ্গানেটের দু'একটি দানা ফেলিয়া দেওয়া হয়। ইহার পর ফ্লাস্কটিকে বার্ণারের মৃদু শিখায় গরম করা হইতে থাকে। জল তাপের কু-পরিবাহী এবং ইহার অণুগুলি সুদৃঢ় নয় বলিয়া পরিবহণ পদ্ধতিতে তাপ সঞ্চারিত হয় না অথচ জল উত্তপ্ত হইয়া উঠে। দেখা যাইবে যে নীচের লাল জল উত্তপ্ত হইয়া হাল্‌কা হইবে এবং উপরের দিকে উঠিবে এবং উপরের ঠাণ্ডা ও ভারী জল ফ্লাস্কের গা বহিয়া নীচের দিকে আসিবে। এইভাবে দুইটি জলস্রোতের সৃষ্টি হইবে। কিছুক্ষণ পরে সমস্ত জল সমানভাবে উত্তপ্ত হইয়া পড়িবে। এই স্রোতকে **পরিচলন স্রোত** (convection current) বলে। পরিচলনের ক্ষেত্রে উত্তপ্ত জলের কণাগুলি নীচে হইতে উপরে উঠিয়া তাপ সঞ্চালন করে।

তাপের বিকিরণ (Radiation of heat):—যে প্রণালীতে কোন জড় মাধ্যমের (material medium) সাহায্য না লইয়া ও জড় মাধ্যম থাকিলে তাহাকে উত্তপ্ত না করিয়া তাপ একস্থান হইতে অন্য স্থানে সঞ্চারিত হয় তাহাকে **বিকিরণ** বলে।

একটি জ্বলন্ত উনুনের পার্শ্বে দাঁড়াইলে আমরা গরম অনুভব করি। সূর্য হইতে যে প্রচণ্ড উত্তাপ চারিদিকে বিকীর্ণ হইতেছে তাহার খানিকটা পৃথিবীতে আসিয়া পৌছায়। এই সমস্ত ক্ষেত্রেই তাপ বিকিরণ-পদ্ধতিতে একস্থান হইতে অন্যস্থানে পৌছাইতেছে। উনুনের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া যে তাপ অনুভব করি তাহা নিশ্চয়ই পরিচলন দ্বারা হইতে পারে না, কেননা পরিচলনের ফলে উত্তপ্ত বায়ু হাল্কা হইয়া উপরে উঠিবে এবং পার্শ্ববর্তী ঠাণ্ডা বায়ু উনুনের দিকে যাইবে। সুতরাং গরমের পরিবর্তে আমাদের ঠাণ্ডা লাগাই উচিত। আবার পরিবহণ দ্বারা

এই ক্ষেত্রে তাপ স্থানান্তর হইতে পারে না, কেননা বায়ুর পরিবহণ-ক্ষমতা খুব কম। সূর্য ও পৃথিবীর মধ্যবর্তী সকল স্থানেই পদার্থ নাই ; শূন্য স্থানও আছে। সুতরাং এইরূপ ক্ষেত্রে সূর্যতাপ নিশ্চয়ই পরিবহণ বা পরিচলন পদ্ধতির দ্বারা আসিতে পারে না, কেননা উভয় ক্ষেত্রেই জড় মাধ্যমের প্রয়োজন।

তিন পদ্ধতির প্রভেদ

পরিবহণ	পরিচলন	বিকিরণ
(1) তাপপ্রবাহের জন্য কোন জড় মাধ্যমের প্রয়োজন।	(1) তাপপ্রবাহের জন্য কোন জড় মাধ্যমের প্রয়োজন।	(1) তাপপ্রবাহের জন্য কোন মাধ্যমের প্রয়োজন হয় না।
(2) তাপপ্রবাহ মাধ্যমকে উত্তপ্ত করে।	(2) তাপপ্রবাহ মাধ্যমকে উত্তপ্ত করে।	(2) তাপপ্রবাহ মাধ্যমকে উত্তপ্ত করে না।
(3) তাপপ্রবাহ খুব মন্থর গতিতে চলে।	(3) তাপপ্রবাহ খুব মন্থর গতিতে চলে।	(3) তাপপ্রবাহ অতি দ্রুত গতিতে চলে। তাপ-প্রবাহের বেগ আলোর বেগের সমান।
(4) তাপপ্রবাহে মাধ্যমের অণুগুলি স্থানচ্যুত না করিয়া তাপ উষ্ণতর অংশ হইতে অপেক্ষাকৃত শীতল অংশে সঞ্চারিত হয়।	(4) তাপপ্রবাহে মাধ্যমের অণুগুলি স্থানচ্যুত হইয়া উষ্ণতর অংশ হইতে শীতলতর অংশে পরি-চালিত হয়।	(4) তাপপ্রবাহ তরঙ্গ-গতিতে চলে। উত্তপ্ত বস্তু হইতে বিকীর্ণ উত্তপ্ত রশ্মি যে কোন বস্তুতে বাধা পায় তাহাকেই উত্তপ্ত করে।
(5) তাপপ্রবাহ বক্রপথে চলাচল করিতে পারে।	(5) তাপপ্রবাহ বক্রপথে চলাচল করিতে পারে।	(5) তাপপ্রবাহ সরল-রেখায় সকল দিকে চলাচল করে।

79. সু-পরিবাহী ও কু-পরিবাহী (Good and Bad Conductors of Heat) :—

সকল কঠিন পদার্থের তাপ পরিবহণ করিবার শক্তি এক নয়। কোন পদার্থের তাপ পরিবহণের গুণকে ঐ পদার্থের **পরিবাহিতা** (Conductivity) বলে।

যে সকল পদার্থের মধ্য দিয়া তাপের পরিবহণ হয় তাহাদের তাপ-পরিবাহী (Conductor of heat) বলে। যে সমস্ত পদার্থ খুব সহজে তাপ পরিবহণ করিতে পারে তাহাদের **সু-পরিবাহী** বলে। ধাতু পদার্থসকল যেমন—লোহা, রূপা, তামা, সোনা প্রভৃতি তাপের সু-পরিবাহী। যে সকল পদার্থ সহজে তাপ পরিবহণ করে না তাহাদের **কু-পরিবাহী** বলে। যেমন, কাঠ, কাঁচ, কাগজ, পশম, কর্ক, ফেল্ট প্রভৃতি কু-পরিবাহী।

80. তাপবহনের কয়েকটি দৃষ্টান্ত (Practical illustration of Conduction of heat):—

(i) শীতকালে আমরা যে গরম পোশাক ব্যবহার করি তাহা আসলে অন্যান্য পোশাক অপেক্ষা বেশী গরম নহে। উহাদের তাপমাত্রা সমান। পশমের তাপ-পরিবহণ ক্ষমতা কম। পশমের ফাঁকে ফাঁকে বায়ুপূর্ণ থাকে। বায়ু তাপের কু-পরিবাহী। সুতরাং পশমের পোশাক পরিধান করিলে শরীরের তাপ বস্ত্রের মধ্য দিয়া পরিবাহিত হইয়া বাহিরে আসিতে পারে না; ফলে শরীর গরম থাকে। কিন্তু সূতী বস্ত্রের আঁশগুলি আলগাভাবে থাকে না অর্থাৎ ইহাদের মধ্যে ফাঁক থাকে না বলিয়া ইহাদের ভিতর বায়ুস্তরও থাকিতে পারে না। এই কারণে সূতীবস্ত্র কম তাপ-নিবারক। সুতরাং গ্রীষ্মকালে সূতীবস্ত্র পরিলে আরাম বোধ হয়।

(ii) বরফের টুকরাকে সাধারণতঃ কাঠের গুঁড়া দিয়া ঢাকিয়া রাখা হয়। সেইজন্য বরফ ঐ অবস্থায় না গলিয়া অনেকক্ষণ কঠিন থাকে। ইহার কারণ এই যে কাঠের গুঁড়া তাপের কু-পরিবাহী, এবং গুঁড়ার ফাঁকে ফাঁকে বায়ুও থাকে। বায়ুও তাপের কু-পরিবাহী। সেইজন্য বাহির হইতে তাপ গুঁড়া ভেদ করিয়া সহজে বরফ পর্যন্ত পৌঁছিতে পারে না, ফলে বরফও গলে না।

(iii) কেটলির হাতলে বেত জড়ানো থাকে। ফুটন্ত জলপূর্ণ কেটলি ঐ হাতল দ্বারা ধরিলে বেশী গরম লাগে না, কেননা বেত তাপের কু-পরিবাহী।

81. তাপ পরিচলন প্রক্রিয়া (Practical application of convection of heat):—

ঘরে বায়ু চলাচল (Ventilation):—বায়ুর পরিচলন স্রোত (Convection current) সৃষ্টির ফলে ঘরে বায়ু চলাচল প্রক্রিয়া সম্ভবপর হয়। এই বায়ু চলাচল ঠিক রাখিবার জন্য ঘরের মধ্যে ঘুলঘুলি রাখা হয় অর্থাৎ দুইটি পথের প্রয়োজন হয়। একটি পথ দিয়া শীতল বায়ু ঘরে প্রবেশ করিয়া অন্য

পথে গরম হাল্‌কা বায়ু ঘর হইতে বাহির হইয়া যায়। ঘরে বেশী লোক থাকিলে তাহাদের শ্বাসপ্রশ্বাসের জন্য বা আগুন জ্বালিয়া রাখিলে তাহার জন্য ঘরের বায়ু গরম ও হাল্‌কা হয়। ঘরের বায়ুর অক্সিজেন নিঃশেষিত হইয়া কার্বন ডাইঅক্সাইডের পরিমাণ বাড়িয়া যাওয়ার ফলে বায়ু দূষিত হইয়া পড়ে। এই দূষিত ও উত্তপ্ত হাল্‌কা বায়ু উপরে উঠিয়া ঘুলঘুলি দিয়া বাহির হইয়া যায়। ঘরের শূন্যস্থান পূরণ করিবার জন্য বাহির হইতে ঠাণ্ডা ও পরিষ্কার ভারী বায়ু ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে, ইহাতে ঘরের বায়ু বিশুদ্ধ থাকে।

বায়ু-পরিচলনের জন্য প্রকৃতিতে মৌসুমী বায়ু, বাণিজ্য বায়ু প্রভৃতি নানাপ্রকারের বায়ু-প্রবাহ সৃষ্টি হয়। এই বায়ু-পরিচলন স্রোতের জন্যই স্থলবায়ু ও সমুদ্রবায়ুর সৃষ্টি হয়। এই বিষয় পূর্বেই আলোচনা করা হইয়াছে।

প্রশ্নাবলী

1, তাপ-সঞ্চালনের বিভিন্ন পদ্ধতি কি? ইহাদের উদাহরণ সংযোগে বুঝাইয়া দাও। ইহাদের মধ্যে পার্থক্য কি?

2. তাপ-পরিবহণ কাহাকে বলে? পরিবাহিতা কাহাকে বলে? বিভিন্ন পদার্থের পরিবাহিতা কি বিভিন্ন?

3. তাপ পরিবহণ ও পরিচলনের কয়েকটি দৃষ্টান্ত দাও।

4. তাপের সু-পরিবাহী ও কু-পরিবাহী বলিতে কি বুঝা যায়? তাপের সু-পরিবাহী ও কু-পরিবাহীর কয়েকটি উদাহরণ দাও।

5. শূন্যস্থান পূরণ কর :—

(i) কঠিন পদার্থ যে পদ্ধতিতে উত্তপ্ত হয় তাহাকে—বলা হয়।

(ii) যে-প্রণালীতে কোন দ্রব্যের — অংশ হইতে শীতলতর অংশে — গমন করে অথচ ইহার জন্য দ্রব্যের — গুলির কোন স্থান পরিবর্তন হয় না, তাহাকে — বলা হয়।

(iii) কোন কঠিন পদার্থে তাপ দ্রুত প্রবাহিত হইতে হইলে উহার — গুণ থাকা প্রয়োজন।

(iv) পরিবহণ বা পরিচলন খুব — পদ্ধতি কিন্তু বিকিরণ অতিশয় — পদ্ধতি।

6. বিজ্ঞান-সম্মত ব্যাখ্যা কর :—

(i) শীতকালে পশমের পোশাক পরিলে শরীর গরম থাকে কেন?

(ii) কেট্‌লির হাতলে বেত জড়ানো থাকে কেন?

পঞ্চদশ অধ্যায়

রসায়ন (Chemistry)

অ্যাসিড, ক্ষারক ও লবণ

(Acids, Bases and Salts)

1. অজৈব যৌগিক পদার্থকে কয়েকটি সহধর্মী শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। এরূপ তিনটি প্রধান শ্রেণী—**অ্যাসিড, ক্ষারক ও লবণ**। রাসায়নিক ক্রিয়া বুঝিতে হইলে এইগুলির ধর্ম সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান থাকা প্রয়োজন।

অ্যাসিড (Acid)—অ্যাসিড একটি যৌগিক পদার্থ। ইহার অর্থ **অম্ল**। অম্লস্বাদের প্রত্যেক পদার্থেই অ্যাসিড আছে। তেঁতুল, দই ইত্যাদিতে অ্যাসিড পাওয়া যায় অর্থাৎ অ্যাসিড মাত্রই স্বাদে অম্ল। অ্যাসিডের অপর বৈশিষ্ট্য হইতেছে, উহার প্রত্যেক অণুতে হাইড্রোজেন আছে, যাহা ধাতু বা ধাতুর অনুরূপ ব্যবহারকারী যৌগমূলক (যেমন, অ্যামোনিযাম) দ্বারা অপসারণ করা যায়।

অ্যাসিডগুলির মধ্যে হাইক্লোরিক অ্যাসিড (HCl), সালফিউরিক অ্যাসিড (H_2SO_4), নাইট্রিক অ্যাসিড (HNO_3) খুব পরিচিত। এইগুলিকে **অজৈব** বা **খনিজ** (mineral) **অ্যাসিড** বলে। সাইট্রিক অ্যাসিড (লেবুতে), ল্যাকটিক অ্যাসিড (দইতে), টারটারিক অ্যাসিড (তেঁতুলে), ফর্মিক অ্যাসিড (পিপীলিকা, মৌমাছি ও বোলতার হুলে) প্রভৃতিকে **জৈব অ্যাসিড** বলে।

হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডে ম্যাগনেসিয়াম ধাতু দিলে হাইড্রোজেন গ্যাস উত্থিত হয়। সালফিউরিক অ্যাসিডে জিঙ্ক ধাতু দিলেও হাইড্রোজেন গ্যাস হয়।

অ্যাসিড জলে দ্রবণীয়, ইহার দ্রবণের সংস্পর্শে নীল লিটমাস লাল হয়।

ক্ষারক (Bases)—সাধারণতঃ ধাতুর অক্সাইড ও হাইড্রকসাইডগুলিকে **ক্ষারক** বলে। যথা, সোডা, চুন ইত্যাদি।

ইহারা অ্যাসিডের সহিত ক্রিয়া করিয়া লবণ ও জল উৎপন্ন করে। যথা, ম্যাগনেসিয়াম অক্সাইড ও হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড ক্রিয়া করিয়া ম্যাগনেসিয়াম ক্লোরাইড (লবণ) ও জল উৎপন্ন করে। $Mgo+2Hcl=Mgcl_2+H_2O$. ক্যালসিয়াম হাইড্রক্সাইড ও সালফিউরিক অ্যাসিড ক্রিয়া করিয়া ক্যালসিয়াম সালফেট (লবণ) ও জল উৎপন্ন করে। $Ca(OH)_2+H_2SO_4=CaSO_4+2H_2O$.

অ্যামোনিয়া, ফসফিন প্রভৃতি কতকগুলি পদার্থ অক্সাইড বা হাইড্রক্সাইড না হইয়াও ক্ষারক। ইহারা অ্যাসিডের সহিত ক্রিয়া করিয়া শুধু লবণ উৎপন্ন করে। অ্যামোনিয়া হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের সহিত ক্রিয়া করিয়া কেবলমাত্র এ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড করে। $NH_3+Hcl=NH_4cl$.

ক্ষার (Alkali)—যে সকল ধাতব হাইড্রক্সাইড জলে দ্রবণীয় তাহাদের ক্ষার বলে। যথা :—সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড (NaoH), পটাসিয়াম হাইড্রক্সাইড (KOH) ইত্যাদি। অ্যালুমিনিয়াম হাইড্রক্সাইড $Al(OH)_3$ জলে দ্রবণীয় নয় বলিয়া ক্ষার নয়। ইহা ক্ষারক।

লবণ (Salt)—কোন ধাতু বা ধাতুর ন্যায় ব্যহারকারী মূলক (যেমন অ্যামোনিয়াম) (NH_4) দ্বারা অ্যাসিডের হাইড্রোজেন প্রতিস্থাপিত হইয়া যে পদার্থের সৃষ্টি হয় তাহাই লবণ।

সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড ও হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড মিলিয়া সোডিয়াম ক্লোরাইড ও জল উৎপন্ন হয়। $NaoH+Hcl=Nacl+H_2O$. ইহা সোডিয়াম ক্লোরাইড লবণ। এই জাতীয় সমস্ত পদার্থকেই লবণ বলে। খাদ্য লবণ এই সোডিয়াম ক্লোরাইড।

প্রশ্নাবলী

1. অ্যাসিড ও ক্ষারক বলিতে কি বুঝ? জৈব ও অজৈব অ্যাসিডের এবং ক্ষারকের দুইটি করিয়া উদাহরণ দাও। একটি দ্রবণ ক্ষার কি অ্যাসিড তাহা কি প্রকারে নির্ণয় করিবে?

2. লবণ কাহাকে বলে? কয়েকটি লবণের উদাহরণ দাও।

3. নিম্নলিখিত দ্রব্যে কি অ্যাসিড আছে?—
   দই, তেঁতুল, লেবু, পিপীলিকার হুল।

4. নির্ভুল উক্তিগুলির পাশে '✓' চিহ্ন দাও :—
   (i) অ্যাসিড লাল লিটমাসকে নীল করে।
   (ii) ক্ষার নীল লিটমাসকে লাল করে।
   (iii) যে সব ক্ষারক জলে দ্রবণীয় তাহাদিগকে ক্ষার বলে।
   (iv) অ্যাসিড ও ক্ষার ক্রিয়া করিলে লবণ হয়।

ষোড়শ অধ্যায়

ব্যবহার্য কয়েকটি সাধারণ লবণ ; তাহাদের উপাদান ও প্রধান ব্যবহার

2. সাধারণ লবণ ও তাহাদের ব্যবহার ঃ

সাধারণ লবণ (Common Salt, NaCl)—ইহা সোডিয়াম ও ক্লোরিনের যৌগ। সোডিয়ামের পরমাণু ও ক্লোরিনের পরমাণুর রাসায়নিক সংযোগে লবণের অণু তৈয়ারী হয়। ইহার রাসায়নিক সঙ্কেত NaCl। ইহা প্রধানতঃ সমুদ্রজল হইতে পাওয়া যায়। উহার সহিত ম্যাগনেসিয়াম ক্লোরাইড, ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড মিশ্রিত থাকিলে উহা জলীয় বাষ্প শোষণ করে।

ব্যবহার—লবণ আমাদের নিত্য ব্যবহার্য খাদ্যসামগ্রী। ইহা মাছ, মাংস ও অন্যান্য খাদ্যসামগ্রী সংরক্ষণ করিতে প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। উহা দ্বারা জীবাণুর আক্রমণ প্রতিরোধ করা যায়। শিল্পে ইহার প্রয়োগ অপরিহার্য। কষ্টিক সোডা, সোডা, হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড, ক্লোরিন প্রভৃতি প্রস্তুত করিতে ইহা ব্যবহৃত হয়।

সোডিয়াম কার্বনেট (Na_2CO_3)—ইহা কার্বনিক অ্যাসিড হইতে উৎপন্ন যৌগ। ইহা সোডিয়াম, কার্বন ও অক্সিজেনের যৌগিক পদার্থ। ইহার রাসায়নিক সংকেত Na_2CO_3। আমাদের দেশে যাহাকে সাজিমাটি বলা হয় তাহা সোডিয়াম কার্বনেট ও অন্য পদার্থের মিশ্রণ। গাছপালা পোড়াইয়া ছাই হইতে প্রাচীন কালে ইহা তৈয়ারী হইত। বর্তমানে ইহা কয়েকটি বিশেষ পদ্ধতিতে (Solvay process, Leblanc process) উৎপাদন করা হয়।

ব্যবহার—জামা কাপড় কাচিবার জন্য, খর জলকে মৃদু করিবার জন্য ইহা প্রয়োজন হয়। তাহা ছাড়া সাবান, কাঁচ, কষ্টিক সোডা প্রস্তুত করিতেও ইহা ব্যবহার করা হয়।

কষ্টিক সোডা (Caustic Soda, NaOH)—ইহা সোডিয়াম (একটি পরমাণু), হাইড্রোজেন (একটি পরমাণু) ও অক্সিজেনের (একটি পরমাণু) একটি যৌগিক পদার্থ। ইহা লবণ নহে, ইহা একটি তীব্র ক্ষার। ইহার রাসায়নিক সংকেত NaOH। ইহা সোডিয়াম কার্বনেট ও কলিচুন মিশাইয়া, ঐ মিশ্রণকে উত্তপ্ত করিয়া উৎপন্ন হয়। অদ্রাব্য ক্যালসিয়াম কার্বনেট তলায় থিতাইয়া পড়ে এবং উপর হইতে কষ্টিক সোডা দ্রবণকে ঢালিয়া লইয়া বিশুদ্ধ করিলেই কষ্টিক সোডা পাওয়া যায়।

সাধারণ লবণের তড়িৎ-বিশ্লেষণ করিয়া সোডিয়াম পাওয়া যায়। সোডিয়াম জলের সহিত রাসায়নিক ক্রিয়া করিয়া কষ্টিক সোডা উৎপন্ন করে। $2Na+2H_2O=2NaOH+2H_2$.

ব্যবহার—সাবান প্রস্তুত করিতে, কাগজ, কৃত্রিম রেশম ও রঙ উৎপাদনে ইহা ব্যবহৃত হয়।

হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড (HCl)—ইহা হাইড্রোজেন (একটি পরমাণু) ও ক্লোরিনের (একটি পরমাণু) যৌগ। ইহার রাসায়নিক সংকেত HCl। সাধারণ লবণের সহিত ঘন সালফিউরিক অ্যাসিড মিশাইয়া ইহা তৈয়ারী হয়। $2NaCl+H_2SO_4=2HCl+Na_2SO_4$

ব্যবহার—শিল্প-জগতে সালফিউরিক অ্যাসিডের পরই ইহার গুরুত্ব বেশী। ইহা রঙ ও ঔষধ, ধাতুর ক্লোরাইড, গ্লুকোজ, সিরাপ ইত্যাদি তৈয়ারী করার জন্য ব্যবহৃত হয়।

প্রশ্নাবলী

1. নিম্নলিখিত লবণগুলির প্রস্তুত-প্রণালী ও ব্যবহার সম্বন্ধে যাহা জান লিখ:
   (i) সাধারণ লবণ; (ii) সোডিয়াম কার্বনেট; (iii) কষ্টিক সোডা। উহাদের রাসায়নিক সংকেত লিখ।

2. অ্যাসিড কাহাকে বলে? হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের রাসায়নিক সংকেত লিখ। এই অ্যাসিডের ব্যবহার উল্লেখ কর।

সপ্তদশ অধ্যায়

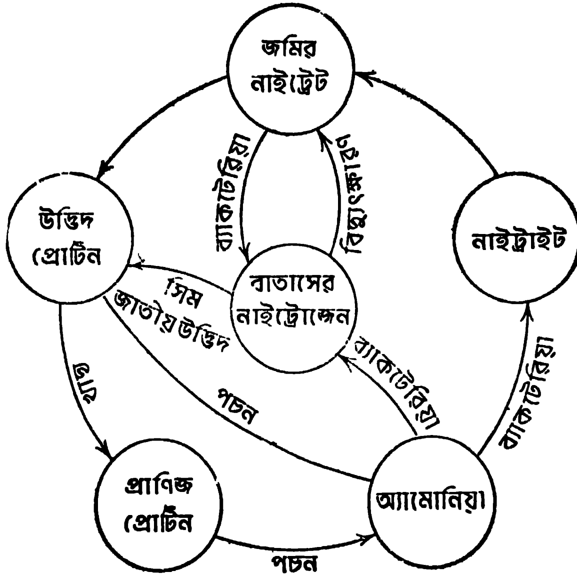
নাইট্রোজেন ও উহার যৌগ (Nitrogen and its Compound)

3. **নাইট্রোজেন চক্র (Nitrogen Cycle):** উদ্ভিদ ও প্রাণীর দেহগঠনের জন্য প্রোটিন জাতীয় খাদ্য একান্ত প্রয়োজন। ইহার প্রধান উপাদান নাইট্রোজেন। ইহা বায়ু হইতে আসে। বায়ুতে নাইট্রোজেন থাকিলেও কোন প্রাণী বায়ু হইতে উহা গ্রহণ করিয়া দেহসাৎ করিতে পারে না। উদ্ভিদ দুই প্রকারে নাইট্রোজেন গ্রহণ করে।

(1) আকাশে বিদ্যুৎ ক্ষরণ হইলে কিছু নাইট্রোজেন ও অক্সিজেন মিলিত হইয়া প্রথমে নাইট্রোজেনের অক্সাইড হয়। এই অক্সাইড জলের সহিত মিশিয়া নাইট্রিক অ্যাসিড রূপে মাটিতে পড়ে এবং মাটির তলায় শোষিত হইয়া উহা দ্বারা বিভিন্ন নাইট্রেট লবণ সৃষ্টি করে। এইভাবে প্রতিদিন প্রায় ছয় লক্ষ মণ নাইট্রোজেন

বায়ু হইতে সরিয়া যায়। এই সকল নাইট্রেট লবণ জলের সহিত উদ্ভিদের শিকড়ের মধ্য দিয়া উদ্ভিদ-দেহে প্রবেশ করে এবং উহা হইতে উদ্ভিদ প্রোটিন জাতীয় খাদ্য তৈয়ারী করে।

(2) শিম-জাতীয় কতকগুলি উদ্ভিদের শিকড়ে এক প্রকার জীবাণু বা ব্যাকটিরিয়া থাকে। ইহারা বায়ু হইতে সরাসরি নাইট্রোজেন গ্রহণ করিয়া উদ্ভিদের খাদ্যোপযোগী করিয়া দেয়। বিনিময়ে উদ্ভিদ উহাদের কার্বোহাইড্রেট জাতীয় খাদ্য দেয়। এইভাবে পরস্পরের উপর নির্ভর করিয়া গাছ ও ব্যাকটিরিয়া নিজেদের পুষ্টিসাধন করে।



চিত্র 75

নাইট্রোজেন চক্র

প্রাণীরা উদ্ভিদ হইতে খাদ্য লইয়া নিজেদের প্রয়োজনীয় নাইট্রোজেন সংগ্রহ করে। অন্য প্রাণীর দেহ হইতেও প্রাণীরা নিজেদের প্রয়োজনীয় নাইট্রোজেন-ঘটিত খাদ্য সংগ্রহ করে। যেমন আমরা মাছ, মাংস, ডিম, দুধ হইতে আমাদের প্রোটিন সংগ্রহ করি। এইভাবে বায়ুর নাইট্রোজেন ক্রমশঃ কমিতে থাকে। কিন্তু বিপরীত কতকগুলি প্রক্রিয়ায় সর্বদা বায়ুতে নাইট্রোজেন মুক্তও হইতেছে। ফলে বায়ুমণ্ডলে নাইট্রোজেনের পরিমাণ প্রায় সমান থাকিতেছে।

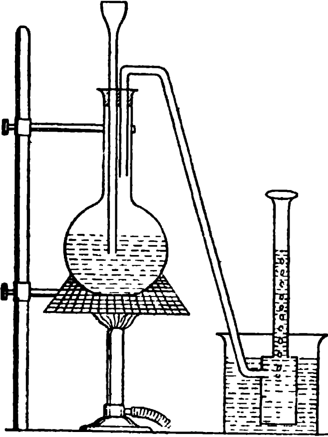
মৃত প্রাণিদেহ ও উদ্ভিদ পচিয়া বিভিন্নপ্রকারের ব্যাকটিরিয়ার সাহায্যে প্রথমে

অ্যামোনিয়া, পরে নাইট্রাইট ও নাইট্রেটে পরিণত হয়। উদ্ভিদ খাদ্যরূপে ঐগুলি গ্রহণ করে। কিন্তু বাকী অংশ হইতে অন্যপ্রকার ব্যাকটিরিয়া দ্বারা নাইট্রোজেন মুক্ত হইয়া বাতাসে মিশিয়া যায়।

এইভাবে বায়ু হইতে নাইট্রোজেন জীবজগৎ পরিভ্রমণ করিয়া আবার বায়ুতে ফিরিয়া আসে। ইহাকে **নাইট্রোজেন চক্র** (Nitrogen cycle) বলে।

4. বায়ু ও নাইট্রোজেন (Air and Nitrogen) : নাইট্রোজেন বায়ুতে মৌলিক (Element) অবস্থায় এবং নাইট্রিক অ্যাসিডে, জীব-দেহ ও অ্যামোনিয়াম যৌগে পাওয়া যায়। প্রোটিনের প্রধান উপাদান নাইট্রোজেন। ল্যাভয়সিয়র ও অন্যান্য বিজ্ঞানীরা পরীক্ষার দ্বারা প্রমাণ করিলেন যে, বায়ুতে অন্ততঃ দুইটি উপাদান আছে—একটি অক্সিজেন (Oxygen) এবং অপরটি নাইট্রোজেন (Nitrogen)। এই দুইটি ছাড়াও বায়ুতে কার্বন ডাইঅক্সাইড Co_2, জলীয় বাষ্প ও আর্গন, নিয়ন প্রভৃতি নিষ্ক্রিয় গ্যাস মিশ্রিত অবস্থায় আছে। নাইট্রোজেনের রাসায়নিক সঙ্কেত N_2।

5. নাইট্রোজেন প্রস্তুতি (Preparation of Nitrogen) : দীর্ঘনল-ফানেল ও নির্গম-নলযুক্ত একটি কাচের ফ্লাস্কে অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড (Ammonium Chloride) ও সোডিয়াম নাইট্রেটের সমপরিমাণ মিশ্রণ লইয়া অল্প জলে দ্রবীভূত করা হয় (চিত্র 76)। দীর্ঘ-নল ফানেলের নিম্নভাগ দ্রবণে ডুবাইয়া রাখা হয়। নির্গম নলের অপর প্রান্তটি একটি জলপূর্ণ পাত্রের মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দেওয়া হয়। নলের এই প্রান্তে একটি জলপূর্ণ গ্যাসজার উপুড় করিয়া রাখা হয়। দ্রবণকে বুনসেন দীপ দ্বারা ধীরে ধীরে উত্তপ্ত করা হইলেই নাইট্রোজেন উৎপন্ন হয় এবং নির্গম-নল দিয়া বাহির হইয়া গ্যাসজারে জমে। গ্যাস বাহির হইবার সঙ্গে সঙ্গে ফ্লাস্কে উত্তাপ দেওয়া বন্ধ করা হয়।



চিত্র 76
নাইট্রোজেন প্রস্তুতি



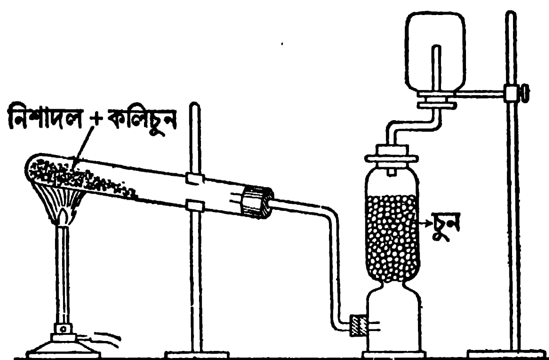
$$NH_4Cl + NaNO_2 = Nacl + N_2 + 2H_2O$$

ধর্ম ঃ—ইহা একটি স্বাদহীন, গন্ধহীন ও বর্ণহীন গ্যাস ; ইহা বায়ু অপেক্ষা সামান্য হাল্‌কা এবং জলে খুব সামান্য পরিমাণে দ্রবীভূত হয়। এই গ্যাস খুবই নিষ্ক্রিয়।

ব্যবহার (Uses) ঃ—নাইট্রোজেন অ্যামোনিয়া, নাইট্রিক অ্যাসিড, কৃত্রিম সার প্রভৃতি প্রস্তুতে ব্যবহৃত হয়। বৈদ্যুতিক বাতির ভিতরে নাইট্রোজেন ভর্তি থাকে।

6. নাইট্রোজেনের যৌগ ; সার (Fertiliser) ঃ

অ্যামোনিয়া ঃ—নাইট্রোজেন, হাইড্রোজেনের সহিত সংযুক্ত হইয়া বিভিন্ন রাসায়নিক যৌগিক পদার্থ উৎপন্ন করে ; তাহার মধ্যে অ্যামোনিয়াই অধিক গুরুত্বপূর্ণ যৌগ। অ্যামোনিয়া তিনটি হাইড্রোজেন পরমাণু ও একটি নাইট্রোজেন পরমাণুর যৌগ। ইহার সংকেত NH_3। প্রকৃতিতে, বায়ু ও জলে অতি সামান্য পরিমাণে অ্যামোনিয়া পাওয়া যায়। জৈব ও উদ্ভিদ দেহের পচনের ফলে সাধারণতঃ অ্যামোনিয়া উৎপন্ন হয়। প্রস্রাবখানায়, আস্তাবলে অ্যামোনিয়ার ঝাঁঝালো গন্ধ পাওয়া যায়।



চিত্র 77
অ্যামোনিয়া প্রস্তুত প্রণালী

প্রস্তুত প্রণালী ঃ শুষ্ক অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড বা নিশাদল (NH_4Cl) ও দ্বিগুণ পরিমাণ শুষ্ক কলি চুন [$Ca(OH)_2$] একটি খলে মিশাইয়া একটি দৃঢ় কাঁচনির্মিত টেষ্ট টিউবে রাখা হয়। টেষ্ট টিউবটিকে দণ্ডে বন্ধনীর সাহায্যে আটকান হয় (চিত্র 77)। টিউবটির সহিত যুক্ত নির্গম নলকে একটি অনার্দ্র চুন (CaO) পূর্ণ কাঁচপাত্রের নিম্নে যোগ করা হয়। এইবার টেষ্ট টিউবটিকে বুনসেন দীপ দিয়া সাবধানে গরম করা হয়। উদ্ভূত আর্দ্র অ্যামোনিয়া গ্যাস চুনের মধ্য দিয়া

অতিক্রম করে। অ্যামোনিয়া গ্যাস শুষ্ক হইয়া বায়ুর নিম্নভ্রংশ (downward displacement) দ্বারা গ্যাসজারে জমে কারণ এই গ্যাস বায়ু অপেক্ষা হাল্কা।
$2NH_4cl + Ca(OH)_2 = Cacl_2 + 2NH_3 + 2H_2O$।

অ্যামোনিয়ার ব্যবহার :—তরল অ্যামোনিয়া বরফ প্রস্তুতে ও শীতলী-করণের (refrigeration) কার্যে প্রভৃত ব্যবহৃত হয়। অ্যামোনিয়া নাইট্রিক অ্যাসিড ও সোডিয়াম কার্বনেটের শিল্প-প্রস্তুতিতে ব্যবহৃত হয়; বিভিন্ন অ্যামো-নিয়াম ঘটিত কৃত্রিম সার প্রস্তুতিতে ব্যবহৃত হয়। অ্যামোনিয়া কৃত্রিম রেশম বা রেয়ন (Rayon) প্রস্তুতিতেও ব্যবহৃত হইয়া থাকে। অ্যামোনিয়া হইতে প্রস্তুত অ্যামোনিয়াম লবণগুলিও নানা কার্যে ব্যবহৃত হয়।

অ্যামোনিয়াম সালফেট $[(NH_4)_2SO_4]$: বায়ুহীন পাত্রে কোলগ্যাস প্রস্তুত করিবার সময় খুব অল্প পরিমাণে অ্যামোনিয়া পাওয়া যায়। এই অ্যামোনিয়াকে সালফিউরিক অ্যাসিডে মিশ্রিত করিলে **অ্যামোনিয়াম সালফেট** পাওয়া যায়। উহাকে কেলাসনের দ্বারা শুদ্ধ করা হয়।

ইহা জলে অত্যন্ত দ্রবণীয়। প্রধানতঃ জমির সার হিসাবে ব্যবহৃত হয়। অন্য অ্যামোনিয়াম লবণ ও ফটকিরি তৈয়ার করিতে ইহা ব্যবহৃত হয়।

অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট (NH_4NO_3) :—অ্যামোনিয়ার সহিত লঘু নাইট্রিক অ্যাসিডের ক্রিয়ায় অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট উৎপন্ন হয়। অ্যামোনিয়াম সালফেট ও সোডিয়াম নাইট্রেটের ক্রিয়ায় অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট উৎপন্ন হয়।

ইহা জলে অত্যন্ত দ্রবণীয়। ইহা সার হিসাবে প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। বিস্ফোরক প্রস্তুতিতে, হিম মিশ্র প্রস্তুতিতে (Freezing mixture) ইহার ব্যবহার হয়।

7. শিমজাতীয় গাছ (Leguminous plant) : নাইট্রোজেন চক্র আলোচনার সময় গাছেরা কেমন করিয়া নাইট্রোজেন লবণ দেহসাৎ করে তাহা বর্ণনা করা হইয়াছে। এইসময় শিমজাতীয় উদ্ভিদেরা (Leguminous Plant) ইহাদের মূলস্থ একপ্রকার ব্যাকটিরিয়া (Symbiotic bacteria) বা জীবাণু গুটির (nodules) সাহায্যে কেমন করিয়া বাতাস হইতে নাইট্রোজেন সরাসরি আত্মসাৎ করিয়া নিজ নিজ দেহে সঞ্চয় করিয়া রাখিতে পারে তাহাও আলোচনা করা হইয়াছে। ছোলা, মটর, অরহড় প্রভৃতি শিমজাতীয় উদ্ভিদের মূলে অবস্থিত জীবাণু গুটিগুলির নাইট্রোজেন জাতীয় সার তৈয়ারী করিবার ক্ষমতা আছে বলিয়াই ইহাদের ব্যবহার জমির উর্বরতা রক্ষা করার উপযোগী।

8. **পর্যায়ক্রমে চাষের ব্যবস্থা (Crop rotation) :** ধান, পাট প্রভৃতি উৎপাদনের ফলে জমিতে নাইট্রোজেন-ঘটিত লবণের অভাব হয়। এইজন্য ধান, পাট ইত্যাদি চাষের পরই সেই জমিতে শিমজাতীয় গাছপালার চাষ করিতে হয়। ফলে জমিতে নাইট্রোজেন-ঘটিত খাদ্যের পরিমাণ আবার বৃদ্ধি পায়। তখন আবার ধান, পাট ইত্যাদি চাষ করিলে উদ্ভিদের খাদ্যাভাব হয় না।

প্রশ্নাবলী

1. নাইট্রোজেন-চক্র বলিতে কি বুঝ ?

2. নাইট্রোজেনের উৎস সম্বন্ধে যাহা জান লিখ। পরীক্ষাগারে কেমন করিয়া নাইট্রোজেন গ্যাস তৈয়ারী করিবে ? এই গ্যাসের ব্যবহার সম্বন্ধে যাহা জান লিখ।

3. কয়েকটি নাইট্রোজেন যৌগের নাম উল্লেখ কর। উহাদের রাসায়নিক সংকেত নির্দেশ কর। উহাদের ব্যবহার সম্বন্ধে যাহা জান লিখ।

4. অ্যামোনিয়ার সংকেত কি ? অ্যামোনিয়ার প্রস্তুত প্রণালী বর্ণনা কর। উহার ব্যবহারগুলি উল্লেখ কর।

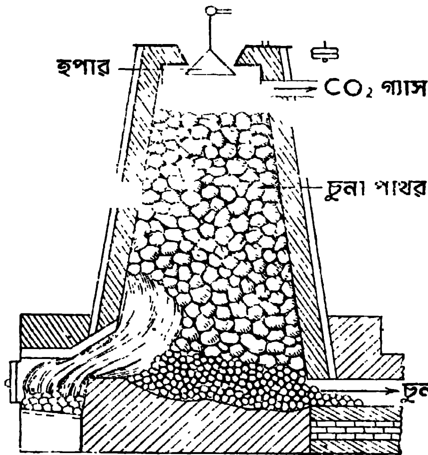
অষ্টাদশ অধ্যায়

9. চুন ও চুনজাত দ্রব্য (Lime and its products) :

চুন (Calcium Oxide)—ইহাকে **কুইক লাইম** (Quick lime) বলে। ইহার রাসায়নিক সংকেত CaO। চুন ক্ষারক, ইহা ক্যালসিয়াম ও অক্সিজেনের যৌগ। উচ্চতাপে (1000°C) ক্যালসিয়াম কার্বনেট বিয়োজিত করিয়া চুন প্রস্তুত করা হয়। খড়িমাটি (Chalk), মার্বেল (Marble), চুনাপাথর (Limestone) প্রভৃতি ক্যালসিয়াম কার্বনেট ($CaCO_3$)।

চুন প্রস্তুতি—চুন তৈয়ারী করিবার জন্য যে চুল্লী ব্যবহার হয় তাহাকে চুনের **ভাটি** (Lime-Kiln) বলে। দীর্ঘ গম্বুজের মত চুল্লীগুলি ইষ্টক দ্বারা তৈয়ারী। চুল্লীর নীচ দিয়া বায়ু প্রবেশ করে এবং কয়লা পুড়াইয়া বায়ুকে উত্তপ্ত করা হয়। ঐ উত্তপ্ত বায়ু ও কয়লার আগুনের শিখা উপরে ওঠে এবং চুল্লীর মাথায়

(Hopper) ফাঁক দিয়া চুনাপাথর চুল্লীর ভিতর ফেলা হয়। চুল্লীর ভিতর উচ্চ তাপে চুনাপাথর বিয়োজিত হইয়া চুন এবং কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস উৎপন্ন হয়। কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস চুল্লীর উপরের দিকে উঠিয়া পার্শ্বের ছিদ্রপথে বাহির হইয়া যায়। চুন নীচের নির্গম-পথ দিয়া বাহির করিয়া লওয়া হয়।



চিত্র 78
চুন প্রস্তুতি

চুনের ধর্ম—চুন সাদা কঠিন পদার্থ। তাপ প্রয়োগে সহজে গলে না। অক্সি-হাইড্রোজেন শিখায় উহা ভাস্বর হইয়া উঠে। ইহাকে Lime light বলে। চুন কার্বন ডাইঅক্সাইড ও জল শোষণ করে।

জলে চুনজাত দ্রাব্যতা খুব বেশী নয়। চুনের মধ্যে সামান্য পরিমাণ জল দিলে চুন উহাকে তৎক্ষণাৎ সোঁ সোঁ শব্দ করিয়া শোষণ করিয়া লয়। ইহার ফলে প্রচুর তাপ বাহির হয় ও চুন ফুলিয়া উঠে। উপযুক্ত পরিমাণে জল পাইলে উহা পরিশেষে সাদা শুষ্ক গুঁড়ায় পরিণত হয়। এই সাদা গুঁড়ার নাম **কলিচুন** (slaked lime)। ইহার রাসায়নিক সংকেত $Ca(OH)_2$।

কলিচুন প্রস্তুতিতে, চুনের আলো (lime light) তৈয়ারী করিতে, শোষক হিসাবে, ধাতু নিষ্কাশন কার্যে, বিগালক রূপে চুন ব্যবহৃত হয়।

কলিচুন গাঁথনির কাজে, চুনকাম করিতে, কৃষিকার্যে, চর্মশিল্পে, সিমেণ্ট, কাঁচ, কংক্রীট, ব্লীচিং পাউডার প্রভৃতি প্রস্তুতিতে ব্যবহৃত হয়।

কলিচুন জাত দ্রব্য (Lime products) : (i) **চুনের জল** (lime water) **:** অল্প কলিচুনকে অনেক জলে ভিজাইয়া রাখিলে চুনটি নীচে থিতাইয়া পড়ে এবং উপরের পরিষ্কার জলকে চুনের জল বলে। এই জল কার্বন ডাইঅক্সাইড শোষণ করিয়া **ক্যালসিয়াম কার্বনেট** গঠন করে। ইহা জলে অদ্রাব্য। কাজেই চুনের জল ঘোলাটে হয়। এই রাসায়নিক ক্রিয়ার দ্বারা কার্বন ডাইঅক্সাইডের অস্তিত্ব ধরা পড়ে।

(ii) **চুন গোলা** (Milk of lime) : অল্প জলে অতিরিক্ত কলিচুন গুলিলে দেখিতে ঠিক দুধের মত হয়। ইহাকে **চুন গোলা** বলে। সস্তা ক্ষার বলিয়া ইহা বহু শিল্পে ব্যবহার করা হয়।

চক (Chalk) : সমুদ্রের একপ্রকার ছোট ছোট প্রাণীর (Globigerina) মৃতদেহের উপরিস্থিত খোলা সমুদ্রের তলায় স্তরে স্তরে জমিতে থাকে। ভূত্বকের পরিবর্তনে ঐ স্তরের উপর অন্যান্য শিলাস্তর জমিলে, বহু সহস্র বৎসর ধরিয়া ঐ শিলাস্তরের চাপে উহা চক্ প্রস্তরে পরিণত হয়। ইহাতে ক্যালসিয়াম কার্বনেট থাকে। ভূপৃষ্ঠের আকস্মিক পরিবর্তনে সমুদ্রতল একদা উপরে উঠিয়া পড়ে এবং চকের পাহাড়ে পরিণত হয়।

দাঁতের মাজন, গায়ে মাখা পাউডার, লিখিবার খড়ি, সাদা রং, চুন প্রস্তুত করিতে চক্ ব্যবহৃত হয়

প্রশ্নাবলী

1. চুনাপাথর হইতে কি ভাবে চুন প্রস্তুত হয় বর্ণনা কর। চুন আমাদের কি কি উপকারে আসে ?

2. নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও :—

(i) চুনের জল ; (ii) চুন গোলা ; (iii) কলিচুন ; (iv) খড়ি মাটি।

3. শূন্যস্থান পূরণ কর :—

(i) চুনের জলের সহিত—মিশাইলে জল ঘোলাটে হয়।

(ii) চুন প্রস্তুত করিতে—ব্যবহার হয়।

(iii) মার্বেলের রাসায়নিক নাম—।

উনবিংশ অধ্যায়

খর জল ও মৃদু জল

(Hard water and Soft water)

10. জলকে দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। **খর জল** (hard) ও **মৃদু জল** (soft)। যে জলে অতি সহজেই সাবানের ফেনা হয় তাহাকে মৃদু জল বলে। যে জলে সহজে সাবানের ফেনা উৎপন্ন হয় না তাহাকে খর জল বলে।

খরতার কারণ (Causes of hardness)—জলের মধ্যে ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম ও আয়রন ধাতুর বাইকার্বনেট, ক্লোরাইড ও সালফেট দ্রবীভূত অবস্থায় থাকিলে জল খর হয়। জলের খরতা দুই প্রকারের। অস্থায়ী খরতা ও স্থায়ী খরতা।

(i) অস্থায়ী খর জল (Temporary hardness of water)—জলে ক্যালসিয়াম ও ম্যাগনেসিয়ামের বাই-কার্বনেট দ্রবীভূত থাকিলে তাহাকে **অস্থায়ী খর জল** বলে। এই জলকে ফুটাইলে বা প্রয়োজন মত চুন বা কলিচুন মিশাইলে দ্রাব্য বাই-কার্বনেট অদ্রাব্য কার্বনেটে পরিণত হইয়া তলায় থিতাইয়া পড়ে এবং জলের খরতা দূর হয় অর্থাৎ জল মৃদু হয়।

(ii) স্থায়ী খর জল (Permanent hardness of water)—জলে ক্যালসিয়াম ও ম্যাগনেসিয়াম ধাতুর ক্লোরাইড ও সালফেট দ্রবীভূত থাকিলে তাহাকে **স্থায়ী খর জল** বলে। এই জলকে ফুটাইলে বা প্রয়োজন মত চুন বা কলিচুন মিশাইলে খরতা দূর হয় না। এইরূপ জলের খরতা দুই উপায়ে দূর করা যায়।

(1) সোডা প্রণালী (Soda process) : স্থায়ী খর জলের সহিত সোডা বা সোডিয়াম কার্বনেট মিশাইলে উহার মধ্যে দ্রাব্য ক্লোরাইড বা সালফেট অদ্রাব্য কার্বনেটে পরিণত হয় এবং তলায় থিতাইয়া পড়ে। এই ভাবে খরতা দূর হয়।

(2) পারমুটিট প্রণালী (Permutit process) : জলের অস্থায়ী এবং স্থায়ী খরতা দূর করিবার ইহা একটি খুবই কার্যকারী আধুনিক পদ্ধতি: সোডিয়াম, অ্যালুমিনিয়াম প্রভৃতি ধাতুর সিলিকেটের মিশ্রণে গঠিত জিয়োলাইট (Zeolite) নামক কতকগুলি প্রাকৃতিক খনিজ পদার্থের মত কৃত্রিম উপায়ে একপ্রকার সোডিয়াম অ্যালুমিনিয়াম সিলিকেট তৈয়ারি করা হইয়াছে। ইহাকেই 'পারমুটিট' নামে অভিহিত করা হয়। পারমুটিট প্রণালীতে এই পারমুটিট নামক পদার্থের ভিতর দিয়া

খরজল পরিচালিত করিলে ক্যালসিয়াম এবং ম্যাগনেসিয়ামের লবণগুলি (যাহা জলে দ্রবীভূত অবস্থায় থাকে) পারমুটিটের সহিত বিক্রিয়ায় অদ্রবণীয় ক্যালসিয়াম এবং ম্যাগনেসিয়াম পারমুটিট গঠন করে। পরিস্রুত জল মৃদুজল।

খর জলের কতকগুলি অসুবিধা আছে। কাপড় কাচিলে সাবান বেশী খরচ হয়। কেট্‌লি বা বয়লারের গায়ে শক্ত আঁশের মত (Boilerscale) স্তর পড়ে। ফলে উহার তাপ পরিবহণ ক্ষমতা কমিয়া যায়। জলকে বাষ্পে পরিণত করিতে হইলে অতিরিক্ত ইন্ধনের (fuel) প্রয়োজন এবং অতিরিক্ত উত্তাপে বয়লারের ক্ষয়ক্ষতিও বেশী হইয়া থাকে। ইহা ছাড়া, তাপ প্রয়োগে বয়লার ও বয়লার স্কেলের অসমান প্রসারণ ঘটে যাহার ফলে বয়লার ফাটিয়াও যাইতে পারে।

অধিক খর জল পানীয় হিসাবেও অপকারী। খর জলে খাদ্যদ্রব্য ভাল সিদ্ধ হয় না।

এই সব অসুবিধার জন্য জলের খরতা অপসারণ করা দরকার হয়।

প্রশ্নাবলী

1. জলের খরতা কাহাকে বলে ও উহার কারণ কি? খর জলের অসুবিধা কি কি?

2. খর জল ও মৃদু জল কাহাকে বলে? জলের খরতা কি ভাবে অপসারণ করা যায়?

3. শূন্যস্থান পূরণ কর :—

(i)—নামক পদার্থের মধ্য দিয়া খর জল পরিচালনা করিলে জলের স্থায়ী ও অস্থায়ী খরতা দূর হয়।

(ii) খর জলকে ফুটাইলে জলের দ্রাব্য—অদ্রাব্য—পরিণত হয়।

(iii) জলে—লবণ থাকিলে জল খর হয়।

জীববিজ্ঞান (Biology)

বিংশ অধ্যায়

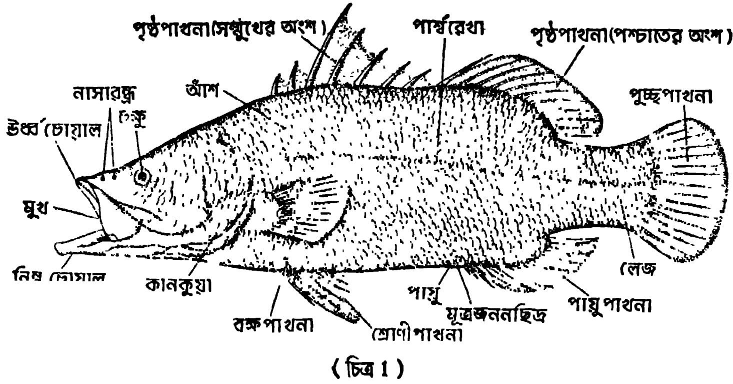
মাছ ও ব্যাঙের বহিরাকৃতি ও আভ্যন্তরিক গঠন

(ক) মাছ (Fish)

মেরুদণ্ডী প্রাণীদের মধ্যে মাছ সর্বনিম্ন স্তরের প্রাণী। ইহারা প্রাণিজগতের কর্ডাটা পর্বের মৎস্যশ্রেণীভুক্ত। মাছ সাধারণতঃ জলচর ও অনুষ্ণশোণিত। ইহাদের হৃৎপিণ্ড একটি মাত্র **অলিন্দ** (auricle) ও একটি **নিলয়** (ventricle) বিশিষ্ট। ইহাদের শরীরে সাঁতার দিবার জন্য কণ্টকবিশিষ্ট জোড় ও বিজোর **পাখ্‌না** (fin) আছে। অধিকাংশ মাছের শরীর **আঁশ** দ্বারা ঢাকা থাকে এবং পিচ্ছিল হয়। মাছের মস্তকের সম্মুখ ভাগে এক বা দুই জোড়া নাসারন্ধ্র থাকে। নাসিকার সাহায্যে ইহারা কেবল ঘ্রাণ লয়, শ্বাসকার্য করে না। ইহাদের চক্ষু পত্রহীন। ইহারা চোখ মেলিয়াই নিদ্রা যায়। শ্রবণ ইন্দ্রিয়ের অস্তিত্ব বাহির হইতে বুঝা যায় না। পারিপার্শ্বিক অবস্থা অনুভব করিবার জন্য দেহের দুই পার্শ্বে দুইটি **পার্শ্বরেখা** (lateral line) বর্তমান। ইহারা ফুল্‌কার সাহায্যে শ্বাসকার্য সম্পন্ন করে। শ্বাসকার্যের জন্য মুখ দিয়া জল লয় কিন্তু কখন পান করে না। সমস্ত শরীর দিয়া জল শোষণ করিয়া তৃষ্ণা নিবারণ করে। উচ্চ শ্রেণীর মাছের মুখের ধারে বড় বা ছোট **গোঁফ** (berbel) থাকে। ইহারা স্পর্শ ইন্দ্রিয়ের কাজ করে। শিঙি, মাগুর, কই প্রভৃতি কতকগুলি মাছকে **জিওল মাছ** বা **ক্যাট্‌ ফিস্‌** (cat fish) বলে। ইহারা সহজে মরে না। বিড়ালের ন্যায় ইহাদের মুখের সম্মুখ ভাগে বড় বড় **গোঁফ** (berbel) দেখা যায়। এই জাতীয় মাছ ফুলকার সাহায্য ছাড়াও শ্বাসকার্য সম্পন্ন করিতে পারে। সেইজন্য ইহারা স্থলেও কিছুকাল বাঁচিয়া থাকিতে পারে। মাছের মুখের উপরে ও নীচে দুইটি চোয়াল থাকে। কতকগুলি মাছ শক্ত অস্থিবিশিষ্ট যথা রুই, কাতলা, ভেটকী, কই প্রভৃতি। ইহাদের ফুল্‌কা, কানকুয়ার দ্বারা ঢাকা থাকে। আবার কতকগুলি মাছ তরুণাস্থি বিশিষ্ট যথা হাঙ্গর, কড, রে, ইত্যাদি। তরুণাস্থি বিশিষ্ট মাছেরা অধিকাংশই নোনা জলের অধিবাসী। মাছেদের মধ্যে স্ত্রী-পুরুষ ভেদ আছে। অধিকাংশ মাছই জলে ডিম পাড়ে।

ভেটকী মাছ (Bhetki fish)ঃ—ভেটকী অস্থিবিশিষ্ট ও নোনা জলের মাছ। কখনও কখনও ইহাদের মিষ্ট জলেও পাওয়া যায়। আমাদের দেশে সুন্দরবন অঞ্চলে সমুদ্রে ও চিল্‌কা হ্রদে প্রচুর ভেটকী জন্মায়। ইহা খাইতে অতি সুস্বাদু, প্রায় 1·5 মিটার লম্বা ও ওজনে প্রায় 0·75-1 কুইণ্টাল মণ পর্যন্ত ভারী হয়। শীতকালে সাধারণতঃ ভেটকী মাছ দেখিতে পাওয়া যায়।

বহিরাকৃতি—(চিত্র 1)—ইহাদের দেহ তিনটি অংশে বিভক্ত—**মস্তক** (head), **দেহকাণ্ড** (trunk) এবং **লেজ** (tail)। ইহাদের সমস্ত শরীর আঁশে ঢাকা এবং দুই পার্শ্ব হইতে চ্যাপ্টা।



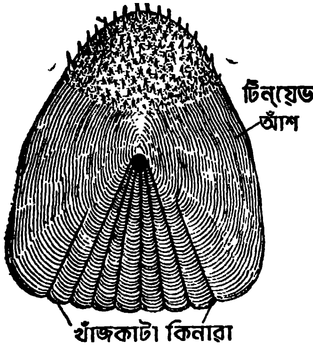
(চিত্র 1)

ভেটকী মাছের বহিরাকৃতি

মস্তক—দেহের সম্মুখ ভাগে **মুখ** অবস্থিত। মুখটি উপরের ও নীচের দুইটি **চোয়াল** দ্বারা সুরক্ষিত। কেবলমাত্র নীচের চোয়ালটি সঞ্চালিত হইতে পারে। মস্তকের উপরের দিকে দুই জোড়া নাসারন্ধ্র বর্তমান। নাসারন্ধ্রগুলি শ্বাসকার্যে সহায়তা করে না। ইহারা কেবল ঘ্রাণ লইবার জন্য। নাসারন্ধ্রের পশ্চাতে দুই পার্শ্বে দুইটি পত্রহীন **চক্ষু** আছে। মস্তকের দুই পার্শ্বে দুইটি **কানকুয়া** (operculum) আছে। ইহারা নীচের দিকে খোলা। কানকুয়া, নিম্নস্থ ফুল্‌কাকে ঢাকিয়া রাখে। মস্তকের পিছন দিকে অস্থির মধ্যে শ্রবণ-যন্ত্র আছে কিন্তু বাহির হইতে ইহাদের অস্তিত্ব বুঝা যায় না।

দেহকাণ্ড—সমস্ত দেহ **আঁশে** ঢাকা। আঁশগুলি এমনভাবে সাজান যে সামনের আঁশটি পিছনের আঁশকে কিছু পরিমাণে ঢাকিয়া রাখে। **আঁশগুলির** কিনারা ছোট ছোট খাঁজ কাটা। এই প্রকার আঁশকে **টিনয়েড আঁশ** (ctenoid

scale) বলে (চিত্র 2)। রুই, কাতলা প্রভৃতি মাছে আঁশের কিনারায় খাঁজ নাই (cycloid scale)। দেহকাণ্ডের পিঠের দিকের বর্ণ কাল্‌চে এবং পেটের দিক সাদা। কানকুয়ার পিছন হইতে লেজ পর্যন্ত দেহের দুই পার্শ্বে দুইটি রেখা বর্তমান। ইহাদিগকে **পার্শ্বরেখা** (lateral lines) বলে। ভেটকীর হাত পা নাই কিন্তু সাঁতার দিবার জন্য ইহাদের শরীরে কতকগুলি জোড় ও বিজোড় **পাখ্‌না** (fins) আছে। পাখ্‌নাগুলি রশ্মি বিশিষ্ট। দেহকাণ্ডে মোট দুইটি জোড় ও একটি বিজোড় পাখ্‌না আছে। কানকুয়ার ঠিক পিছনে দেহকাণ্ডের দুই পার্শ্বে দুইটি পাখ্‌না আছে। ইহাদিগকে **বক্ষপাখ্‌না** (pectoral fin) বলে। বক্ষপাখ্‌না 14টি করিয়া রশ্মি বিশিষ্ট। বক্ষপাখ্‌নার কিছু পশ্চাতে পেটের দিকে আর এক জোড়া পাখ্‌না আছে। ইহাদিগকে **শ্রোণী পাখ্‌না** (pelvic fin) বলে। প্রত্যেকটি শ্রোণী পাখ্‌না একটি করিয়া কণ্টক ও চারিটি রশ্মি বিশিষ্ট। দেহকাণ্ডের পিঠের দিকে একটি বিজোড় **পৃষ্ঠ পাখ্‌না** (dorsal fin) বর্তমান। পৃষ্ঠ পাখ্‌নাটি সম্মুখ ও পশ্চাৎ এই দুই খণ্ডে বিভক্ত। সম্মুখের অংশ সাতটি শক্ত রশ্মি বিশিষ্ট। পশ্চাতের অংশে প্রায় বারটি রশ্মি আছে। উহাদের মধ্যে সম্মুখেরটি সর্বাপেক্ষা বড়। দেহকাণ্ড ও লেজের সংযোগস্থলে পেটের দিকে **পায়ুছিদ্র** অবস্থিত। পায়ুছিদ্রের পশ্চাতে একটি **মূত্র-নিঃসরণ ছিদ্র** (urinary apperture) ও দুইটি **জনন ছিদ্র** (genital apperture) আছে।

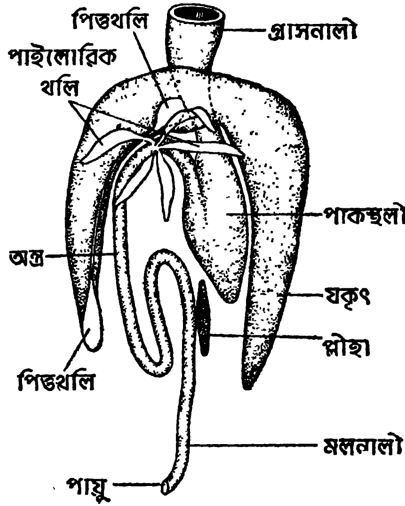


(চিত্র 2)
ভেটকী মাছের আঁশ

লেজ—পায়ুছিদ্রের পশ্চাৎ দিকে দেহের বাকী অংশের নাম **লেজ** (tail)। লেজটি চ্যাপ্টা, মাংসল এবং পশ্চাৎ দেশে একটি বিজোড় পাখ্‌না বিশিষ্ট। এই পাখনাটিকে **পুচ্ছপাখ্‌না** (caudal fin) বলে। ইহা মোটামুটি গোলাকার ও উনিশটি রশ্মি বিশিষ্ট। পুচ্ছপাখ্‌না মাছের সন্তরণের সময় হালের কাজ করে। পায়ুর পশ্চাদ্দেশে প্রায় এগারটি রশ্মি বিশিষ্ট আর একটি বিজোড় পাখ্‌না আছে। ইহাকে **পায়ুপাখ্‌না** (anal fin) বলে। এই পাখ্‌নার সম্মুখভাগ তিনটি কণ্টকবিশিষ্ট।

পুষ্টিতন্ত্র (Alimentary System) (চিত্র 3)—ভেটকী মাছের মুখ উপরের ও নীচের দুইটি ছোট ছোট দন্তবিশিষ্ট চোয়াল দ্বারা সুরক্ষিত। মুখছিদ্রের পরের

অংশটির নাম **মুখবিবর** (buccal cavity) ও ইহার পরের অংশটিকে **গলবিল** (pharynx) বলে। গলবিলের দুই পার্শ্বের প্রাচীরে পাঁচ জোড়া ফুল্‌কা ছিদ্র (pharyngeal slits) আছে। গলবিলের পরে সরু নালীটিকে **গ্রাসনালী** (oesophagus) বলে। গ্রাসনালী, একটি লম্বা থলীর ন্যায় **পাকস্থলীতে**



(চিত্র 3)

ভেটকীমাছের পুষ্টিতন্ত্র

(stomach) আসিয়া পড়িয়াছে। পাকস্থলীর যে স্থানে গ্রাসনালী পড়িয়াছে প্রায় সেই স্থান হইতেই **অন্ত্র** (intestine) বাহির হইয়াছে। অন্ত্র হইতে পাঁচটি অঙ্গুলাকৃতি **পাইলোরিক থলি** (pyloric caeca) বাহির হইয়াছে। অন্ত্রটি বেশী পাকানো নয়। ইহা প্রথমে নীচের দিকে নামিয়া আসিয়া পরে উপরের দিকে উঠিয়া গিয়াছে। তথা হইতে পুনরায় বাঁকিয়া নীচের দিকে আসিয়া **পায়ু** ছিদ্রে শেষ হইয়াছে। ইহাদের অন্ত্র, ক্ষুদ্রান্ত্র ও বৃহদন্ত্রে বিভক্ত নহে। পায়ুছিদ্রের নিকটস্থ অন্ত্রের শেষাংশের নাম **মলনালী** (rectum)। **যকৃৎ** (liver) একটি পরিপাক ক্রিয়ায় সাহায্যকারী গ্রন্থি। সুতরাং ইহাও মাছের পুষ্টিতন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত। ইহা বেশ লম্বা দুইটি খণ্ডযুক্ত ও ইহার রং কমলা। যকৃতের মধ্য অংশে একটি সবুজ রংএর **পিত্তথলি** (gall bladder) আছে। উহা হইতে একটি সরু নালী যকৃতের দক্ষিণ খণ্ড বাহিয়া নীচে আসিয়া ইহার শেষ প্রান্তে অপর একটি থলিতে শেষ হইয়াছে। যকৃৎ-নিঃসৃত পিত্ত, অন্ত্রের মধ্যে

পড়িয়া হজমে সাহায্য করে। মাছের সাধারণতঃ পৃথক কোন অগ্ন্যাশয় (pancreas) নাই। ইহা যকৃতের মধ্যেই ব্যাপ্ত (diffused) অবস্থায় থাকে।

প্লীহা (Spleen)ঃ ইহা পাকস্থলীর নীচের দিকে অবস্থিত একটি গ্রন্থি। ইহা পুষ্টিতন্ত্রের অংশ নহে। ইহা দেখিতে লাল এবং ইহার মধ্যে নূতন রক্তকণিকা প্রস্তুত হয়।

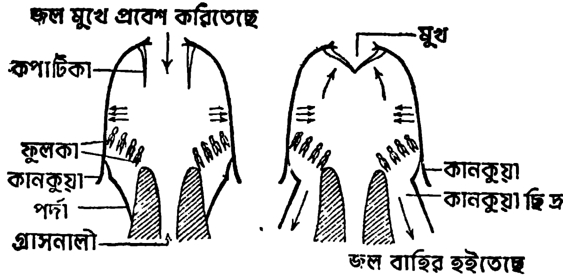
পট্কা (Swim bladder)ঃ মাছের পট্কা মাছের দেহগহ্বরের মধ্যে অবস্থিত ও দুইটি প্রকোষ্ঠবিশিষ্ট একটি লম্বা থলি। পুষ্টিতন্ত্রের সহিত ইহার কোন সম্পর্ক নাই। এই থলি বায়ুপূর্ণ থাকে। ইহার সম্মুখের অংশে একটি গ্রন্থি আছে। এই গ্রন্থি মাছের রক্ত হইতে অক্সিজেন লইয়া পট্কায় ভর্তি করিতে পারে। পিছনের প্রকোষ্ঠ হইতে এই গ্যাস পুনরায় রক্তে চলিয়া যাইতে পারে। এই ভাবে পট্কার মধ্যে বায়ুর পরিমাণ নিয়ন্ত্রিত করিয়া মাছ আপেক্ষিক গুরুত্ব কমাইয়া বা বাড়াইয়া সাবমেরিণের মত জলে ভাসিতে বা ডুবিতে পারে।

শ্বাসতন্ত্র (Respiratory System)ঃ ভেটকী মাছ জলে বাস করে। শ্বাসকার্যের জন্য ইহারা **ফুল্‌কার** (gill) সাহায্যে জলে দ্রবীভূত অক্সিজেন গ্রহণ করে এবং অঙ্গারাম্ল গ্যাস জলেই ত্যাগ করে।

ইহাদের গলবিলের প্রতি দিকে পাঁচটি করিয়া ফুলকা ছিদ্র থাকে। দুইটি ছিদ্রের মধ্যবর্তী অংশে একটি করিয়া ফুলকা থাকে। প্রত্যেকটি ফুলকায় একটি শক্ত বাঁকা অস্থির সহিত দুইটি সারিতে কতকগুলি সূত্রাকার **ফুলকাসূত্র** (gill filaments) সংযুক্ত থাকে। পাঁচ জোড়া ফুল্‌কা দুই পার্শ্বে দুইটি কানকুয়ার দ্বারা ঢাকা থাকে। এই ফুল্‌কা সূত্রগুলির মধ্যে মাছের **বহির্মুখী** (afferent) রক্তনালীগুলি কৈশিকনালীতে বিভক্ত হয়। ইহার মধ্য দিয়া দূষিতরক্ত প্রবাহকালে ঐ রক্ত অঙ্গারাম্ল গ্যাস ত্যাগ করিয়া এবং জলে দ্রবীভূত অক্সিজেন গ্যাস গ্রহণ করিয়া বিশুদ্ধ হয়। এই বিশুদ্ধ রক্ত, কৈশিকনালী হইতে **অন্তর্মুখী** (efferent) রক্তনালী মাধ্যমে দেহমধ্যে সঞ্চালিত হয় (চিত্র 6)।

শ্বাসগ্রহণ কালে মাছ, মুখের পেশীর প্রসারণের ফলে মুখবিবর এবং গলবিলকে প্রসারিত করে (চিত্র 4)। ফলে মুখছিদ্র দিয়া জল বেগে মুখবিবরে প্রবেশ করে। এই সময় কানকুয়া ছিদ্রটি বন্ধ থাকে। মুখবিবর ও গলবিল-মধ্যস্থ জল ফুল্‌কাছিদ্র দিয়া বাহিরে যাইবার কালে ফুল্‌কাস্থিত রক্তনালীগুলির সংস্পর্শে আসে। নালী-মধ্যস্থিত দূষিত রক্ত এই জল হইতে দ্রবীভূত অক্সিজেন গ্রহণ করে ও জলেই অঙ্গারাম্ল পরিত্যাগ করে। অতঃপর মুখবিবর ও গলবিলের সংকোচনের ফলে

মুখছিদ্রটি কপাটিকা দ্বারা বন্ধ হইয়া যায় (চিত্র 4)। অতিরিক্ত চাপে জল কেবল গলবিল ছিদ্র দিয়া বাহিরে আসে। এই সময়ে কানকুয়া দুইটি সামান্য ফাঁক হয় এবং এই ফাঁক দিয়া অঙ্গারাম্ল মিশ্রিত জল বাহির হইয়া যায়। এই প্রক্রিয়ায় মাছের



(চিত্র 4)

ভেটকী মাছের শ্বাসপদ্ধতির নক্সা

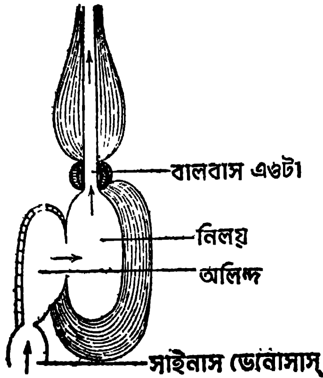
শ্বাসকার্যের জন্য অনবরত জল মুখ দিয়া প্রবেশ করে এবং কানকুয়া ছিদ্র দিয়া বাহির হইতে থাকে।

রক্ত-সঞ্চালন তন্ত্র (Circulatory System) : মাছের **রক্ত** (blood) শীতল। রক্তের সাদা তরলাংশকে **প্লাজমা** (plasma) বলে। প্লাজমাতে ভাসমান অবস্থায় লোহিত ও শ্বেত এই দুই প্রকার রক্তকণিকা আছে। দুই প্রকার কণিকাই নিউক্লিয়াসযুক্ত। শ্বেত কণিকাগুলির অনবরত আকৃতির পরিবর্তন ঘটে। লোহিত কণিকাগুলির আকার পরিবর্তিত হয় না। ইহারা দেখিতে গোলাকার এবং ইহাদের মধ্যভাগ স্ফীত। লোহিত কণিকার মধ্যে লাল রংএর হিমোগ্লোবিন থাকে।

মাছের রক্ত-সঞ্চালন তন্ত্র একটি **হৃৎপিণ্ড** (heart), কতকগুলি **শিরা** (veins), **ধমনী** (arteries), ও **কৈশিকনালী** (capillaries) লইয়া গঠিত।

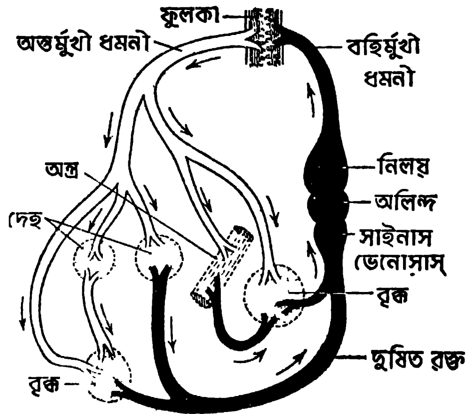
হৃৎপিণ্ড ও রক্ত-সঞ্চালন : ইহাদের হৃৎপিণ্ড দেহগহ্বরে অবস্থিত। ইহা একটি পাতলা ঝিল্লী বা **হৃদ্ধরা** (pericardium) দ্বারা আবৃত। হৃৎপিণ্ড তিনটি প্রকোষ্ঠ বিশিষ্ট (চিত্র 5)। ইহার পিছনে অর্থাৎ পিঠের দিকে একটি **সাইনাস ভেনোসাস** (siuus venosus), ইহার সম্মুখে একটি **অলিন্দ** (auricle) এবং অলিন্দের সম্মুখে একটি **নিলয়** (ventricle) আছে।

দেহের বিভিন্ন স্থান হইতে দূষিত রক্ত সাইনাস ভেনোসাসে আসে (চিত্র 6) ও তথা হইতে একটি ছিদ্রপথে উহা অলিন্দে প্রবেশ করে। অলিন্দ সংকুচিত হইলে রক্ত একটি ছিদ্র দিয়া নিলয়ে প্রবেশ করে। নিলয়ের প্রাচীর পেশীবহুল। সমস্ত



(চিত্র 5)

ভেটকী মাছের হৃৎপিণ্ডে রক্তসঞ্চালন



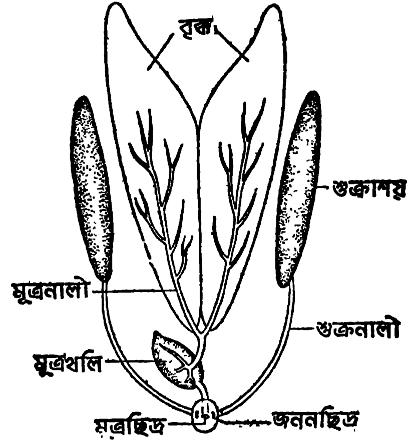
(চিত্র 6)

ভেটকী মাছের রক্তসঞ্চালন পদ্ধতির নক্সা

ছিদ্রপথগুলি কপাটিকা দ্বারা সুরক্ষিত, ফলে রক্ত কেবল একই দিকে প্রবাহিত হইতে পারে অপর দিকে যাইতে পারে না। নিলয় সংকুচিত হইলে দূষিত রক্ত একটি ধমনী মাধ্যমে কতকগুলি **বহির্মুখী** (afferent) ধমনীর মধ্য দিয়া ফুলকায় পৌছে। তথা হইতে রক্ত বিশুদ্ধ হইয়া কতকগুলি **অন্তর্মুখী** (efferent) ধমনীর মধ্য দিয়া সমস্ত শরীরে ছড়াইয়া পড়ে। শরীরের মধ্যে এই রক্ত অক্সিজেন ত্যাগ ও অঙ্গারাম্ল গ্রহণ করিয়া দূষিত হয়। দূষিত রক্ত কতকগুলি শিরার (veins) মাধ্যমে দেহের বিভিন্ন অংশ হইতে পুনরায় হৃৎপিণ্ডের সাইনাস ভেনোসাসে ফিরিয়া আসে। ইহা উল্লেখযোগ্য যে মাছের হৃৎপিণ্ডে সকল সময়েই দূষিত রক্ত থাকে এবং রক্ত বিশুদ্ধ হইবার পর পুনরায় হৃৎপিণ্ডে ফিরিয়া আসে না। রক্ত-নালীগুলি প্রথম ফুলকা ও পরে দেহকলা এই দুই স্থানে গ্যাসীয় পরিবর্তনের জন্য কৈশিক-নালীতে বিভক্ত হয় (চিত্র 6)।

রেচন ও জননতন্ত্র (Urinogenital System) : দেহগহ্বরের মধ্যে মেরুদণ্ডের নিম্নে, দুই পার্শ্বে দুইটি খুব লম্বা **বৃক্ক** (kidney) থাকে। ইহারা প্রায়

সমস্ত দেহগহ্বর জুড়িয়া বিস্তৃত। বৃক্ক দুইটি দেখিতে কালচে লাল রংয়ের। ইহারা পশ্চাদ্দেশে কিছুটা সংযুক্ত। প্রত্যেকটি বৃক্ক হইতে একটি করিয়া **মূত্রনালী** বাহির হইয়া একে অপরের সহিত সংযুক্ত হইয়াছে। এই মিলিত নালীটি একটি **মূত্রথলির** (urinary bladder) মধ্যে পড়িয়াছে। রক্ত মধ্যস্থ দূষিত জলীয় পদার্থ মূত্ররূপে নিষ্কাশিত হইয়া মূত্রথলিতে সঞ্চিত হয় এবং তথা হইতে **মূত্রছিদ্র** দিয়া বাহির হইয়া যায় (চিত্র 7)।



(চিত্র 7)
ভেটকী মাছের মূত্র নিষ্কাশন ও পুংজনন তন্ত্র

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে মাছেদের মধ্যে স্ত্রী ও পুরুষ ভেদ আছে। পূর্ণাঙ্গ পুরুষমাছে, দেহগহ্বরের মধ্যে বৃক্কের নিম্নদেশে দুইটি **শুক্রাশয়** (testis) থাকে (চিত্র 7)। প্রতিটি শুক্রাশয়ের পশ্চাদ্দেশ হইতে একটি করিয়া **শুক্রনালী** (vas defereus) বাহির হইয়া মূত্রছিদ্রের দুই পার্শ্বে পড়িয়াছে। শুক্রাশয় হইতে **শুক্রকীট** (sperms) বাহির হইয়া শুক্রনালীর মধ্য দিয়া নামিয়া আসে এবং **জননছিদ্রের** মধ্য দিয়া জলে নিক্ষিপ্ত হয়।

স্ত্রী-মাছে শুক্রাশয়ের স্থলে দুইটি **ডিম্বাশয়** (ovaries) থাকে। ডিম্বাশয়গুলি আকারে বেশ বড় এবং ডিম্বে পরিপূর্ণ। ডিম্বগুলি পুষ্টিলাভ করিলে ডিম্বাশয় হইতে দেহগহ্বরের মধ্যে আসে। ডিম্বাশয়ের কোন নালী নাই। মূত্রছিদ্রের দুই পার্শ্বে দুইটি জননছিদ্রের মধ্য দিয়া ডিম্বগুলি জলে নিক্ষিপ্ত হয়।

জীবনী ঃ বর্ষাকালে স্ত্রী-মাছ জলে অসংখ্য ডিম পাড়ে। বহু ডিম নানা কারণে বিনষ্ট হইয়া যায়। পুরুষ মাছও শুক্রকীটগুলি জলে নিক্ষেপ করে। একটি শুক্রকীট কর্তৃক একটি মাত্র ডিম্ব নিষিক্ত (fertilised) হয় এবং এই নিষেক জলের মধ্যেই সংঘটিত হয়। প্রায় 24 ঘণ্টার মধ্যেই নিষিক্ত ডিম্ব ফাটিয়া ছোট ছোট মাছ বাহির হয়। প্রথমদিকে ইহারা ডিম্বমধ্যস্থ সঞ্চিত খাদ্য খাইয়া বাঁচিয়া থাকে। পরে ইহারা ছোট ছোট জলজ উদ্ভিদ ও কীট খাইয়া বড় হইতে থাকে।

(খ) ব্যাঙ (Toad)

পৃথিবীর প্রায় সর্বত্রই ব্যাঙ দেখিতে পাওয়া যায়। আমাদের দেশেও কুনো ব্যাঙ, কোলা ব্যাঙ, সোনা ব্যাঙ প্রভৃতি নানা জাতীয় ব্যাঙ দেখা যায়। ব্যাঙ কর্ডাটা (chordata) পর্বের উভচর (amphibia) শ্রেণীভুক্ত জীব। ইহারা জীবিতাবস্থার কিছুকাল জলে ও কিছুকাল স্থলে অতিবাহিত করে। এই কারণে ব্যাঙকে উভচর অর্থাৎ জলচর ও স্থলচর প্রাণী বলে। মাছ ও সরীসৃপের ন্যায় ইহাদের রক্ত শীতল। বর্ষাকালে ইহারা থপ্‌থপ্‌ করিয়া চলিয়া ফিরিয়া বেড়ায় ও উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করে। শীত পড়িবার সঙ্গে সঙ্গে ইহারা গর্তের মধ্যে আশ্রয় লয় ও নিক্রিয় তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় শীতকাল কাটাইয়া দেয়। ইহাদের এই অবস্থাকে **শীতঘুম** (hibernation) অবস্থা বলা হয়। আবার গরম পড়িলেই খাদ্যের সন্ধানে গর্ত হইতে বাহির হইয়া আসে।

কুনো ব্যাঙ (Toad) : কুনো ব্যাঙ আমাদের দেশে প্রচুর পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়। উহারা দেখিতে কুৎসিত। ভিজা, স্যাঁতসেতে, ঝোপঝাপ, ছায়াচ্ছন্ন অন্ধকার স্থানে, নর্দমার ধারে, পুষ্করিণী, খালবিল ও জলমগ্ন নিম্নভূমিতে ইহারা দলবদ্ধভাবে বসবাস করে। ব্যাঙ ছোট ছোট পোকা মাকড় খাইয়া জীবন ধারণ করে। ইহাদের শরীরের উপরিভাগ **গুটিকায়** (wart) আচ্ছন্ন। পৃষ্ঠদেশের বর্ণ ধূসর ও উদরের দিক ঈষৎ হরিদ্রাভ।

বহিরাকৃতি (External structure) : কুনো ব্যাঙের শরীরকে মোটামুটি দুই ভাগে ভাগ করা যায়—**মস্তক** ও **দেহকাণ্ড** (চিত্র ৪)। মস্তক ও দেহকাণ্ডের মধ্যবর্তী দেশে সংযোজক কোন গ্রীবা নাই।

মস্তক : ব্যাঙের মস্তক অনেকটা ত্রিভুজাকৃতি—কিন্তু সম্মুখভাগ গোলাকার। এই অংশ অপেক্ষাকৃত কম গুটিকাচ্ছন্ন। মস্তকের অগ্রভাগে **মুখ** অবস্থিত। মুখের ছিদ্রটি বেশ বড় ও আড়াআড়ি ভাবে বিস্তৃত। উপরে ও নীচে দুইটি দন্তহীন **চোয়াল** দ্বারা মুখটি সুরক্ষিত। মস্তকের সম্মুখভাগে উপরের দিকে দুইটি **নাসারন্ধ্র** আছে। ইহাদের সাহায্যে ব্যাঙ শ্বাসকার্য নির্বাহ করে ও ঘ্রাণ লয়। নাসারন্ধ্রের পশ্চাতে মস্তকের উপরিভাগে দুই পার্শ্বে দুইটি বৃহদাকার **চক্ষু** আছে। চক্ষুদ্বয়—গোলাকার ও বাহিরের দিকে প্রসারিত। ব্যাঙের চক্ষু পল্লবহীন, ঊর্ধ্ব, নিম্ন ও তৃতীয় পর্দা (nictitating membrane) দ্বারা সুরক্ষিত। ইহাদের মধ্যে ঊর্ধ্ব পর্দাটি সঞ্চালিত হয় না। তৃতীয় পর্দাটি অর্ধস্বচ্ছ ও মাঝে মাঝে চক্ষুগোলককে

আবৃত করে। চক্ষুর ঠিক পশ্চাতে দুই পার্শ্বে দুইটি সাদা পর্দা ঢাকা গোলাকার অংশ বর্তমান। ইহাদের নাম **কর্ণপটাহ** বা **টিমপ্যানাম** (tympanum)। ইহা দ্বারা ব্যাঙ শ্রবণকার্য নির্বাহ করে। ব্যাঙের কোন বহিঃকর্ণ নাই।



(চিত্র ৪)

কুনো ব্যাঙের বহিরাকৃতি

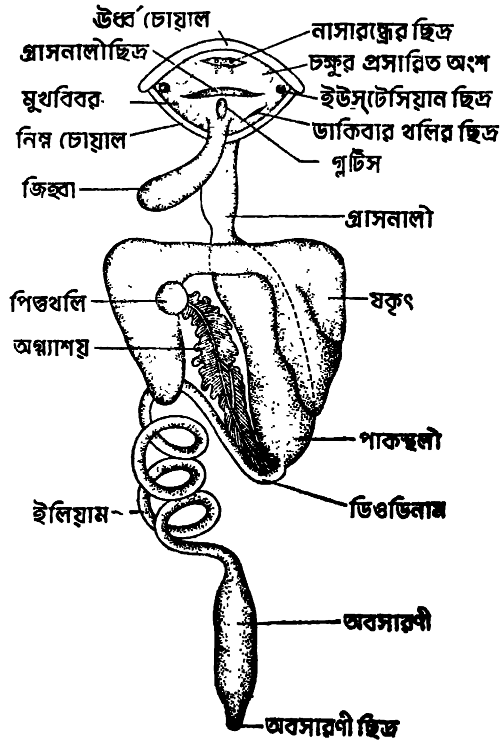
দেহকাণ্ড ঃ ব্যাঙের দেহকাণ্ড বক্ষ ও উদর এই দুইভাগে বিভক্ত। বক্ষাংশের উপরিভাগে দুইটি বড় বড় গ্রন্থি আছে। ইহাদের নাম **প্যারটিড গ্রন্থি** (parotid gland)। আক্রান্ত হইলে বা ভয় পাইলে ব্যাঙের প্যারটিড গ্রন্থি হইতে একপ্রকার বিষাক্ত সাদা আঠালো রস বাহির হইয়া শত্রুর প্রতি সজোরে নিক্ষিপ্ত হয়। চর্মের উপরিভাগে আরো কতকগুলি ছোট ছোট গ্রন্থি আছে। উহা হইতে নিঃসৃত রস চর্মকে সিক্ত রাখে ও কিছু পরিমাণে বিষাক্ত। দেহকাণ্ডে দুইজোড়া পা আছে। একজোড়া বক্ষের ও অপর জোড়া উদরের সহিত সংলগ্ন। সম্মুখের পা দুইটিকে **অগ্রপদ** (fore limb) বলে। ইহা অপেক্ষাকৃত ছোট এবং তিনটি অংশবিশিষ্ট। এই তিনটি অংশকে যথাক্রমে **উপরিবাহু** (upper arm), **পুরোবাহু** (fore arm) ও **হস্ত** (hand) বলা হয়। হস্তভাগ আবার যথাক্রমে **মণিবন্ধ** (wrist), **করতল** (palm) ও **হস্তাঙ্গুলি** (digits) এই তিনভাগে বিভক্ত। হস্তের উপরের অংশ মণিবন্ধ, পুরোবাহুর সহিত সংযুক্ত। মধ্যাংশ করতল, অপেক্ষাকৃত চওড়া। নিম্নাংশ হস্তাঙ্গুলি সম্মুখের দিকে প্রসারিত ও সূচাগ্র। হস্তাঙ্গুলি সংখ্যায় চারিটি। কেবল পুংব্যাঙের

প্রথম ও দ্বিতীয় অঙ্গুলিতে কালো রংএর মাংসপিণ্ড দেখা যায়—ইহাকে **থ্যাম্বপ্যাড** (thumb pad) বলে।

পশ্চাতের পা দুইটিকে **পশ্চাৎপদ** (hind limb) বলে। ইহারা অগ্রপদ অপেক্ষা লম্বা ও পেশীবহুল। প্রতিটি পশ্চাৎপদ **উরু** (thigh), **জঙ্ঘা** (shank) ও **পদ** (foot) এই তিন অংশে বিভক্ত। হস্তের ন্যায় পদেরও তিনটি অংশ আছে। জঙ্ঘার পরবর্তী পদের অংশের নাম **গুল্‌ফ** (ankle)। গুল্‌ফের পরবর্তী, পদের মধ্যমাংশের নাম **পদতল** (instep) এবং পদের তৃতীয় অংশের নাম **পদাঙ্গুলি** (digits বা toes)। পদাঙ্গুলি সংখ্যায় পাঁচটি এবং অঙ্গুলি মধ্যবর্তী অংশটি হাঁসের পায়ের ন্যায় পাতলা চামড়ার দ্বারা সংযুক্ত। এইরূপ পদকে **লিপ্তপাদ** (web-footed) বলে। লিপ্তপাদ হওয়ার ফলে ব্যাঙ জলে সাঁতার কাটিতে পারে। ব্যাঙের দেহের শেষপ্রান্তে একটি ছিদ্র বর্তমান। ইহাকে **অবসারণী ছিদ্র** (cloacal apperture) বলে। এই ছিদ্রপথে ব্যাঙের মল, মূত্র, শুক্রাণু, ডিম্বাণু প্রয়োজন অনুসারে নির্গত হয়।

পুষ্টিতন্ত্র (Digestive System) : কুনো ব্যাঙের খাদ্য ছোট ছোট পোকা মাকড়। ইহার জিহ্বা আঠাল, সম্মুখের অংশ আটকান এবং পিছনের অংশ খোলা। জিহ্বাটি উল্‌টানো অবস্থায় মুখের মধ্যে সন্নিবিষ্ট। আহার ধরিবার সময় উহা সম্মুখে নিক্ষিপ্ত হয় ও খাদ্যদ্রব্য আঠাল জিহ্বায় আটকাইয়া যায়। অতঃপর জিহ্বা মুখের মধ্যে টানিয়া লইয়া ইহারা মুখ বন্ধ করিয়া দেয়। ইহার পৌষ্টিক নালী মুখছিদ্র হইতে আরম্ভ করিয়া পায়ু পর্যন্ত বিস্তৃত (চিত্র 9)। মুখছিদ্রের পরের অংশ মুখবিবর। এই প্রশস্ত প্রকোষ্ঠের উপর দিকে দুইটি গোলাকার ফুলা অংশ আছে। উহা প্রকৃতপক্ষে মুখবিবরের মধ্যে চক্ষু-গোলকের প্রসারিত অংশ (impression of the eye)। মুখবিবরের ছাদের দিকে নাসারন্ধ্রের দুইটি ছিদ্র বর্তমান। চোয়ালের প্রতি পার্শ্বের সংযোগস্থলে দুইটি ছিদ্র (eustachian passage) আছে। উহারা দুইটি নালীর দ্বারা কর্ণের সহিত সংযুক্ত। জিহ্বার ঠিক উপরে লম্বালম্বিভাবে একটি ছিদ্র আছে। উহার নাম **গ্লটিস** (glottis)। উহার দ্বারা মুখবিবর ফুসফুসের সহিত যুক্ত। মুখবিবরের পশ্চাদংশের নাম **গলবিল** (pharynx)। গলবিল আড়াআড়ি ভাবে স্থিত একটি ছিদ্রের সাহায্যে একটি নালীর সহিত সংযুক্ত। এই নালীর নাম **গ্রাসনালী** (œsophagus)। পুং ব্যাঙের মুখবিবরের বাম দিক ঘেঁসিয়া একটি ছিদ্র দেখা যায়। উহা একটি কাল রংএর থলির (vocal sac) সহিত সংযুক্ত। এই থলির মধ্যে বায়ু সঞ্চালন ও নিঃসরণ করিয়া উহারা ডাকে। গ্রাসনালী

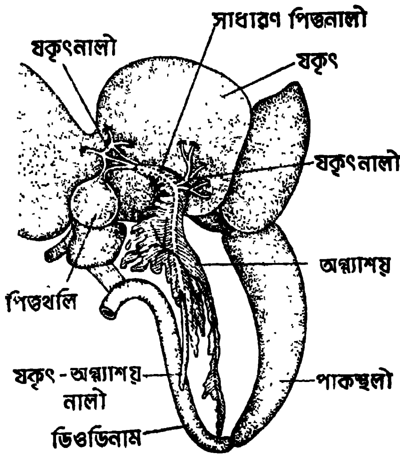
একটি প্রসারিত থলির মধ্যে আসিয়া শেষ হইয়াছে। উহাই ব্যাঙের **পাকস্থলী** (stomach)। ইহা একটু বাঁকা ধরনের, উপরের দিকটি নীচের দিকের তুলনায় অধিক বিস্তৃত। পাকস্থলী নীচের দিকে একটি সরু লম্বা পাকানো নালীর সহিত সংযুক্ত। ইহাকে **ক্ষুদ্রান্ত্র** (small intestine) বলে। ক্ষুদ্রান্ত্রের পাকস্থলী দিকস্থ অপেক্ষাকৃত প্রশস্ত নালী অংশকে **ডিওডিনাম** (duodenum) এবং অবশিষ্ট সরু লম্বা পাকানো অংশকে **ইলিয়াম** (ileum) বলে। ক্ষুদ্রান্ত্রের পরবর্তী অংশ **বৃহদন্ত্র** (large intestine)। ব্যাঙের ক্ষেত্রে **মলনালীই** (rectum) বৃহদন্ত্র। মলনালী **অবসারণী** (cloaca) নামক একটি থলির মধ্যে পড়িয়াছে। এই থলির মধ্যে **মূত্রনালী** (ureter), **শুক্রনালী** ও **ডিম্বনালী** (genital ducts) পড়িয়াছে। অবসারণী ছিদ্র বা **পায়ু** (cloacal aperture or vent) দেহের পশ্চাদংশে অবস্থিত। ইহার মধ্য দিয়া মল, মূত্র ইত্যাদি নিষ্কাশিত হয়।



চিত্র(9)
কুনো ব্যাঙের পুষ্টিতন্ত্র

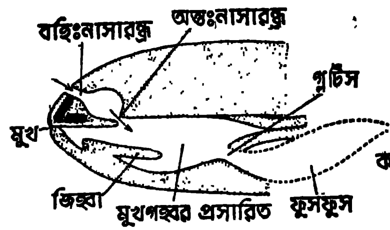
যকৃৎ (liver) ও **অগ্ন্যাশয়** (pancreas) (চিত্র 10) এই দুইটি খাদ্যপরিপাক সহায়ক গ্রন্থিও ব্যাঙের পুষ্টিতন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত। যকৃৎ, উদরের সম্মুখভাগে অবস্থিত। ইহা দেখিতে কালচে-লাল রংএর এবং দুইটি অংশবিশিষ্ট। বাম অংশটি দক্ষিণ অংশ অপেক্ষা আকারে বৃহত্তর, অস্পষ্টভাবে একটি খাঁজদ্বারা দুই ভাগে বিভক্ত। যকৃৎ নিঃসৃত হজমে সাহায্যকারী রসের নাম **পিত্ত** (bile)। ইহা একটি সবুজ রংএর থলির (gall bladder) মধ্যে সঞ্চিত থাকে। পিত্তথলি হইতে একটি নালী (cystic

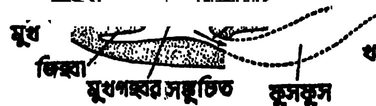
duct) বাহির হইয়া যকৃতের নালীর (hepatic duct) সহিত মিলিত হইয়া সাধারণ পিত্তনালী রূপে ডিওডিনামে পড়িয়াছে। এই নালী ডিওডিনামে পড়িবার পূর্বে অগ্ন্যাশয় হইতে বহির্গত নালীর সহিত মিলিত হইয়াছে। পিত্ত ও অগ্ন্যাশয় নিঃসৃত ক্ষারকরস ও উৎসেচক (enzyme) খাদ্য পরিপাকে সহায়তা করে।



(চিত্র 10)
কুনো ব্যাঙের যকৃৎ ও অগ্ন্যাশয়।

শ্বাসতন্ত্র (Respiratory System) ঃ ব্যাঙের চলাফেরা ও জীবনের অন্যান্য কাজগুলি করিবার জন্য শক্তির (energy) প্রয়োজন। দেহমধ্যস্থ খাদ্যবস্তুর দহনের ফলে ইহারা এই শক্তি লাভ করে। দহনের জন্য প্রয়োজন অক্সিজেন গ্যাস। এই গ্যাস ইহারা বাতাস হইতে নাসারন্ধ্রের সাহায্যে শরীরের মধ্যে গ্রহণ করে দহনের ফলে শরীরের মধ্যে অপর একটি দূষিত পদার্থ প্রস্তুত হয়। উহা অঙ্গারাম্ল গ্যাস। ইহা সত্বর শরীর হইতে নিষ্কাশিত হওয়া প্রয়োজন। এই অক্সিজেন গ্যাস গ্রহণ ও অঙ্গারাম্ল গ্যাসের বহির্গমন, শ্বাসক্রিয়ার সাহায্যে সংঘটিত হয়। যে তন্ত্রের সাহায্যে এই শ্বাসক্রিয়া সম্পন্ন হয়, তাহাকে **শ্বাসতন্ত্র** বলে।





(চিত্র 11)
কুনো ব্যাঙের শ্বাসগ্রহণ প্রক্রিয়া।
(ক)—প্রথম পর্যায় নাসারন্ধ্র খোলা, মুখগহ্বর প্রসারিত।
(খ)—দ্বিতীয় পর্যায় নাসারন্ধ্র বন্ধ, মুখগহ্বর সঙ্কুচিত।

এক জোড়া **ফুসফুস, মুখবিবর, গলবিল, ভিজা-চামড়া** এবং ব্যাঙাচি অবস্থায় **ফুল্‌কা** ব্যাঙের শ্বাসতন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত। ব্যাঙাচি অবস্থায় ইহারা ফুল্‌কার সাহায্যে মাছের মত জলে

উভচরপাড় ।

দ্রবীভূত অক্সিজেন গ্রহণ করে ও জলেই অঙ্গারাম্ল ত্যাগ করে (চিত্র 11)। পূর্ণাঙ্গ ব্যাঙ শ্বাস লইবার সময় প্রথমে মুখছিদ্র বন্ধ করিয়া নাসারন্ধ্রের সাহায্যে মুখবিবরের মধ্যে বাতাস টানিয়া লয় (চিত্র 11ক)। পরে নাসারন্ধ্র বন্ধ করিয়া পেশীর সাহায্যে ফুলা মুখবিবর সংকুচিত করে। ফলে মুখবিবরমধ্যস্থ বাতাসের উপর চাপ পড়ায় উহা গ্লটিসের মধ্য দিয়া ফুসফুসে প্রবেশ করে (চিত্র 11খ)। ফুসফুসের মধ্যে গ্যাসের পরিবর্তন ঘটে। পরে ফুসফুস সংকুচিত হইয়া বাতাসের উপর চাপ দেওয়ার ফলে উহা মুখবিবরের মধ্যে আসে এবং নাসারন্ধ্র ও মুখছিদ্রের মধ্য দিয়া দূষিত বায়ুরূপে বাহির হইয়া যায়। কিন্তু দূষিত বায়ু সম্পূর্ণরূপে বাহির হইবার পূর্বেই নাসারন্ধ্র ও মুখছিদ্রের মধ্য দিয়া বিশুদ্ধ বায়ু মুখবিবরে প্রবেশ করে সুতরাং ব্যাঙের ফুসফুসের মধ্যে যে বাতাস প্রবেশ করে তাহা সকল সময়েই দূষিত ও বিশুদ্ধ বায়ুর মিশ্রণ।

মুখের ভিতরের ও গলবিলের চামড়া খুব পাতলা এবং বহু রক্তবহানালী বিশিষ্ট। এই নালী মধ্যস্থ রক্তও কিছু পরিমাণে মুখবিবর হইতে অক্সিজেন গ্রহণ করিতে পারে।

উপরের প্রক্রিয়া ব্যতীত ত্বকের (skin) সাহায্যেও ব্যাঙের শ্বাসক্রিয়া সম্পন্ন হয়। ব্যাঙের ত্বক অত্যন্ত পাতলা ও বহু রক্তবহানালী বিশিষ্ট। ইহা বাহিরের বাতাসের সংস্পর্শে থাকে, সেইজন্য বাহিরের অক্সিজেন অনায়াসে ত্বকের মধ্য দিয়া রক্তবহানালী মধ্যে প্রবেশ করে ও তথা হইতে অঙ্গারাম্ল বাহিরে আসে। শীতঘুম কালে ব্যাঙ কেবল এই প্রক্রিয়ায় শ্বাসকার্য সম্পন্ন করে।

রক্তসংবহন তন্ত্র (Circulatory System): ব্যাঙের রক্ত একটি লাল রং-এর তরল পদার্থ। অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে দেখিলে দেখা যায় যে প্রকৃতপক্ষে রক্তের তরল অংশ **প্লাজ্মা** (plasma) নামক একটি বর্ণহীন পদার্থ। ইহাতে অসংখ্য লাল রং-এর **লোহিত কণিকা** ও কিছু **শ্বেতকণিকা** আছে। লোহিত কণিকাগুলি ঈষৎ ডিম্বাকৃতি এবং কণিকামধ্যস্থ লাল রঞ্জক পদার্থের নাম **হিমোগ্লোবিন** (hæmoglobin)।

ব্যাঙের রক্তসংবহন তন্ত্র একটি **হৃৎপিণ্ড** (heart), কতকগুলি **শিরা** (veins), **ধমনী** (arteries) ও **কৈশিকনালী** (capillaries) লইয়া গঠিত। হৃৎপিণ্ড হইতে দেহের বিভিন্ন স্থানে ও ফুসফুসে রক্তের প্রবাহ ও তথা হইতে হৃৎপিণ্ডে রক্তের পুনরাগমনকে **রক্তসঞ্চালন** বলে।

হৃৎপিণ্ড: ইহা ত্রিকোণাকৃতি ও কালচে লাল রং-এর। বক্ষের দেহগহ্বরে

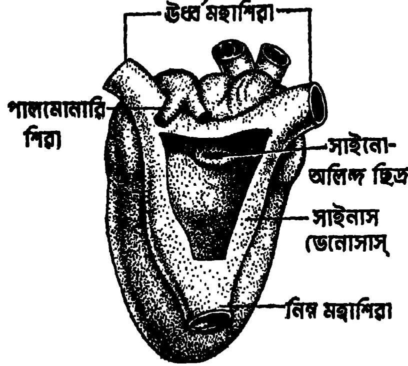
ইহার অবস্থিতি। ইহা একটি পাতলা ঝিল্লী বা **হৃদ্ধরা** (pericardium) দ্বারা আচ্ছাদিত (চিত্র 12)। ব্যাঙের হৃৎপিণ্ডে মোট পাঁচটি প্রকোষ্ঠ আছে। বামে ও দক্ষিণে দুইটি **অলিন্দ** (auricle) (চিত্র 12, 14), ইহাদের নিম্নে একটি **নিলয়** (ventricle)। অলিন্দ দুইটির পিছনের দিকে একটি ত্রিকোণাকৃতি **সাইনাস ভেনোসাস** (sinus-venosus) (চিত্র 13) এবং নিলয়ের সম্মুখভাগে **কোনাস আর্টারিওসাস** (conus

(চিত্র 12)

কুনো ব্যাঙের হৃৎপিণ্ডের সম্মুখ ভাগ (অঙ্ক দেশ হইতে যেরূপ দেখা যাইবে)।

arteriosus) (চিত্র 12)। ইহাদের মধ্যে প্রথম তিনটি প্রকোষ্ঠ প্রধান। সাইনাস ভেনোসাস দক্ষিণ অলিন্দের সহিত একটি ছিদ্রের দ্বারা যুক্ত (চিত্র 13)। এই ছিদ্র একটি কপাটিকা দ্বারা রক্ষিত। ফলে রক্ত সাইনাস ভেনোসাস হইতে কেবলমাত্র দক্ষিণ অলিন্দে প্রবেশ করিতে পারে। দক্ষিণ ও বাম অলিন্দ দুইটি একটি পাতলা প্রাচীর দ্বারা সম্পূর্ণরূপে পৃথক করা (চিত্র 14)। ফুসফুস হইতে রক্ত ফুসফুসীয় বা পালমোনারি শিরা দিয়া বাম অলিন্দে আসে কিন্তু কপাটিকা থাকার জন্য ফিরিয়া যাইতে পারে না। দুইটি অলিন্দ, নিম্নস্থ নিলয়ের সহিত একটি সাধারণ ছিদ্রের দ্বারা সংযুক্ত। এই ছিদ্রপথটি দুইটি খণ্ডযুক্ত একটি কপাটিকা দ্বারা এইরূপে রক্ষিত যে রক্ত কেবল অলিন্দ হইতে নিলয়ে আসিতে পারে কিন্তু নিলয় হইতে ফিরিয়া যাইতে পারে না। নিলয়টি ত্রিকোণাকৃতি ও মাংসল। ইহা কোনাস আর্টারিওসাসের সহিত সংযুক্ত এবং সংযোগকারী ছিদ্রটি তিনটি **অর্ধচন্দ্রাকৃতি কপাটিকার** (semilunar valves) দ্বারা রক্ষিত। ফলে

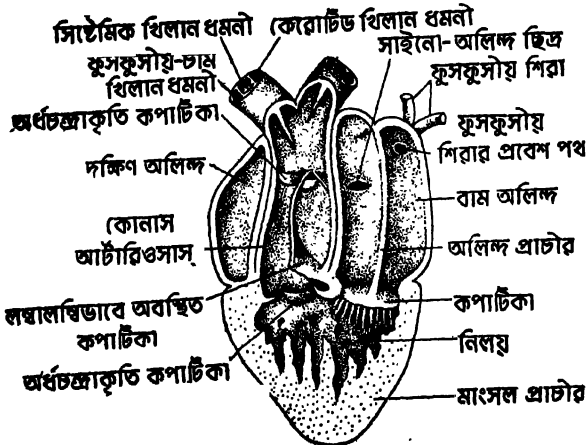
রক্ত কেবল নিলয় হইতে কোনাসে আসিতে পারে। কোনাস আর্টারিওসাসের মধ্যে লম্বালম্বি ভাবে একটি কপাটিকা আছে (spiral valve)। কোনাস পরে দুইটি



(চিত্র 13)

কুনো ব্যাঙের হৃৎপিণ্ডের পশ্চাদ্ভাগ (পৃষ্ঠদেশ হইতে যেরূপ দেখা যাইবে)। এখানে হৃদ্ধরা দেখান হয় নাই।

শাখায় বিভক্ত হইয়া গিয়াছে। প্রতিটি শাখা আবার তিনটি করিয়া উপশাখায় বিভক্ত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে সকলের উপরেরটি মস্তকে (কেরোটিড খিলান



(চিত্র 14)

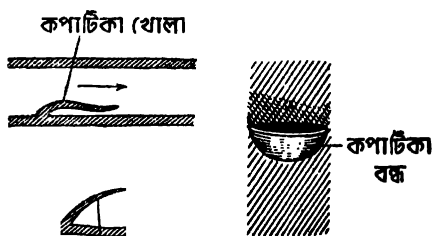
কুনো ব্যাঙের হৃৎপিণ্ডের লম্বচ্ছেদ (অঙ্কদেশ হইতে যেরূপ দেখা যাইবে)

ধমনী), মধ্যটি সমস্ত দেহে (সিস্টেমিক খিলান ধমনী) ও নিম্নেরটি ফুসফুসে ও চর্মে (ফুসফুসীয়-চার্ম খিলান ধমনী) গিয়াছে।

হৃৎপিণ্ডে রক্তসঞ্চালন : সমগ্র শরীর হইতে দূষিত রক্ত ঊর্ধ্ব ও নিম্ন দুইটি মহাশিরা দিয়া হৃৎপিণ্ডের সাইনাস ভেনোসাসে পৌঁছায় (চিত্র 13)। সাইনাস ভেনোসাস সংকুচিত হইবার ফলে দূষিত রক্ত তথা হইতে দক্ষিণ অলিন্দে আসে। এই সঙ্গে ফুসফুস সংকুচিত হইবার ফলে বিশুদ্ধ রক্ত ফুসফুস হইতে ফুসফুসীয় শিরা দ্বারা বাম অলিন্দে আসে (চিত্র 14)। দুইটি অলিন্দ একসঙ্গে সংকুচিত হয়। ফলে নিলয়ের দক্ষিণ দিকে দূষিত রক্ত ও বাম দিকে বিশুদ্ধ রক্ত এক সাথে প্রবেশ করে। নিলয়ের সংকোচনের ফলে রক্ত কোনাসের মধ্যে প্রবেশ করে ও তথা হইতে সর্বপ্রথম দূষিত রক্তের বেশী অংশ নিম্নের ধমনী দিয়া ফুসফুস ও চর্মে বিশুদ্ধ হইবার জন্য পরিচালিত হয় ; মিশ্রিত অংশ পরে মধ্যের ধমনী দিয়া সমস্ত দেহে এবং নিলয় ও কোনাসের সম্পূর্ণ সংকোচনের ফলে বিশুদ্ধ রক্ত উপরের ধমনী দ্বারা মস্তকে পরিচালিত হয়। কোনাস মধ্যস্থ লম্বালম্বিভাবে অবস্থিত কপাটিকাটি দূষিত, মিশ্রিত ও বিশুদ্ধ রক্ত বিভিন্ন নালীপথে পরিচালিত করিতে সাহায্য করে।

হৃৎপিণ্ডে প্রথমে অলিন্দ এবং পরে নিলয় সংকুচিত হয়। সংকোচনের পর সমস্ত হৃৎপিণ্ডটি আবার প্রসারিত হয়। এই সময়ে পুনরায় রক্ত হৃৎপিণ্ডে প্রবেশ করে। ইহা উল্লেখযোগ্য যে ব্যাঙের হৃৎপিণ্ডে দূষিত ও বিশুদ্ধ রক্তের সংমিশ্রণ ঘটে।

ধমনী, শিরা ও কৈশিকনালী : ব্যাঙের হৃৎপিণ্ড হইতে যে নালীগুলি শরীরে ও ফুসফুসে রক্ত লইয়া যায় তাহাদিগকে **ধমনী** বলে। ধমনীগুলির প্রাচীর স্থূল ; ইহাদের মধ্য দিয়া রক্ত বেগে প্রবাহিত হয়। যে নালী দ্বারা রক্ত, ফুসফুস ও সমস্ত শরীর হইতে হৃৎপিণ্ডে ফিরিয়া আসে তাহাদিগকে **শিরা** বলে। শিরার প্রাচীর পাতলা। ইহার মধ্য দিয়া রক্ত ধীরে ধীরে প্রবাহিত হয়। শিরা মধ্যে কপাটিকা থাকার জন্য রক্ত কেবল এক দিকে প্রবাহিত হইতে পারে (চিত্র 15)। ধমনীগুলি দেহস্থ কলার মধ্যে বহু ভাগে বিভক্ত হইয়া জালিকার আকার ধারণ করে। এই সরু রক্তবহা নালীগুলিকে **কৈশিকনালী** বলে। এই কৈশিক-নালীগুলি পুনরায় একত্রিত হইয়া শিরায় পরিণত হয়।



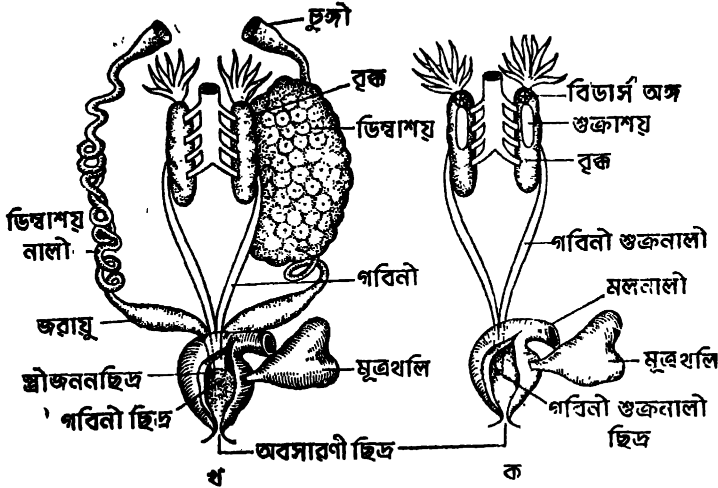
(চিত্র 15)
কুনো ব্যাঙের শিরার মধ্যে রক্ত প্রবাহকালে কপাটিকার অবস্থান

অতএব দেখা যাইতেছে হৃৎপিণ্ড সংকুচিত হইলে, উহা হইতে দূষিত,

মিশ্রিত ও বিশুদ্ধ রক্ত, ধমনী দ্বারা যথাক্রমে ফুসফুস, দেহ ও মস্তকের কলামধ্যস্থ কৈশিক নালীর মধ্য দিয়া প্রবাহিত হয়। প্রবাহকালে দূষিত রক্ত অঙ্গারাম্ল গ্যাস ত্যাগ করিয়া ও অক্সিজেন গ্যাস গ্রহণ করিয়া বিশুদ্ধ হয় এবং মিশ্রিত ও বিশুদ্ধ রক্ত, অক্সিজেন গ্যাস ত্যাগ করিয়া ও অঙ্গারাম্ল গ্যাস গ্রহণ করিয়া দূষিত হয়। ফুসফুস ও দেহস্থ কৈশিকনালী হইতে যথাক্রমে বিশুদ্ধ ও দূষিত রক্ত শিরা দ্বারা পুনরায় হৃৎপিণ্ডে ফিরিয়া আসে। হৃৎপিণ্ডের নিলয়ের মধ্যে দূষিত ও বিশুদ্ধ রক্ত কিছু পরিমাণে মিশ্রিত হয়।

রেচন ও জননতন্ত্র (Excretory and Genital System) ঃ ব্যাঙের এই দুইটি তন্ত্র প্রকৃতপক্ষে পৃথক নহে। একজোড়া **বৃক্ক** (kidney), **মূত্রথলি** (urinary bladder), **পুং** অথবা **স্ত্রী জননাঙ্গ** লইয়া এই তন্ত্র গঠিত।

মূত্রনিষ্ক্রমণ প্রক্রিয়া (Urinary System) ঃ ব্যাঙের দেহগহ্বরের মধ্যে, পিছনের দিকে মেরুদণ্ডের দুই পার্শ্বে দুইটি কাল্‌চে লাল রংএর চ্যাপ্টা **বৃক্ক** (kidney) আছে (চিত্র 16 ক, খ)। বৃক্ক দুইটি দেহগহ্বরের সহিত পাতলা চামড়া দ্বারা



(চিত্র 16)

কুনো ব্যাঙের রেচন ও জনন তন্ত্র।

ক—পুং জনন ও রেচন তন্ত্র।

খ—স্ত্রী জনন ও রেচন তন্ত্র।

আটকান থাকে। প্রতিটি বৃক্কের সম্মুখভাগে কতকগুলি সরু সরু অঙ্গুলাকৃতি অংশ সংযুক্ত। ইহাদিগকে ফ্যাটবডি বা সঞ্চিত চর্বি জাতীয় খাদ্যবস্তু বলে। প্রতিটি

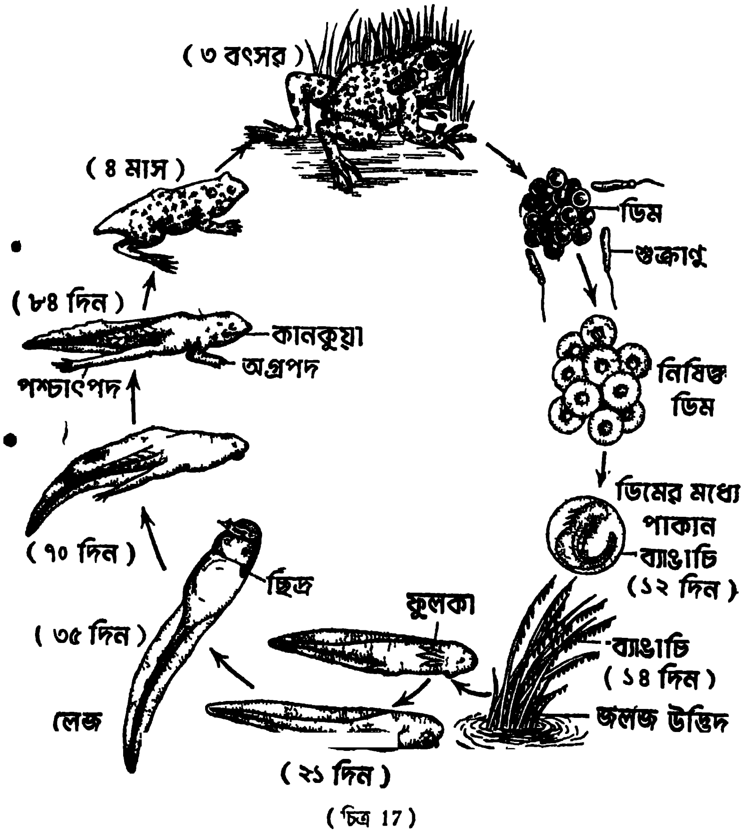
বৃক্কের সহিত একটি করিয়া হলুদে রং-এর এডরিনাল গ্রন্থি সংযুক্ত। ইহা দেহগঠনে সাহায্য করে। প্রত্যেক বৃক্কের পার্শ্বদেশ হইতে একটি করিয়া **গবিনী** (ureter) নালী বাহির হইয়াছে। ইহারা পরে একত্রে একটি সাধারণ নালীতে সংযুক্ত হইয়াছে। এই নালী একটি মাত্র ছিদ্র দিয়া অবসারণীতে পড়িয়াছে। অবসারণীর নীচের দিকে একটি পাতলা চামড়া নির্মিত সাদা রংএর থলি আছে। ইহাকে **মূত্রথলি** বলে। এই মূত্রথলি অবসারণীর নিম্নভাগে এক পার্শ্বে সংযুক্ত। ইহা গবিনী নালীর সহিত সংযুক্ত নহে। রক্ত বৃক্কের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইবার কালে রক্তমধ্যস্থ তরল দূষিত পদার্থ বৃক্ক কর্তৃক নিষ্ক্রান্ত হইয়া গবিনীতে পড়ে। পরে গবিনী হইতে মূত্র অবসারণীতে আসে ও অবসারণী ছিদ্র দিয়া বাহির হইয়া যায়। অবসারণী মধ্যে নিঃসৃত মূত্র, সাময়িক ভাবে মূত্রথলিতে সঞ্চিত থাকিতে ও প্রয়োজন অনুসারে ইহা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইতে পারে।

পুংজনন তন্ত্র (Male genital System) (চিত্র 16ক)—পুং ব্যাঙের বৃক্কের সহিত সংলগ্ন এক জোড়া **শুক্রাশয়** বর্তমান। ইহাদের রং সাদা, আকৃতি ঈষৎ লম্বা। বৃক্কের সম্মুখভাগে দুইটি লাল রংএর গোলাকৃতি অংশ বর্তমান। ইহাদের **বিডার্স অঙ্গ** (bidders organ) বলে। ইহাকে ডিম্বাশয়ের অংশ বলিয়া মনে করা হয়। শুক্রাশয়ের মধ্যে শুক্রকীট নির্মিত হয়। ইহারা শুক্রাশয় হইতে কতকগুলি **ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র** নালীর (vas efferens) মাধ্যমে বৃক্কনালীর মধ্যে আসে। বৃক্কনালীতে শুক্রকীট ও মূত্র, মিশ্রিত অবস্থায় মূত্রনালী বা গবিণীর মধ্য দিয়া অবসারণীতে পৌছে। একই নালীর মধ্য দিয়া শুক্রকীট ও মূত্র প্রবাহিত হয় বলিয়া এই সাধারণ নালীর নাম **গবিনী-শুক্রনালী** (urine-genital duct)। পরে শুক্রকীটগুলি অবসারণীর ছিদ্র দিয়া বাহিরে আসে।

স্ত্রীজনন তন্ত্র (Female genital System) (চিত্র 16খ)—ব্যাঙের স্ত্রীজনন তন্ত্র দুইটি **ডিম্বাশয়** (ovary) ও দুইটি **ডিম্বাশয় নালী** (oviduct) লইয়া গঠিত। পূর্ণাঙ্গ স্ত্রীব্যাঙের দেহগহ্বরের মধ্যে, দেহের মধ্যরেখার দুই পার্শ্বে দুইটি ডিম্বাশয় বর্তমান। ইহারা দেখিতে কালো রংএর। দেহের সহিত পাতলা চামড়ার দ্বারা সংলগ্ন। ডিম্বাশয়ে অসংখ্য ডিম্ব থাকে। প্রতিটি ডিম্বাশয় হইতে একটি করিয়া সাদা রংএর ও পাকানো নালী বাহির হইয়াছে। প্রত্যেক নালীর সম্মুখভাগে একটি করিয়া **চুঙ্গি** (funel) আছে। নালীর শেষ অংশ ঈষৎ স্ফীত **(জরায়ু)**। দুইটি ডিম্বাশয় নালী পিছনের দিকে একত্র মিলিত হইয়া অবসারণীর মধ্যে পড়িয়াছে। ডিম্ব, ডিম্বাশয় হইতে ডিম্বনালীর চুঙ্গির মধ্যে প্রবেশ

করে। তথা হইতে ডিম্বনালী দিয়া আসিয়া অবসাবণীতে পড়ে ও অবসারণী ছিদ্রের মধ্য দিয়া বাহিরে আসে।

ব্যাঙের জন্মবৃত্তান্ত ও রূপান্তর (Life history and metamorphosis of Toad: (চিত্র 17) বর্ষাকালে স্ত্রীব্যাঙ জলে ডিম পাড়ে। পুংব্যাঙ হইতে শুক্রকীটও জলে নিক্ষিপ্ত হয। একটি ডিম্ব একটি মাত্র শুক্রকীট দ্বারা নিষিক্ত (fertilised) হয। নিষিক্ত ডিম্ব বহু বিভাজন



(চিত্র 17)

কুনো ব্যাঙের রূপান্তর।

ও কতকগুলি পরিবর্তনের ফলে ক্রমে ছোট মাছের আকার ধারণ করে। উহা ডিমের মধ্যে পাকানো অবস্থায় থাকে। নিষেকের প্রায 14 দিন পরে মাছরূপী ব্যাঙাচি ডিম ফাটিয়া জলে বাহির হইয়া আসে। এই সময়ে ইহাদের মুখ, চোখ

ইত্যাদি থাকে না। পশ্চাৎ দেশে একটি লেজ ও সম্মুখ ভাগে একটি **সাকার** (sucker) থাকে। ইহার সাহায্যে ব্যাঙাচিরা কোন জলজ উদ্ভিদের সহিত নিজেদের আটকাইয়া রাখে। কিছুদিনের মধ্যে চোখ ও দুইটি চোয়াল বিশিষ্ট একটি মুখ দেখা দেয়। একটি লম্বা পাকানো অন্ত্রও গঠিত হয়। এই সময়ে মস্তকের দুই পার্শ্বে তিন জোড়া করিয়া বহিঃফুলকা থাকে। ইহাদের সাহায্যে ব্যাঙাচি শ্বাসগ্রহণ করে। ব্যাঙাচি লেজের সাহায্যে জলে সাঁতার কাটিয়া খাদ্য অন্বেষণ ও গ্রহণ করিতে পারে। ক্রমশঃ ইহাদের গলবিলে দুই পার্শ্বে ফুলকাছিদ্র এবং মাছের ন্যায় আভ্যন্তরীণ ফুলকা গঠিত হয়। বহিঃ ফুলকাগুলি ক্রমশঃ লুপ্ত হয়। আভ্যন্তরীণ ফুলকাগুলি মাছের মত কানকুয়া দ্বারা ঢাকা থাকে। কেবলমাত্র বামদিকে কানকুয়ার পার্শ্বে একটি ছিদ্র থাকে। ইহার মধ্য দিয়া জল বাহির হইয়া আসে। ইতিমধ্যে ইহাদের শরীরের অভ্যন্তরে ফুসফুস গঠিত হয় এবং ফুলকা-ছিদ্র বন্ধ হইয়া যায়। পরবর্তী কালে লেজের সংযোগস্থলে এক জোড়া পশ্চাৎপদ বাহির হয়। অগ্রপদ জোড়া কানকুয়ার দ্বারা ঢাকা থাকে। পরে চামড়া ভেদ করিয়া বাহির হইয়া আসে। পদগুলির বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে লেজ ক্রমশঃ ছোট হইতে থাকে। ইহার পর কিছুদিন ব্যাঙাচি নিষ্ক্রিয় অবস্থায় থাকে। পরে ব্যাঙাচি পূর্ণাঙ্গ ব্যাঙ রূপে স্থলে উঠিয়া আসে। ফুসফুসের সাহায্যে নিঃশ্বাস প্রশ্বাস কার্য সম্পন্ন করিতে থাকে। লেজটি দেহের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে লুপ্ত হইয়া যায়। প্রায় চারি মাসের মধ্যে এই রূপান্তরক্রিয়া সংঘটিত হয়। ব্যাঙের জীবনীতে ডিম্ব হইতে পূর্ণাঙ্গ ব্যাঙ পর্যন্ত যে পরিবর্তন ঘটিয়া থাকে তাহাকে **ব্যাঙের রূপান্তর** (metamorphosis) বলা হয়।

প্রশ্নাবলী

1. চিত্রের সাহায্যে ভেটকী মাছের বহিরাকৃতির একটি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দাও।
2. ভেটকী মাছের পুষ্টিতন্ত্র সম্বন্ধে একটি বিবরণ লিখ।
3. ভেটকী মাছের শ্বাসকার্য কি করিয়া সংঘটিত হয়?
4. ভেটকী মাছের রক্তসঞ্চালন-তন্ত্র বলিতে কি বুঝায়? ইহার হৃৎপিণ্ডের গঠন ও উহার মধ্যদিয়া রক্তসঞ্চালন বর্ণনা কর।
5. মাছের মধ্যে স্ত্রী-পুরুষ ভেদ আছে কি? ভেটকী মাছের মূত্রনিষ্কাশন ও জননতন্ত্র বর্ণনা কর।

6. মাছের বিশিষ্ট চরিত্র কি কি ? জীওল মাছ কাহারা ? ইহাদিগকে ক্যাট ফিস্ বলা হয় কেন ?

7. কুনো ব্যাঙের বহিরাকৃতি চিত্র সাহায্যে বর্ণনা কর।

8. কুনো ব্যাঙের পুষ্টিতন্ত্রের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিখ।

9. কি প্রকারে কুনো ব্যাঙের শ্বাসকার্য নির্বাহ হয় ?

10. ব্যাঙের রক্তসংবহন তন্ত্র বলিতে কি বুঝ ? ইহার হৃৎপিণ্ডের মধ্য দিয়া কি ভাবে রক্ত সঞ্চালিত হয় তাহার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিখ।

11. কুনো ব্যাঙের রেচন ও জনন তন্ত্র সম্বন্ধে যাহা জান লিখ।

12. কুনো ব্যাঙের জীবনী ও রূপান্তর সংক্ষেপে বর্ণনা কর।

13. নিম্নলিখিত গুলির টীকা লিখ :—

টিনয়েড আঁশ, ক্যাটফিস, প্লীহা, পটকা, পার্শ্বরেখা, শীতঘুম, প্যারটিড গ্রন্থি, যকৃৎ, অগ্ন্যাশয়, কৈশিকনালী, শিরা, অবসারণী, কর্ণপটাহ, রূপান্তর।

14. (a) বন্ধনীর মধ্যে লিখিত অশুদ্ধটি কাটিয়া দাও :—

ভেটকী মাছের শ্বাসকার্য (ফুলকার, ফুসফুসের) সাহায্যে সংঘটিত হয়, ইহারা নাসিকার সাহায্যে (ঘ্রাণ লয়, শ্বাসকার্য করে), ইহাদের রক্ত (উষ্ণ, শীতল); (যকৃৎ, অগ্ন্যাশয়, প্লীহা, পটকা) পুষ্টিতন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত ও হৃৎপিণ্ড সকল সময়ে (বিশুদ্ধ, মিশ্রিত, দূষিত) রক্তে পূর্ণ থাকে।

(b) শুদ্ধ অথবা ভুল, পার্শ্বে 'হাঁ' বা 'না' লিখিয়া চিহ্নিত কর :—

(i) ব্যাঙের রক্ত উষ্ণ,—

(ii) ইহাদের চক্ষু তিনটি পর্দা দ্বারা সুরক্ষিত,—

(iii) ব্যাঙের বহিঃকর্ণ নাই,—

(iv) ইহাদের মলনালী অবসারণীতে পড়িয়াছে,—

(v) ইহাদের জিহ্বার পশ্চাদ্ভাগ আটকান,—

(vi) ব্যাঙাচি অবস্থায় ব্যাঙ ফুসফুসের সাহায্যে শ্বাসগ্রহণ করে,—

(vii) ব্যাঙের হৃৎপিণ্ড সর্বদা দূষিত রক্তে পূর্ণ থাকে,—

(viii) ইহাদের হৃৎপিণ্ডে দূষিত ও বিশুদ্ধ রক্তের মিশ্রণ ঘটে,—

(ix) ইহাদের শিরামধ্যে কপাটিকা নাই,—

(x) পুরুষ ব্যাঙের শুক্রনালী ও গবিণী পৃথক নহে,—

15. উদাহরণ লিখ :—

(a) সাধারণতঃ মাছ জলে দ্রবীভূত অক্সিজেন শ্বাসকার্যে গ্রহণ করে,

কিন্তু এমন কতকগুলি মাছ আছে যাহারা বায়ু হইতে অক্সিজেন গ্রহণ করিয়া কিছুক্ষণ বাঁচিয়া থাকিতে পারে, যথা—

(b) কতকগুলি মাছ শক্ত অস্থিবিশিষ্ট, কিন্তু কতকগুলি মাছ তরুণাস্থি বিশিষ্ট, যথা—

17. (a) শূন্যস্থান পূর্ণ কর :—

ভেটকী মাছের সমস্ত শরীর——দ্বারা ঢাকা ইহারা——শোণিত এবং——সাহায্যে শ্বাসকার্য নির্বাহ করে, সন্তরণকালে——পাখ্না হালের কাজ করে এবং ——দ্বারা পারিপার্শ্বিক অবস্থা অনুভব করে। ভেটকী মাছ——সাহায্যে——জলে ভাসিতে বা ডুবিতে পারে ; জননতন্ত্রে, পুরুষ মাছে দুইটি——ও স্ত্রী মাছে দুইটি——থাকে।

(b) কুনোব্যাঙ——শ্রেণীর প্রাণী, ইহারা ব্যাঙাচি অবস্থায়——সাহায্যে শ্বাসকার্য নির্বাহ করে,——ব্যাঙের হস্তে থাম্বপ্যাড থাকে ; ইহাদের হৃৎপিণ্ডে ——টি প্রকোষ্ঠ আছে, ফুসফুসীয় শিরা দিয়া——রক্ত ও ফুসফুসীয় ধমনী দিয়া——রক্ত প্রবাহিত হয়, মূত্র——কর্তৃক নিষ্ক্রান্ত হয়।

মানবদেহ (Human Body)

একবিংশ অধ্যায়

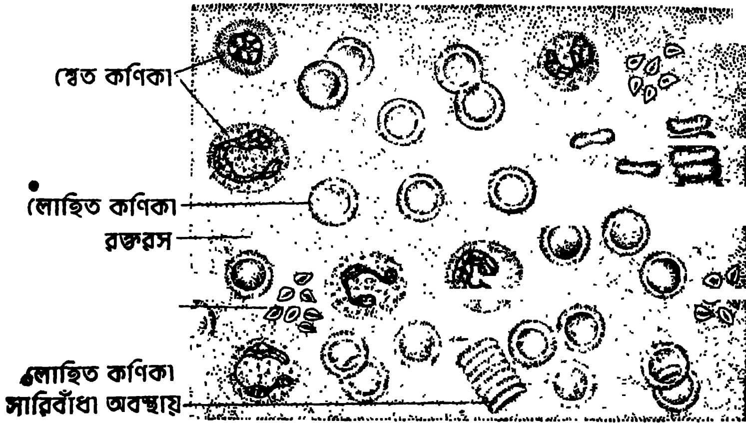
রক্ত ও রক্তসংবহন তন্ত্র

রক্ত (Blood) : আমাদের দেহে হৃৎপিণ্ড ও রক্তবহা নালীগুলির মধ্যে প্রবাহিত লাল রংয়ের তরল ও অস্বচ্ছ পদার্থকে **রক্ত** বা **রুধির** (blood) বলে।

একটি পূর্ণাঙ্গ মানবদেহে, শরীরের সম্পূর্ণ ওজনের প্রায় $\frac{1}{11}$ অংশ রক্ত থাকে। অর্থাৎ কোন মানুষের ওজন 77 কিলোগ্রাম হইলে তাহার শরীরে প্রায় 7 কিলোগ্রাম রক্ত থাকিবে। ধমনী (artery) মধ্যে প্রবাহিত বিশুদ্ধ অর্থাৎ অক্সিজেন মিশ্রিত রক্ত উজ্জ্বল লাল বর্ণের শিরা (vein) মধ্যে প্রবাহিত দূষিত রক্তে অঙ্গারাম্ল মিশ্রিত থাকায় ইহা কাল্চে লাল বর্ণের। রক্ত জলের তুলনায় প্রায় পাঁচ গুণ ঘন। ইহার উত্তাপ গড়ে প্রায় 37·8° ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড (100°

ফারেনহাইট)। রক্তের স্বাদ ঈষৎ লবণাক্ত। ইহা ক্ষার জাতীয় (alkaline) পদার্থ ও বিশিষ্ট গন্ধ যুক্ত।

রক্তের উপাদান—রক্ত মূলতঃ দুই প্রকার বস্তু লইয়া গঠিত, **রক্তকোষ** (blood cells) ও **রক্তরস** (plasma)। রক্তে রক্তকোষ প্রায় 45 ভাগ ও রক্তরস প্রায় 55 ভাগ থাকে। রক্তকোষ আবার তিন প্রকারের, যথা: (1) **লোহিত কণিকা** (red blood corpuscle), (2) **শ্বেতকণিকা** (white blood corpuscle), ও (3) **অনুচক্রিকা** (blood platelets)।



(চিত্র 19)
রক্ত ও উহার উপাদান

রক্তরস (Plasma) : (চিত্র 19) রক্ত হইতে কণিকাগুলি আলাদা করিলে যে তরল পদার্থ অবশিষ্ট থাকে তাহাই রক্তরস। ইহার বর্ণ ঈষৎ হরিদ্রাভ। জলই রক্তরসের প্রধান উপাদান। কারণ 100 ভাগ রক্তে প্রায় 90—95 ভাগ জল ও 9—10 ভাগ অন্যান্য কঠিন পদার্থ থাকে।

লোহিত কণিকা (Red blood corpuscle) (চিত্র 19 ও 20ক) : অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে পরীক্ষা করিলে রক্তের মধ্যে অসংখ্য লোহিত কণিকা দেখিতে পাওয়া যায়। লোহিত কণিকাগুলি এককভাবে দেখিতে হরিদ্রাভ কিন্তু একত্র থাকিলে উহাদের লাল দেখায়। সেইজন্যই রক্তের রং লাল। লোহিত কণিকাগুলি দেখিতে গোলাকার (চিত্র 20ক), দুই পাশ ভিতর দিকে সরার ন্যায় চাপা (biconcave), পাশ হইতে দেখিতে অনেকটা ডাম্বেলের মত। ইহারা

রক্ত তঞ্চন (**Coagulation of blood**) : তোমরা হয়ত লক্ষ্য করিয়া থাকিবে হস্তপদাদি কোন স্থলে অল্প কাটিয়া গেলে সেই স্থান দিয়া রক্ত বাহির হয়। কিন্তু শীঘ্রই এই রক্ত বাহিরে আসিয়া জমাট বাঁধিয়া যায় এবং রক্তপড়া বন্ধ হয়। রক্তের জমাট বাঁধাকে **রক্ততঞ্চন** বলে। কি করিয়া রক্ত জমাট বাঁধে এ বিষয়ে অনেক মতভেদ আছে। মোটামুটি বলা যায় অনুচক্রিকাগুলি ভাঙ্গিয়া গিয়া এবং দেহের কাটা স্থান হইতে থ্রম্বোপ্লাসটিন (thromboplastin) নামক এক প্রকার পদার্থ বাহির হইয়া রক্তস্থ ক্যালসিয়াম সংযোগে রক্তমধ্যস্থ প্রোথ্রম্বিনকে (prothrombin) থ্রম্বিনে (thrombin) পরিণত করে। রক্ত মধ্যে ফাইব্রিনোজেন (fibrinogen) নামক এক প্রকার প্রোটিন থাকে। ইহা রক্তকে তরল অবস্থায় রাখে। থ্রম্বিন এই ফাইব্রিনোজেনকে ফাইব্রিনে (fibrin) পরিবর্তিত করে। ফাইব্রিন কতকগুলি সূক্ষ্ম সূতার ন্যায় তন্তু। এই তন্তুগুলি রক্তমধ্যস্থ কণিকাগুলির সঙ্গে জড়াইয়া যায়, ফলে রক্ত জমাট বাঁধে। রক্ত জমিয়া গেলে যে হরিদ্রাবর্ণের তরল পদার্থ পড়িয়া থাকে উহাকে **রক্তমস্তু** (serum) বলে। ইহাতে ফাইব্রিনোজেন থাকে না বলিয়া ইহা জমাট বাঁধে না। রক্তের জমাট বাঁধিবার এই বিশেষ ক্ষমতা অধিক রক্তক্ষরণ জনিত বিপদ হইতে আমাদের শরীরকে রক্ষা করে।

রক্তের কার্য (**Function of blood**)—(1) ইহা ফুসফুস হইতে অক্সিজেন বহন করিয়া কলা মধ্যে লইয়া যায় ও তথা হইতে অঙ্গারাম্ল গ্যাস ফুসফুসে বহন করিয়া আনে।

(2) দেহের প্রতি কোষ ও প্রতি কলার জন্য খাদ্য-সার ভাইটামিন ও নানা প্রকার রাসায়নিক দ্রব্য সরবরাহ করে।

(3) দেহ বিপাকের ফলে যে সব বর্জ্য পদার্থ উৎপন্ন হয় তাহাদিগকে মূত্র, ঘর্ম ও ফুসফুস পথে বাহির করিয়া দেয়।

(4) কোন রোগজীবাণু শরীরে প্রবেশ করিলে উহাদের সহিত যুদ্ধ করিয়া বা উহাদিগকে খাইয়া ফেলিয়া দেহকে রক্ষা করে।

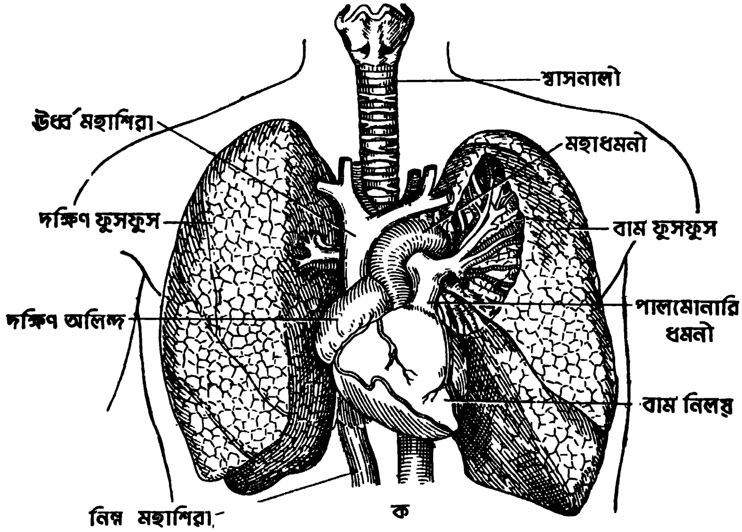
(5) দেহের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে।

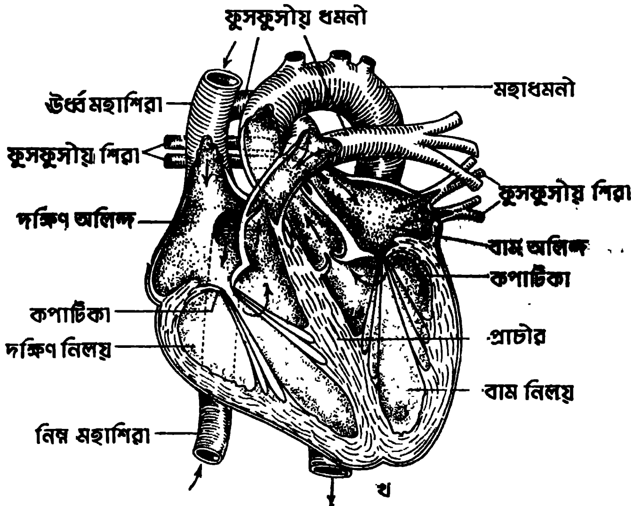
(6) রক্ততঞ্চন ক্ষমতার জন্য অধিক রক্তক্ষরণ হইতে শরীরকে রক্ষা করে।

রক্তসংবহন তন্ত্র (**Circulatory System**)—মানবদেহে রক্তসংবহন তন্ত্র (circulatory system) একটি **হৃৎপিণ্ড** (heart), কতকগুলি **ধমনী** (arteries), **শিরা** (veins), **কৈশিকনালী** বা **জালক** (capillaries) লইয়া

গঠিত। এইগুলির সহায়তায় সমগ্র শরীরের বিভিন্ন অংশে রক্ত সর্বদা সঞ্চালিত হইতেছে

হৃৎপিণ্ড (Heart)—মানবদেহে হৃৎপিণ্ড দিবারাত্র প্রসারিত ও সংকুচিত





(চিত্র 21)

ক—দুইটি ফুসফুসের মধ্যস্থলে হৃৎপিণ্ডের অবস্থান।

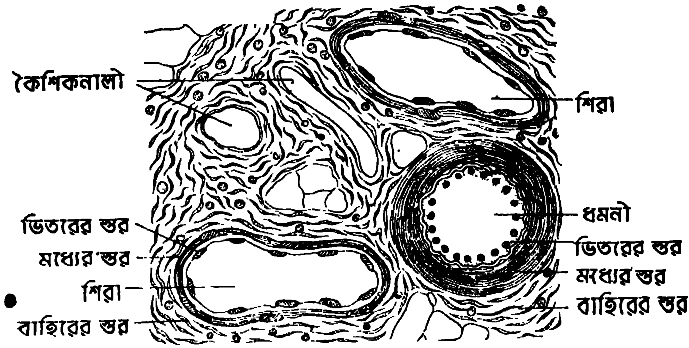
খ—হৃৎপিণ্ডকে লম্বালম্বিভাবে কাটিয়া উহার মধ্য দিয়া রক্তসঞ্চালন দেখান হইয়াছে।

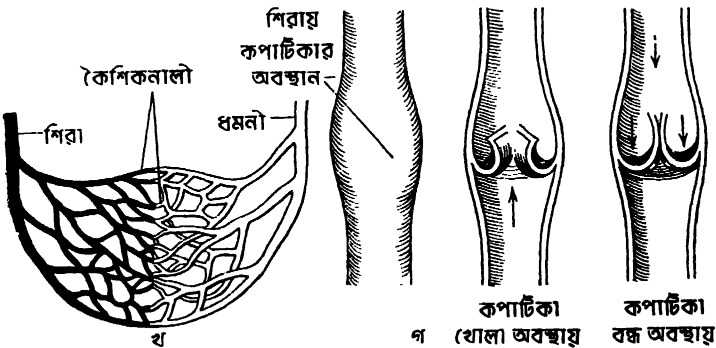
হইয়া একটি পাম্পের ন্যায় কার্য করিতেছে। ইহা বক্ষগহ্বরে দুইটি ফুসফুসের মধ্যবর্তী স্থানে, বাম দিকে অবস্থিত এবং মোটামুটি বক্ষের তৃতীয় পঞ্জরাস্থির নিম্ন হইতে ষষ্ঠ পঞ্জরাস্থির উপর পর্যন্ত বিস্তৃত (চিত্র 21ক)। হৃৎপিণ্ড প্রায় 12·6 সেন্টিমিটার লম্বা, 8·1 সেন্টিমিটার চওড়া ও 6·3 সেন্টিমিটার পুরু। ইহা **হৃদ্ধরা** (pericardium) নামক একটি পাতলা ঝিল্লী দ্বারা আবরিত।

মানুষের হৃৎপিণ্ড অন্যান্য স্তন্যপায়ী জন্তু ও পাখীদের হৃৎপিণ্ডের ন্যায় চারিটি প্রকোষ্ঠে বিভক্ত (চিত্র 21খ)। উপরের দুইটি প্রকোষ্ঠকে দক্ষিণ ও বাম **অলিন্দ** (auricle) এবং নীচের দুইটি প্রকোষ্ঠকে দক্ষিণ ও বাম **নিলয়** (ventricle) বলে। অলিন্দ দুইটি, নিলয় দুইটি অপেক্ষা আকৃতিতে ছোট ও ইহাদের প্রাচীর নিলয়ের প্রাচীর অপেক্ষা পাতলা। নিলয় দুইটির প্রাচীর স্থূল ও পেশীবহুল। অলিন্দ দুইটি নিলয় দুইটির সহিত, কপাটিকা দ্বারা সুরক্ষিত ছিদ্রের দ্বারা সংযুক্ত। ফলে রক্ত কেবল অলিন্দ হইতে নিলয়ে প্রবেশ করিতে পারে, ফিরিয়া যাইতে পারে না।

সমগ্র দেহ হইতে দূষিত রক্ত **ঊর্ধ্ব মহাশিরা** (superior vena cava) এবং **নিম্ন মহাশিরা** (inferior vena cava) দ্বারা বাহিত হইয়া হৃৎপিণ্ডের দক্ষিণ অলিন্দে পড়ে। মহাশিরাগুলি ও দক্ষিণ অলিন্দের সংযোগস্থলে কোন কপাটিকা থাকে না। দক্ষিণ অলিন্দ একটি ছিদ্রের দ্বারা দক্ষিণ নিলয়ের সহিত সংযুক্ত। এই সংযোগ-পথটি একটি তিন কপাটযুক্ত (tricuspid) কপাটিকা দ্বারা সুরক্ষিত। সুতরাং দক্ষিণ অলিন্দ সংকুচিত হইলে দূষিত রক্ত দক্ষিণ নিলয়ে প্রবেশ করে কিন্তু কপাটিকা বন্ধ থাকায় নিলয় হইতে অলিন্দে আসিতে পারে না। দক্ষিণ অলিন্দ হইতে রক্ত মহাশিরা মধ্যে ফিরিয়া যাইতে পারে না কারণ এই শিরাগুলি রক্তপূর্ণ থাকায় ইহাদের মধ্যে চাপ অনেক বেশী থাকে। দক্ষিণ নিলয় হইতে একটি **পালমোনারি** বা **ফুসফুসীয় ধমনী** (pulmonary artery) বাহির হইয়া দুইটি ফুসফুসে গিয়াছে। এই ধমনীর মুখে তিনটি করিয়া অর্ধচন্দ্রাকৃতি (semilunar) কপাটিকা থাকে। দক্ষিণ নিলয় সংকুচিত হইলে দূষিত রক্ত কেবল ধমনী মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে, বাহির হইয়া আসিতে পারে না। বাম অলিন্দে মোট চারিটি **পালমোনারি** বা **ফুসফুসীয় শিরা** (pulmonary vein) ফুসফুস হইতে বিশুদ্ধ রক্ত বহন করিয়া আনে। এই শিরার মুখে কোন কপাটিকা নাই। বাম অলিন্দ, বাম নিলয়ের সহিত যে ছিদ্রের দ্বারা সংযুক্ত তাহাও একটি কপাটিকা (mitral valve) দ্বারা সুরক্ষিত। বাম অলিন্দ সংকুচিত হইলে এই কপাটিকা, বিশুদ্ধ রক্তকে বাম অলিন্দ হইতে বাম নিলয়ে

প্রবেশ করিতে দেয় মাত্র। বাম নিলয় হইতে একটি মোটা ধমনী বাহির হইয়াছে। ইহার নাম **মহাধমনী** (arch of aorta)। ইহার মুখেও তিনটি অর্ধচন্দ্রাকৃতি কপাটিকা আছে। ফলে বাম নিলয় সংকুচিত হইলে, রক্ত মহাধমনী দিয়া সমস্ত শরীরে সঞ্চালিত হয়, মহাধমনী হইতে বিশুদ্ধ রক্ত নিলয়ে ফিরিয়া আসিতে পারে না। হৃৎপিণ্ডে, দক্ষিণ অলিন্দ ও বাম অলিন্দ একসাথে যথাক্রমে দূষিত ও বিশুদ্ধ রক্তে পরিপূর্ণ হয়। অলিন্দ দুইটি একসাথে সংকুচিত হইলে দক্ষিণ বা বাম নিলয় দুইটি যথাক্রমে দূষিত ও বিশুদ্ধ রক্তে পরিপূর্ণ হয়। এখন নিলয় দুইটিও একসঙ্গে সংকুচিত হইলে দূষিত রক্ত পালমোনারি বা ফুসফুসীয় ধমনী এবং বিশুদ্ধ রক্ত মহাধমনী মধ্যে প্রবেশ করে। নিলয় দুইটি সংকুচিত হইবার ফলে অলিন্দ ও নিলয়ের মধ্যবর্তী





(চিত্র 22)

ক—ধমনী, শিরা ও কৈশিকনালীর প্রস্থচ্ছেদ।

খ—কৈশিকনালী।

গ—শিরা মধ্যে রক্তপ্রবাহকালে কপাটিকার অবস্থান।

কপাটিকা দুইটি সজোরে বন্ধ হইয়া যায় এবং **লাব** এই শব্দ উৎপন্ন করে। আবার নিলয় দুইটি হইতে রক্ত, শিরা ও ধমনী মধ্যে প্রবেশ করিবার পর ইহাদের মুখস্থিত কপাটিকাগুলি সজোরে বন্ধ হইবার ফলে **ডাব** এই শব্দটির উৎপত্তি হয়। সুতরাং হৃৎপিণ্ডের সংকোচন কালে **লাব্—ডাব্** এই দুইটি শব্দ পর পর হয়। ইহাদিগকে **হৃৎঘাত** (heart beat) বলে। সাধারণ অবস্থায় হৃৎপিণ্ড মিনিটে 72 বার স্পন্দিত হয়। বুকের উপর কাণ রাখিয়া বা স্টেথোস্কোপ (Stethoscope) যন্ত্রের সাহায্যে এই শব্দ শুনিতে পাওয়া যায়। হৃৎপিণ্ডের অলিন্দ দুইটির সংকোচনকালে নিলয় দুইটি শিথিল থাকে, আবার নিলয় দুইটির সংকোচনকালে অলিন্দ দুইটি শিথিল থাকে। অলিন্দ ও নিলয়ের সংকোচনের পরে সমস্ত হৃৎপিণ্ডটি প্রসারিত হয়। এই প্রসারণ কালে পুনরায় চারিটি প্রকোষ্ঠই রক্তে পরিপূর্ণ হইয়া যায়।

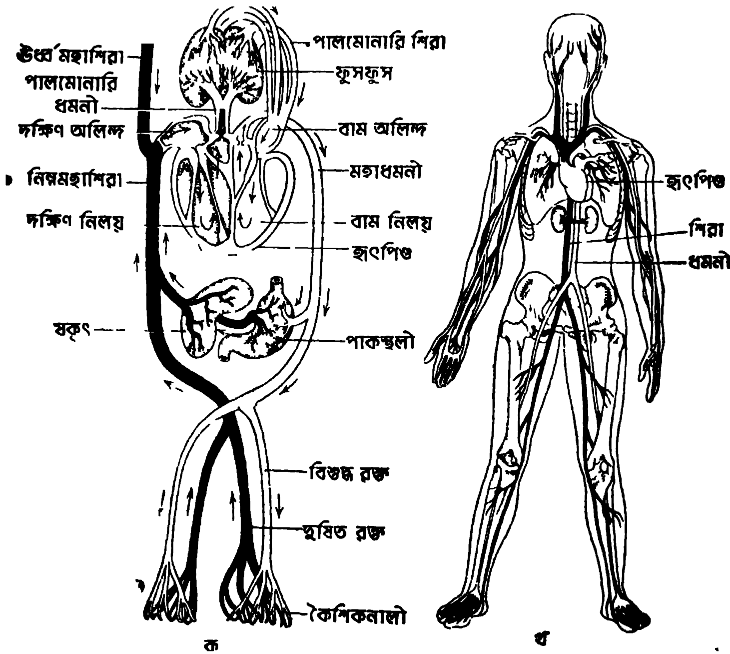
ধমনী (Artery)—যে সকল রক্তবহানালী হৃৎপিণ্ড হইতে নিকটে বা দূরে কলামধ্যে রক্ত বহন করে তাহাদিগকে ধমনী বলে। ধমনীর মধ্য দিয়া সাধারণতঃ বিশুদ্ধ রক্ত প্রবাহিত হয়। কেবলমাত্র পালমোনারি বা ফুসফুসীয় ধমনী (pulmonary artery) দিয়া হৃৎপিণ্ড হইতে দূষিত রক্ত ফুসফুসে যায়। ধমনী গুলির প্রাচীর স্থুল। ইহাতে তিনটি স্তর থাকে (চিত্র 22ক)। বাহিরের স্তর ও ভিতরের স্তর স্থিতিস্থাপক, নমনীয় কলাতন্তু দ্বারা গঠিত। মধ্যের স্তরটি অপেক্ষাকৃত পুরু এবং স্থিতিস্থাপক নমনীয় কলাতন্তু ও শক্ত পেশীতন্তু দ্বারা গঠিত। মানবদেহে মহাধমনী (aorta) পরে বিভিন্ন শাখা ও প্রশাখায় বিভক্ত হইয়াছে। প্রশাখা ধমনীগুলিতে মধ্যস্তরটি বেশী পুরু নহে। ধমনী মধ্যে কোন কপাটিকা নাই।

শিরা (Vein)—যে সমস্ত রক্তবহা নালী কলা হইতে হৃৎপিণ্ডে রক্ত বহন করে তাহাদিগকে শিরা (vein) বলে। শিরার মধ্য দিয়া সাধারণতঃ দূষিত রক্ত প্রবাহিত হয়। কিন্তু পালমোনারি বা ফুসফুসীয় শিরা দিয়া ফুসফুস হইতে বিশুদ্ধ রক্ত হৃৎপিণ্ডে আসে। শিরাগুলির মধ্যে কপাটিকা থাকে, (চিত্র 22গ) ফলে রক্ত কেবল মাত্র একদিকে প্রবাহিত হইতে পারে। শিরার প্রাচীর ধমনীর প্রাচীর অপেক্ষা পাতলা। এই প্রাচীরও তিনটি স্তরযুক্ত (চিত্র 22ক)। স্তরগুলি স্থিতিস্থাপক নমনীয় কলাতন্তু ও শক্ত পেশীতন্তু দ্বারা গঠিত। মধ্যস্তরটি অপেক্ষাকৃত পাতলা। সেইজন্য শিরা অনায়াসেই সংকুচিত হইতে পারে।

কৈশিকনালী (Capillaries)—(চিত্র 22ক, খ) বড় ধমনীগুলি গাছের শাখা প্রশাখার ন্যায় দেহমধ্যে বহু শাখা প্রশাখায় বিভক্ত হয়। প্রশাখা গুলি ক্রমান্বয়ে বিভক্ত হইয়া দেহস্থ কলামধ্যে (ফুসফুস, বৃক্ক, পাকস্থলী ইত্যাদি) অসংখ্য কৈশিকনালী

সৃষ্টি করে। এই নালীর মধ্য দিয়া প্রবাহকালে রক্ত, দেহস্থ কোষ ও তন্তুকে খাদ্য ও অক্সিজেন দান করিয়া ও তথা হইতে অঙ্গারাম্ল গ্রহণ করিয়া দূষিত হয়। কৈশিকনালীর একপার্শ্বে বিশুদ্ধ রক্ত ও অন্যপার্শ্বে দূষিত রক্ত দেখা যায় (চিত্র 22খ)। দূষিত রক্তবাহী কৈশিকনালীগুলি ক্রমান্বয়ে একত্রে মিলিত হইয়া উপশিরা সৃষ্টি করে ও উপশিরাগুলি একত্র সংযুক্ত হইয়া শিরায় পরিণত হয়।

রক্তসংবহন প্রণালী (Circulation of Blood)—(চিত্র 23 ক, খ) লণ্ডনের সেণ্ট বার্থোলোমিউ হাসপাতালের চিকিৎসক **ডাঃ উইলিয়ম হার্ভে**



(চিত্র 23)

ক—রক্ত সঞ্চালন পদ্ধতি।

খ—দেহ মধ্যে হৃৎপিণ্ড, শিরা ও ধমনীর অবস্থান।

(১৬২৮ খৃঃ) প্রথম আবিষ্কার করেন যে মানবদেহে ধমনী ও শিরা নালিকার মধ্য দিয়া রক্ত সংবাহিত হয়। শিরা ও হৃৎপিণ্ডের মধ্যে কপাটিকা থাকার ফলে রক্ত কেবলমাত্র একই দিকে প্রবাহিত হইতে পারে। কিন্তু ধমনী ও শিরা যে কৈশিকনালী (capillaries) দ্বারা সংযুক্ত ইহা ম্যালফিগির (১৬৬১ খৃঃ)

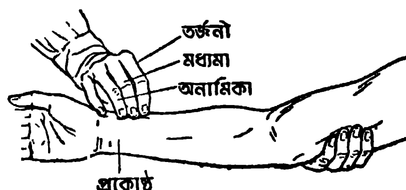
প্রথম আবিষ্কারের পূর্বে অজ্ঞাত ছিল। ইহার পর হইতে আধুনিক কাল পর্যন্ত রক্ত সংবহন সম্বন্ধে অনেক তথ্য আবিষ্কৃত হইয়াছে।

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে হৃৎপিণ্ডে দুইটি অলিন্দ ও দুই নিলয় এই চারিটি প্রকোষ্ঠ আছে (চিত্র 21খ)। সমস্ত শরীর হইতে দূষিত (অঙ্গারাম্ল মিশ্রিত) রক্ত দুইটি মহাশিরা (ঊর্ধ্ব ও নিম্ন) দিয়া হৃৎপিণ্ডের দক্ষিণ অলিন্দে আসিয়া পৌঁছে (চিত্র 23 ক, খ)। ইতিমধ্যে দুইটি ফুস্‌ফুস হইতে বিশুদ্ধ (অক্সিজেন মিশ্রিত) রক্ত বাম অলিন্দে আসিয়া পৌঁছে। দক্ষিণ অলিন্দ ও বাম অলিন্দ প্রায় একই সময়ে সংকুচিত হয়। ফলে দক্ষিণ নিলয় ও বাম নিলয় যথাক্রমে দূষিত ও বিশুদ্ধ রক্তে পরিপূর্ণ হয়। ইহার পর নিলয় দুইটি একত্রে সংকুচিত হয়। এই সংকোচনের ফলে দক্ষিণ নিলয় হইতে রক্ত পালমোনারি বা ফুস্‌ফুসীয় ধমনীর মধ্যে প্রবেশ করে কিন্তু কপাটিকা থাকার জন্য দক্ষিণ অলিন্দে ফিরিয়া যাইতে পারে না। ফুস্‌ফুসীয় ধমনীর মধ্য দিয়া ঐ রক্ত ফুস্‌ফুসে আসে। তথায় ফুস্‌ফুসীয় ধমনী অসংখ্য কৈশিকনালীতে বিভক্ত হইয়া জালকের সৃষ্টি করে এবং পুনরায় ঐ জালিকা নালীগুলি মিলিত হইয়া পালমোনারি বা ফুস্‌ফুসীয় শিরার সৃষ্টি করে। রক্ত এই জালিকার মধ্য দিয়া প্রবাহকালে অঙ্গারাম্ল গ্যাস পরিত্যাগ করিয়া ও অক্সিজেন গ্যাস গ্রহণ করিয়া বিশুদ্ধ হয়। বিশুদ্ধ রক্ত কৈশিকনালী হইতে ফুস্‌ফুসীয় শিরার মাধ্যমে হৃৎপিণ্ডের বাম অলিন্দে ফিরিয়া আসে। এই রক্ত প্রবাহকে **ফুসফুসীয় রক্তসংবহন** (Pulmonary circulation) বলা হয়।

বাম নিলয় সংকুচিত হইলে বিশুদ্ধ রক্ত, কপাটিকা থাকার জন্য বাম অলিন্দে ফিরিয়া যাইতে পারে না, উহা মহাধমনীর মধ্যে প্রবেশ করে। মহাধমনীর মুখে অর্ধচন্দ্রাকৃতি কপাটিকা থাকায় এই রক্ত ধমনী হইতে নিলয়ে ফিরিয়া আসিতে পারে না। বিশুদ্ধ রক্ত ধমনীর মধ্য দিয়া বেগে প্রবাহিত হয়। মহাধমনী শরীরের মধ্যে শাখা প্রশাখায় বিভক্ত হয়। এই প্রশাখাগুলি পেশীকলার মধ্যে কৈশিক নালীতে বিভক্ত হইয়া জালিকার সৃষ্টি করে। ইহার মধ্য দিয়া প্রবাহকালে রক্ত মধ্যস্থ অক্সিজেন গ্যাস ও খাদ্যদ্রব্য লসিকার মাধ্যমে দেহকোষগুলিতে পরিবেশিত হয়। তথা হইতে বিপাকের ফলে উদ্ভূত অঙ্গারাম্ল গ্যাস লসিকার মাধ্যমে রক্তের মধ্যে প্রবেশ করিয়া উহাকে দূষিত করে এবং ঐ দূষিত রক্ত কৈশিকনালী হইতে উপশিরা, শিরা এবং মহাশিরা দিয়া হৃৎপিণ্ডের দক্ষিণ অলিন্দে ফিরিয়া আসে। এই রক্ত প্রবাহকে **সিস্টেমিক রক্ত সংবহন** (Systemic circulation) বলে। এই ভাবে দিবারাত্র রক্ত আবর্তিত হইতে থাকে। এই আবর্তন একবার

সম্পূর্ণ হইতে 0·8 সেকেণ্ড সময় লাগে। অতএব প্রতি মিনিটে প্রায় 72 বার করিয়া এই আবর্তন সংঘটিত হয়। সেইজন্য হৃৎপিণ্ড প্রতি মিনিটে প্রায় 72 বার স্পন্দিত হয়।

নাড়ীঘাত (Pulse beat)—হৃৎপিণ্ডের সংকোচন ও প্রসারণের ফলে ধমনীর মধ্যে রক্তের চাপ বেশী বা কম হয়। ধমনী প্রাচীরে, স্থিতিস্থাপক তন্তু থাকায় উহা হৃৎস্পন্দনেব তালে তালে নিয়মিত ভাবে প্রসারিত ও সংকুচিত হইতে থাকে। ধমনীর এই প্রসারণ ও সংকোচনকে **নাড়ীঘাত** (pluse beat) বলা হয়। এই স্পন্দন ধমনীর উপর আঙ্গুল রাখিয়া অনুভব করা যায়। চিকিৎসকগণ তর্জনী, মধ্যমা ও অনামিকা অঙ্গুলী তিনটি, প্রকোষ্ঠের (wrist) সম্মুখভাগে **রেডিয়াল** (radial) ধমনীর উপর স্থাপন করিয়া ও ঈষৎ চাপ দিয়া নাড়ীর স্পন্দন অনুভব



(চিত্র 24)
নাড়ীঘাত অনুভব করিবার পদ্ধতি।

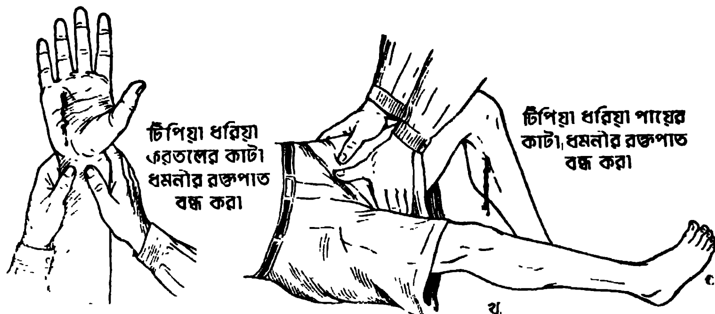
করেন (চিত্র 24)। নাড়ীঘাতের সংখ্যা ও হৃৎস্পন্দনের সংখ্যা সমান। সেইজন্য নাড়ীঘাতের সংখ্যা গণনা করিয়া প্রতি মিনিটে হৃৎস্পন্দন নির্ণয় করা যায়। নাড়ীঘাত অনুভব করিয়া কিরূপ বেগে রক্ত ধমনী মধ্যে প্রবাহিত হইতেছে তাহা বুঝিতে পারা যায়। নাড়ীঘাত অনিয়মিত হইলে বুঝিতে হইবে যে হৃৎপিণ্ডও অনিয়মিত ভাবে স্পন্দিত হইতেছে। নাড়ীঘাতকে বন্ধ করিতে যে পরিমাণ চাপ লাগিতেছে তাহা হইতে রক্তের আনুমানিক চাপ নির্ণয় করা যায়।

রক্তপাত ও প্রাথমিক চিকিৎসা (Bleeding and first aid) :

শরীরের কোন অংশ ধারাল অস্ত্রশস্ত্র, কাঁচ ইত্যাদিতে কাটিয়া গেলে রক্ত বাহির হইতে থাকে। অধিক রক্তক্ষরণ দেহের পক্ষে বিপজ্জনক। অতিরিক্ত রক্তপাত হইলে ও সময়ে উহা বন্ধ করিতে না পারিলে মৃত্যু পর্যন্ত হওয়া অসম্ভব নহে। ইহা ব্যতীত ঐ কাটা জায়গা দিয়া বাহির হইতে রোগজীবাণু শরীর মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে। সুতরাং কোন স্থান কাটিয়া গেলে তৎক্ষণাৎ রক্তপ্রবাহ বন্ধ করিতে তৎপর হওয়া উচিত। শিরা কাটিয়া গেলে রক্ত ধীরে ধীরে এবং

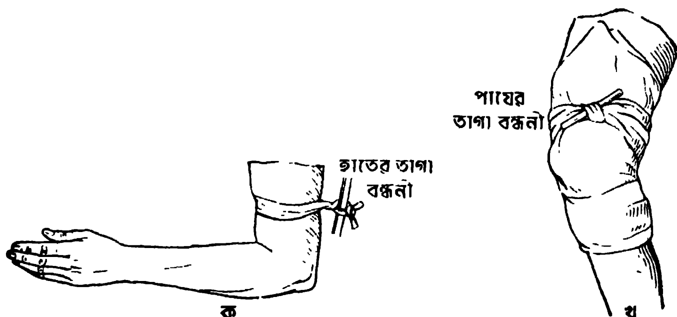
একটানা শরীর হইতে নির্গত হয়, কিন্তু কাটা গভীর হইলে ধমনী কাটিয়া গিয়া রক্ত বেগে ফিন্‌কি দিয়া, ঝলকে ঝলকে বাহির হইতে থাকে।

অল্প কাটিয়া গেলে ক্ষতস্থান ভালভাবে পরিষ্কার করিয়া, প্রয়োজন হইলে পরিষ্কার জলে ধুইয়া উহার উপর টিংচার আয়োডিন, টিংচার বেঞ্জিন, বেনজয়িডিন, ডেটল বা অন্য কোন জীবাণু নিবারক (antiseptic) ঔষধ লাগাইয়া দেওয়া



চিত্র 25
টিপিয়া ধরিয়া রক্তপাত বন্ধ করা। (ক) করতলের রক্তপাত বন্ধ করা, (খ) পায়ের রক্তপাত বন্ধ করা।

উচিত। পরে ঐ ক্ষতস্থান একটি পরিষ্কার লম্বা কাপড়ের টুকরা বা ব্যাণ্ডেজ দিয়া বাঁধিয়া দেওয়া উচিত। ক্ষতস্থানে নিজ হইতে রক্ত জমিয়া গেলে ঐ জমা রক্তের চাপ তুলিয়া ফেলা উচিত নহে। ক্ষত বেশী হইলে ঐ



চিত্র 26
তাগা বন্ধনীর সাহায্যে রক্তপাত বন্ধ করা। (ক) হাতের, (খ) পায়ের।

স্থান, কাপড় ভাঁজ করিয়া বা তুলা দিয়া চাপিয়া ধরিলে রক্ত বন্ধ হইয়া যায়। ধমনী বা শিরা কাটিয়া অধিক রক্তপাত হইলে উহাদিগকে চাপিয়া

ধরিয়া (চিত্র 25 ক, খ) বা তাগাবন্ধনী (tourniquet) (চিত্র 26 ক, খ) বাঁধিয়া রক্তপাত বন্ধ করা যায়। শিরা কাটিয়া রক্তপাত হইলে ক্ষতস্থানের নীচে এবং ধমনী কাটিয়া গেলে ক্ষত স্থানের উপরে অর্থাৎ হৃৎপিণ্ডের দিকে একটি বন্ধনী বাঁধিয়া দিতে হয়। ইহাকে **তাগাবন্ধনী** (চিত্র 26 ক, খ) বলে। এই বন্ধনীর মধ্য দিয়া একটি শক্ত কাঠি প্রবেশ করাইয়া পাক দিলে বন্ধনী ক্রমশঃ শক্ত হইয়া ধমনী বা শিরাকে চাপিয়া রক্তপাত বন্ধ করিয়া দেয়। পরে কাঠিটি ঐ অবস্থায় রাখিয়া অপর একটি ব্যাণ্ডেজ দিয়া উহা বাঁধিয়া দিতে হয়। এইভাবে রক্তপাত বন্ধ করিবার পর ক্ষতস্থানে কোন দূষিত পদার্থ থাকিলে উহা ভাল করিয়া জলে ধুইয়া পূর্বোক্ত কোন জীবাণু নিবারক (antiseptic) ঔষধের প্রলেপ লাগাইয়া দিতে হয়। উহার উপর একটি পরিষ্কার ড্রেসিং দিয়া তাহার উপর তুলা দিয়া ব্যাণ্ডেজ দ্বারা বাঁধিয়া দিতে হয়। প্রাথমিক সাহায্যের পর, চিকিৎসকের সাহায্য লওয়া প্রয়োজন। তাঁহার পরামর্শমত প্রয়োজন হইলে জীবাণু নিরোধক **অ্যাণ্টি-টিটেনাস** (Anti-tetanus) ইনজেকসন্ লওয়া উচিত।

প্রশ্নাবলী

1. রক্ত কাহাকে বলে ? ইহার উপাদান ও কার্য কি কি ?

2. রক্ততঞ্চন বলিতে কি বুঝ ? কি করিয়া রক্ততঞ্চন হয় ? মানবদেহে ইহার উপকারিতা কি ?

3. হৃৎপিণ্ড, শিরা, ধমনী, কৈশিকনালী ও নাড়ীঘাত সম্বন্ধে যাহা জান লিখ।

4. রক্তসংবহন প্রণালী সংক্ষেপে বর্ণনা কর।

5. রক্তপাতের প্রাথমিক চিকিৎসা কি ? তাগাবন্ধনী কাহাকে বলে ? ইহার সাহায্যে কি করিয়া রক্তপাত বন্ধ করা যায়।

6. শূন্যস্থান পূর্ণ কর :—

রক্ততঞ্চন কালে থ্রম্বোপ্লাস্টিন, রক্তস্থ——সংযোগে, রক্তমধ্যস্থ——কে ——পরিণত করে। উহা——কে ফাইব্রিনে পরিবর্তিত করে। ফাইব্রিন—— গুলির সাথে জড়াইয়া যায়, ফলে রক্ত জমাট বাঁধে।

7. শুদ্ধ (✓) অথবা ভুল (×) চিহ্ন দ্বারা পার্শ্বে চিহ্নিত কর :—

(a) নাড়ীঘাতের সংখ্যা ও হৃৎস্পন্দনের সংখ্যা প্রতি মিনিটে সমান।

(b) মহাধমনী ও ফুসফুসীয় ধমনীর মধ্য দিয়া একই প্রকার রক্ত প্রবাহিত হয়।

(c) হৃৎপিণ্ডের অলিন্দ দুইটিতে কেবল বিশুদ্ধ রক্ত ও নিলয় দুইটিতে কেবল দূষিত রক্ত থাকে।

(d) শ্বেত ও লোহিত উভয়প্রকার রক্তকণিকায় নিউক্লিয়াস থাকে।

(e) শিরা হইতে রক্তপাত বন্ধ করিতে হইলে কাটা স্থানের নিম্নে তাগাবন্ধনী বাঁধিতে হয়।

(f) কৈশিক নালীর এক পার্শ্বে দূষিত ও অপর পার্শ্বে বিশুদ্ধ রক্ত থাকে।

8. বন্ধনীর মধ্যে লিখিত অশুদ্ধটি কাটিয়া দাও :—

অনুচক্রিকা রক্ততঞ্চনে সাহায্য (করে, করে না)। হৃৎপিণ্ডে নিলয় দুইটি পরস্পর (সংযুক্ত, সংযুক্ত নহে)। রক্ততঞ্চনের পর যে হলুদ বর্ণের তরল পদার্থ পড়িয়া থাকে তাহাকে (রক্তমস্তু, লসিকা) বলে।

দ্বাবিংশ অধ্যায়

পাচন তন্ত্র বা পরিপাক তন্ত্র (Digestive System)

জীবন ধারণের জন্য আমরা বিভিন্ন প্রকার কাজ করিয়া থাকি। কাজ করিবার জন্য শক্তি (energy) প্রয়োজন। খাদ্য হইতে আমরা এই শক্তি লাভ করিয়া থাকি। নানাপ্রকার কাজ করার জন্য আমাদের শরীর নিয়ত ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। এই ক্ষয় পূরণের জন্য খাদ্যের প্রয়োজন। ইহা ব্যতীত শরীরের পুষ্টি ও বৃদ্ধিসাধন, দেহের উত্তাপ সংরক্ষণ ও রোগ-প্রবণতা নিরোধের জন্যও খাদ্যের আবশ্যক। আমাদের খাদ্যের মধ্যে **আমিষ জাতীয়** (protein), **শর্করা জাতীয়** (carbohydrate), **স্নেহ বা চর্বিজাতীয়** (fat) দ্রব্য এবং **ভাইটামিন** (vitamin) ও **খনিজ লবণ** থাকে। কিন্তু এইগুলিকে দেহের মধ্যে গ্রহণ করিতে হইলে ইহাদের সরলতম অবস্থায় পরিবর্তিত করিতে হয়। আমাদের শরীরের মধ্যে কতকগুলি গ্রন্থিনিঃসৃত নানাপ্রকার **জারক রস** (digestive juices) ও **উৎসেচক** (enzymes) খাদ্যদ্রব্যকে পরিপাক করে অর্থাৎ ইহাদিগকে ভাঙ্গিয়া সরল অবস্থায় পরিবর্তিত করে। এই পরিবর্তিত সরলতম

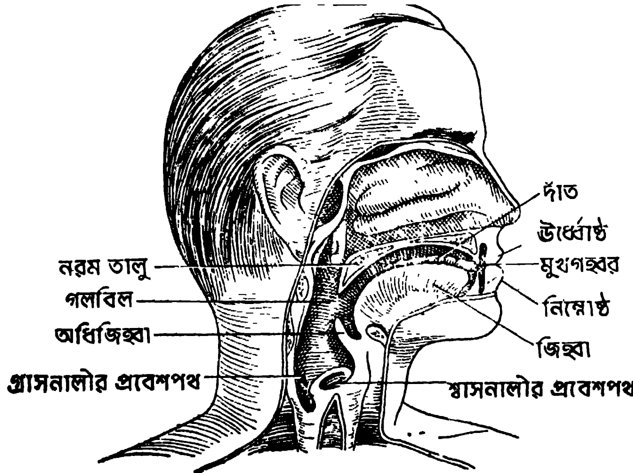
খাদ্য আমাদের রক্তের মধ্যে শোষিত হয়। পরে শ্বাসক্রিয়ার সাহায্যে দহনকার্য সাধিত হইলে উহা শক্তি ও পুষ্টি দান করে। দেহের যে তন্ত্রের মধ্যে খাদ্য পরিপাক হয় অর্থাৎ জটিলতম অবস্থা হইতে সরলতম অবস্থায় পরিবর্তিত হয় তাহাকে **পাচনতন্ত্র** বা **পরিপাক তন্ত্র** বলে।

এই পরিপাক তন্ত্র একটি **পৌষ্টিক নালী** (alimentary canal) ও কতকগুলি **জারক রস নিঃসরণকারী গ্রন্থি** (digestive glands) লইয়া গঠিত।

পৌষ্টিক নালীটি পেশীবহুল এবং প্রায় ত্রিশ হইতে বত্রিশ ফুট (9·74 মিটার) (চিত্র-30) দীর্ঘ।

ইহা **মুখ** (mouth), **জিহ্বা** (tongue), **গলবিল** (pharynx), **গ্রাসনালী** (oesophagus), **পাকস্থলী** (stomach), **ক্ষুদ্রান্ত্র** (small intestine) ও **বৃহদন্ত্র** (large intestine) এই কয় অংশে বিভক্ত।

মুখ ও মুখগহ্বর (mouth and buccal cavity)—(চিত্র-27) মুখছিদ্রের উপরে ও নিম্নে দুইটি **ওষ্ঠ** (lips) বর্তমান। এই দুইটি পেশীবহুল ও নরম। ইহাদিগকে আমরা ইচ্ছামত নানা ভঙ্গীতে ঘুরাইতে ফিরাইতে পারি এবং



চিত্র 27

মুখগহ্বর ও পৌষ্টিক নালীর প্রথমাংশ। (পার্শ্ব হইতে দেখান হইয়াছে)

ইহাদের সাহায্যে আমরা মুখছিদ্রকে সূচাল বা বন্ধ করিতে পারি। মুখছিদ্রের পরের অংশ **মুখগহ্বর**। মুখগহ্বরের ছাদটিকে **তালু** বলে। এই অংশ শক্ত। ইহার পশ্চাৎ ভাগের নরম অংশকে **নরম তালু** (soft palate) বলা

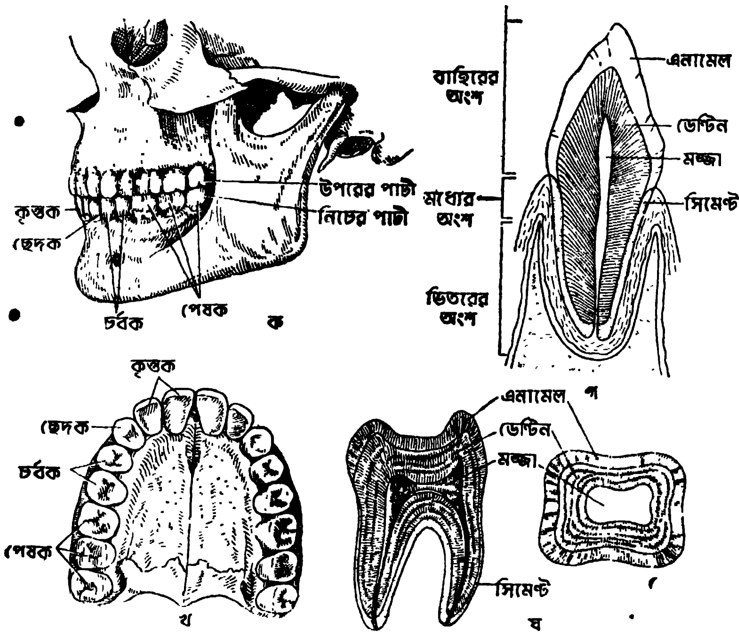
হয়। মুখগহ্বরের তলে একটি মাংসল জিহ্বা আছে। জিহ্বার পশ্চাৎভাগ আটকান ও সম্মুখভাগ খোলা। মুখগহ্বর উপরে ও নীচে দুইটি চোয়াল দ্বারা সুরক্ষিত। উপরের ও নীচের চোয়ালে দুইশ্রেণী দন্ত আছে। ইহাদের দ্বারা খাদ্য দ্রব্যগুলি কর্তিত, চর্বিত ও পিষ্ট হয়। মুখগহ্বরের পশ্চাদ্ভাগের নাম **গলবিল** (pharynx)। গলবিলের নিম্নভাগ, দুইটি নালীতে বিভক্ত। সম্মুখের দিকের নালীটির নাম **শ্বাসনালী** (trachea)। ইহা দুইটি ফুসফুসের সহিত সংযুক্ত। শ্বাসনালীর পশ্চাদ্দভাগে গলবিলের সহিত সংযুক্ত নালীটির নাম **গ্রাসনালী** (oesophagus)। ইহার মধ্যদিয়া চর্বিত খাদ্যদ্রব্য ভিতরে যায়। জিহ্বার পশ্চাতে শ্বাসনালী-ছিদ্রের ঠিক উপরে ঢাকনির ন্যায় একটি মাংসপিণ্ড আছে। ইহাকে **অধিজিহ্বা** (epiglottis) বলে। গ্রাসনালী দিয়া খাদ্য যাইবার কালে অধিজিহ্বা শ্বাসনালী-ছিদ্রকে বন্ধ করিয়া রাখে। তালুর পিছনে নোলকের ন্যায় একটি মাংসপিণ্ড ঝুলিতে দেখা যায় ; উহাকে **আলজিভ** বলে।

মুখগহ্বরের মধ্যে তিন জোড়া **লালাগ্রন্থি** (salivary gland) আছে। কর্ণদ্বয়ের নিকটবর্তী এক জোড়া **প্যারটিড** (parotid) গ্রন্থি, নিম্ন চোয়ালের নিকটবর্তী এক জোড়া **সাব ম্যাক্সিলারী** (submaxillary) গ্রন্থি এবং জিহ্বার তলে অবস্থিত এক জোড়া **সাবলিঙ্গুয়াল** (sublingual) গ্রন্থি। এই তিন জোড়া গ্রন্থি হইতে চর্বণের সময় মুখগহ্বরের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে লালা নিঃসৃত হয়। লালা মিশ্রিত খাদ্য নরম ও পিচ্ছিল হওয়ায় উহা সহজেই গিলিতে পারা যায়।

দন্ত (Teeth)—মানুষের সাধারণতঃ দুই প্রস্থ দন্ত উদ্গম হয়। প্রথম প্রস্থ, জন্মাইবার প্রায় আট দশমাস পরে, শৈশবে বাহির হয়। ইহাদিগকে **দুগ্ধ দন্ত** (temporary or deciduous) বলে। দুগ্ধ-দন্ত সংখ্যায় কুড়িটি হইয়া থাকে। পরে ঐ দন্ত পড়িয়া গিয়া নূতন **স্থায়ী দন্ত** (permanent) বাহির হয়। একটি পূর্ণবয়স্ক মানুষের প্রতি চোয়ালে ষোলটি করিয়া মোট বত্রিশটি স্থায়ী দন্ত থাকে (চিত্র 28 ক)। দন্তগুলি বিভিন্ন আকৃতির (চিত্র 28 ক, খ) ও বিভিন্ন প্রকার কার্য সম্পন্ন করে। প্রত্যেক চোয়ালের সামনের দিকে চারিটি **কৃন্তক দন্ত** (incisor) থাকে। এইগুলি কর্তনকারী দন্ত। ইহারা চওড়া ও কোদালের ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট। ইহার দুইপাশে দুইটি **ছেদক দন্ত** (canine) আছে। এই দুইটি দন্ত কুকুরের দন্তের ন্যায় সুচাল ও খাদ্যদ্রব্য ছিঁড়িবার কার্যে ব্যবহৃত হয়। সেইজন্য এই দুইটিকে 'শ্ব-দন্ত' ও বলে। ইহার পরে দুই পাশে দুইটি করিয়া **চর্বক**

দন্ত (premolar) থাকে। এইগুলি খাদ্য চর্বন কার্যে ব্যবহৃত হয়। ইহারা দুইটি উচ্চ পাড় বিশিষ্ট। চর্বক দন্তের পরে দুই পাশে তিনটি করিয়া **পেষক দন্ত** (molar) আছে। প্রতিটি পেষক দন্ত চারিটি করিয়া পাড় বিশিষ্ট। ইহারা খাদ্যদ্রব্য পিষিয়া নরম করিবার কার্যে ব্যবহৃত হয়।

প্রত্যেকটি দন্ত তিনটি অংশ লইয়া গঠিত (চিত্র 28)। বাহিরের অংশ মাড়ীর বাহিরে, মধ্যের অংশ মাড়ীর মধ্যে ও ভিতরের অংশ চোয়ালের হাড়ের মধ্যে থাকে। বাহিরের অংশ **এনামেল** (enamel) নামক একটি উজ্জ্বল সাদা পদার্থ দ্বারা গঠিত, ভিতরের অংশ বা শিকড় **ডেণ্টিন** (dertine বা ivory) দ্বারা তৈয়ারী। এনামেল ও ডেণ্টিনে ক্যালসিয়াম ফসফেট ও কার্বনেট যথেষ্ট থাকায় দন্ত কঠিন



চিত্র 28

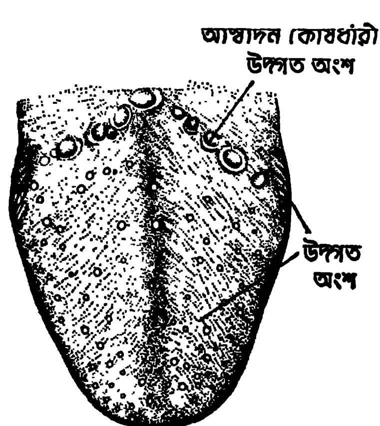
দন্ত। (ক) ঊর্ধ্ব ও নিম্ন চোয়ালে বিভিন্নপ্রকার দন্তের অবস্থান পার্শ্ব হইতে দেখান হইয়াছে। (খ) ১৬টি দন্তবিশিষ্ট উপরের চোয়াল। (গ) একটি চর্বক দন্তের দীর্ঘচ্ছেদ। (ঘ) একটি পেষক দন্তের দীর্ঘ ও প্রস্থচ্ছেদ।

হয় ও সহজে ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না। প্রত্যেক দন্ত চোয়ালের **হাড়ের গর্তের** (socket) মধ্যে **সিমেণ্ট** দ্বারা আটকান থাকে। দন্তের অন্তস্থিত ফাঁকা

স্থানকে দন্তের **মজ্জা** (pulp) বলে। উহার মধ্যে দন্তের স্নায়ুতন্তু ও রক্তনালী থাকে।

দন্তের সাহায্যে খাদ্যদ্রব্য চর্বিত ও পিষ্ট হইয়া ছোট ছোট অংশে বিভক্ত হয়। ফলে জারক রস ও উৎসেচক উহাদিগকে ভালভাবে পরিপাক করিতে পারে।

জিহ্বা (Tongue)—ইহা মুখগহ্বরের তলে অবস্থিত একটি মাংসল অঙ্গ (চিত্র 29)। সমস্ত জিহ্বাটি সূক্ষ্ম মিউকাস ঝিল্লি দ্বারা আবরিত। জিহ্বা স্বাদগ্রহণ ও কথাবলা এই দুই কাজে অংশ গ্রহণ করে। ইহার উপরিভাগে অসংখ্য ছোট ছোট উদ্গত অংশ থাকে। এইজন্য জিহ্বাটি খস্‌খসে। জিহ্বার সম্মুখভাগ খোলা ও পশ্চাদ্ভাগ আটকানো। দেখিতে অনেকটা ছোরার ন্যায়। জিহ্বার উপরিভাগে অসংখ্য **আস্বাদন কোষ** (test bud) আছে। এই আস্বাদন কোষগুলির সাহায্যে জিহ্বা অম্ল, মিষ্ট, তিক্ত ও লবণাক্ত স্বাদগুলি বুঝিতে পারে। মিষ্টস্বাদ জিহ্বার অগ্রভাগের দ্বারা, অম্ল স্বাদ পার্শ্বের দ্বারা এবং তিক্ত স্বাদ পশ্চাদ্ভাগের দ্বারা অনুভূত হয়।

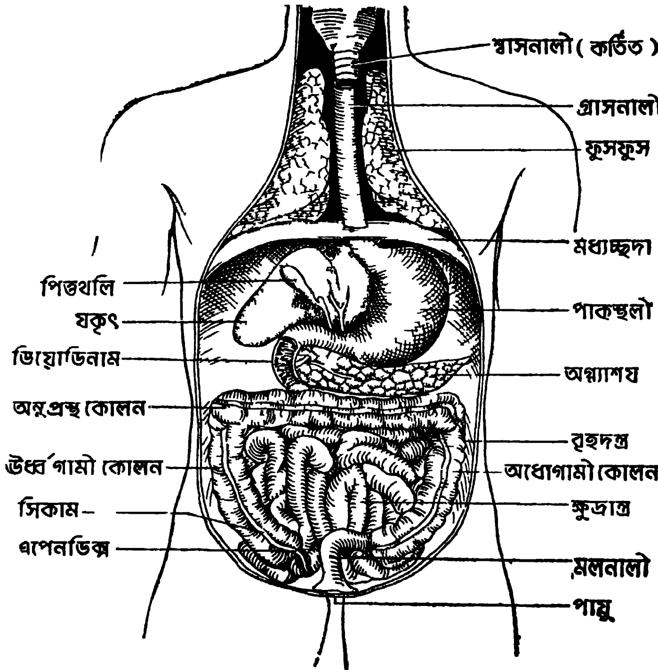


চিত্র 29
জিহ্বা

গ্রাসনালী (Oesophagus or Gullet)—এই নালীটি গলবিলের নিম্নাংশ হইতে কণ্ঠের মধ্য দিয়া বক্ষগহ্বরে প্রবেশ করিয়াছে। ইহা প্রায় নয় ইঞ্চি দীর্ঘ এবং **শ্বাসনালীর** (larynx) পিছনে অবস্থিত (চিত্র 27, 30)। বক্ষগহ্বর ও উদর-গহ্বরের মধ্যস্থিত **মধ্যচ্ছদা** (diaphragm) ভেদ করিয়া উহা উদর-গহ্বরে প্রবেশ করিয়াছে। উদর-গহ্বরে উহা পাকস্থলীর সহিত সংযুক্ত হইয়াছে। পাকস্থলী ও গ্রাসনালীর সংযোগস্থলে কতকগুলি পেশী সংকুচিত থাকিয়া ঐ মুখকে বন্ধ করিয়া রাখে। খাদ্যদ্রব্য গ্রাসনালীতে প্রবেশ করিলে উহা গ্রাসনালীর সংকোচনের ফলে ঐ সংকুচিত পেশীর মধ্য দিয়া পাকস্থলীতে প্রবেশ করে। সুতরাং ঐ সংকুচিত স্থান একটি কপাটিকার কাজ করিতেছে।

পাকস্থলী (Stomach, চিত্র 30)—পাকস্থলী একটি বাঁকা থলির আকার বিশিষ্ট। ইহা দেখিতে অনেকটা বাঙ্গলা '৫' এই সংখ্যাটির মত। ইহা দৈর্ঘ্যে

প্রায় এক ফুট ও প্রস্থে 4 হইতে 5 ইঞ্চি। পাকস্থলী মধ্যচ্ছদার নিম্নে, উদর-গহ্বরের বাম অংশে অবস্থিত। সাধারণতঃ পাকস্থলী সংকুচিত অবস্থায় থাকে। ইহার মধ্যে খাদ্যদ্রব্য প্রবেশ করিলে ইহা ফুলিয়া উঠে। একসঙ্গে প্রায় 3-4 কিলোগ্রাম অন্নপানীয় ইহার মধ্যে থাকিতে পারে। পাকস্থলী, উপরের দিকে গ্রাসনালী ও নীচের দিকে ক্ষুদ্রান্ত্রের (small intestine) সহিত সংযুক্ত। পাকস্থলীকে মোটামুটি তিন অংশে বিভক্ত করা যায়। ইহার যে অংশ গ্রাসনালীর সহিত সংযুক্ত তাহাকে **কার্ডিয়াক অংশ** বা **আগম দ্বার** (*cardiac end*), যে অংশ ক্ষুদ্রান্ত্রের সহিত সংযুক্ত তাহাকে **পাইলোরিক অংশ** বা **নিগম দ্বার** (pyloric end), ও এই দুই অংশের মধ্যবর্তী স্ফীত অংশকে **ফণ্ডাস** বা



চিত্র 30

পরিপাক তন্ত্র, (গ্রাসনালী হইতে দেখান হইয়াছে)

পাকস্থলীস্কন্ধ (fundus) বলা হয়। পাইলোরিক অংশ ও ক্ষুদ্রান্ত্রের সংযোগস্থল সংকুচিত। ইহাকে পাইলোরিক দ্বার বলে। পাকস্থলীর ভিতরের গাত্র মসৃণ নহে। বহু লম্বালম্বি খাঁজবিশিষ্ট ও রন্ধ্রময়। রন্ধ্রগুলি **জারকরস**

নিঃসরণকারী নালীগুলির মুখ। পাকস্থলীর প্রাচীর পেশীবহুল। এই পেশীগুলির সংকোচন ও প্রসারণের ফলে ইহা অনবরত সংকুচিত ও প্রসারিত হইতেছে। এই সংকোচন পাকস্থলীর উপরের দিক হইতে আরম্ভ করিয়া ঢেউএর ন্যায় নীচের দিকে নামিয়া আসে। ইহাকে **পেরিস্টলসিস** (paristalsis) ক্রিয়া বলে। এই ক্রিয়ার দ্বারা পাকস্থলীর মধ্যে জারিত খাদ্য থকথকে মণ্ডে পরিণত হয় এবং একটু একটু করিয়া পাইলোরিক দ্বার ঠেলিয়া ক্ষুদ্রান্ত্রে পৌছে।

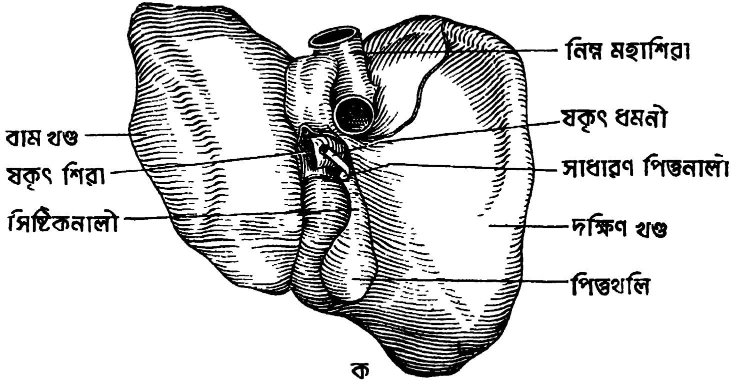
ক্ষুদ্রান্ত্র (small intestine)—ক্ষুদ্রান্ত্র একটি ফাঁপা সরু এবং কুণ্ডলীকৃত নালী। সর্বসমেত ইহা প্রায় কুড়ি ফুট দীর্ঘ। এই নালীর মধ্যে পরিপাক ক্রিয়ার বেশী অংশ সম্পন্ন হয় এবং পরিপাক অন্তে খাদ্যবস্তু রক্তে শোষিত হয়। ক্ষুদ্রান্ত্রকে মোটামুটি তিন ভাগে ভাগ করা যায় (চিত্র 30)। (ক) ইহার প্রথমাংশ **ডিয়োডিনাম** (duodenum), পাকস্থলীর পশ্চাৎ দেশের সহিত সংযুক্ত। ইহা মাত্র নয় ইঞ্চি লম্বা এবং দেখিতে অনেকটা ইংরেজী '*C*' অক্ষরের ন্যায়। ইহার ক্রোড়ে অগ্ন্যাশয় (pancreas) অবস্থিত। যকৃৎ (liver) ও অগ্ন্যাশয় হইতে দুইটি নালী একত্র মিলিত হইয়া ডিয়োডিনামে পড়িয়াছে। (খ) ডিয়োডিনামের পরে ক্ষুদ্রান্ত্রের যে অংশ উপর দিকে উঠিয়া গিয়াছে তাহাকে **জেজুনাম** (jejunum) বলে। ইহা প্রায় আট ফুট দীর্ঘ। (গ) জেজুনামের পরে ক্ষুদ্রান্ত্রের প্রায় এগার ফুট অংশকে **ইলিয়াম** (ileum) বলে। ক্ষুদ্রান্ত্রের গাত্রে অসংখ্য গ্রন্থি হইতে একপ্রকার জারকরস নিঃসৃত হয়। ইহাকে **আন্ত্রিক রস** (succus entericus) বলে। ইহার ভিতরের গাত্রে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম শুঁয়ার মত অনেক **শোষণ যন্ত্র** (villus) আছে। ইহাদের সাহায্যে জীর্ণ খাদ্য শোষিত হইয়া রক্তনালীর মধ্যে প্রবেশ করে।

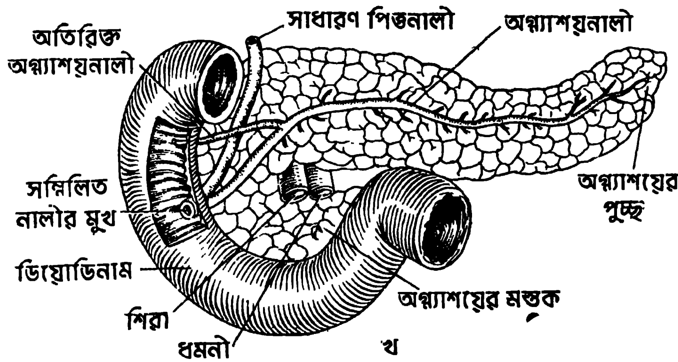
বৃহদন্ত্র (Large intestine)—ইহা প্রায় ছয় ফুট লম্বা একটি মোটা নালী ও ক্ষুদ্রান্ত্রের সহিত সংযুক্ত (চিত্র 30)। এই বৃহদন্ত্র **সিকাম** (secum), **কোলন** (colon), **মলভাণ্ড** (rectum) ও **পায়ু** (anus) এই চারিটি অংশে বিভক্ত।

সিকাম বৃহদন্ত্রের প্রথম ভাগ ও একটি থলি বিশেষ। ক্ষুদ্রান্ত্র ও সিকামের মুখে গোলাকার পেশীদ্বারা সুদৃঢ় একটি কপাটিকা আছে। ইহাকে **ইলিওসিকাল কপাটিকা** (ileocecal valve) বলে। ফলে ইলিয়াম হইতে সিকামে খাদ্যরস যায় কিন্তু ফিরিয়া আসিতে পারে না। সিকামের বদ্ধ অংশে একটি সরু **এপেণ্ডিক্স** (appendix) আছে। সিকামের পরের অংশ **কোলন** (colon)। ইহা **ঊর্ধ্বগামী কোলন** (ascending colon), **অনুপ্রস্থ কোলন** (transverse

colon) ও **অধোগামী কোলন** (descending colon) এই তিন অংশে বিভক্ত। কোলনের পরের অংশকে **মলভাণ্ড** (rectum) ও বৃহদন্ত্রের শেষ ছিদ্রকে **পায়ু** (anus) বলে। মল নির্গমন কালে উহা প্রসারিত হয়।

যকৃৎ (Liver)—যকৃৎ দেহের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বড় গ্রন্থি (চিত্র 31 ক)। ইহা ওজনে প্রায় দেড় সের (1400 হইতে 1600 গ্রাম) এবং পরিমাপে প্রায়





চিত্র 31

যকৃৎ ও অগ্ন্যাশয়। (ক) যকৃতের তলদেশ। (খ) ডিয়োডিনামের ক্রোড়ে অগ্ন্যাশয়ের অবস্থান। (ডিয়োডিনামের অংশ বিশেষ কাটিয়া সম্মিলিত সাধারণ পিত্তনালী ও অগ্ন্যাশয় নালীর মুখ দেখান হইয়াছে)

1 ফুট × 7 ইঞ্চি × $2\frac{1}{2}$ ইঞ্চি। যকৃতের রং কাল্‌চে লাল। ইহা উদরগহ্বরে ডানদিকের ঊর্ধ্বাংশে অবস্থিত। ইহার অধিকাংশ পঞ্জরাস্থির দ্বারা ঢাকা থাকে। ইহার দুইটি অংশের মধ্যে দক্ষিণের অংশটি আকারে বড়। বামদিকের ছোট অংশটি

পাকস্থলী দ্বারা চাপা থাকে। যকৃতে অনবরত **পিত্তরস** (bile) নিঃসৃত হইতেছে। এই পিত্তরস খাদ্যদ্রব্য পরিপাক কার্যের অবসরে **পিত্তথলিতে** (gall bladder) সঞ্চিত হয়। অর্ধজীর্ণ খাদ্য ডিয়োডিনামে প্রবেশ করিলে পিত্তথলি সংকুচিত হয় এবং পিত্ত একটি নালী (সিষ্টিক নালী) দিয়া ডিয়োডিনামে আসে। পিত্তরস গাঢ় সবুজ বর্ণের ক্ষার জাতীয় তরল পদার্থ। ইহাতে বিলিরুবিন (লালপিত্ত) ও বিলিভার্ডিন (সবুজ পিত্ত) এই দুইপ্রকার রঞ্জক পদার্থ ও নানাপ্রকার ধাতব লবণ আছে। পিত্তরসে কোন উৎসেচক নাই। যকৃৎ প্রধানতঃ পিত্ত-নিঃস্রাবী ও রক্ত-শোধক যন্ত্র হইলেও পরিপাক-তন্ত্রে ইহা একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে। ইহা ছাড়াও যকৃতে, দেহের আরও অনেক প্রকার কার্য সম্পন্ন হয়। যকৃৎ ব্যতীত মানুষ বাঁচিয়া থাকিতে পারে না।

অগ্ন্যাশয় (Pancreas)—অগ্ন্যাশয় উদর-গহ্বরে আড়াআড়ি ভাবে অবস্থিত প্রায় সাত ইঞ্চি দীর্ঘ (চিত্র 31 খ) একটি গ্রন্থি। ইহা অনেকটা মৎস্যাকৃতি। মস্তকটি দক্ষিণ দিকে ডিয়োডিনামের ক্রোড়ে পড়িয়াছে। অগ্ন্যাশয়ে দুইপ্রকার রস সৃষ্ট হয়, **অগ্ন্যাশয়ের পাচক রস** (pancreatic juice), ও **ইনসুলিন** (insulin)। শেষোক্তটি সরাসরি রক্তের মধ্যে ক্ষরিত হয় ও রক্তে শর্করার মান স্থির রাখে। অগ্ন্যাশয়ের রসবাহী নালী, যকৃৎ হইতে আগত পিত্তনালীর সহিত মিলিত হইয়া ডিয়োডিনামে পড়ে।

পরিপাক ক্রিয়া ও ইহাতে উৎসেচকের অংশ (Digestion and action of enzymes in a d ng diges ion)—

উৎসেচক (Engyme)—দেহের মধ্যে পরিপাক ও বহু জটিল কার্য সাধন করিবার জন্য লালাগ্রন্থি, পাকস্থলী, অগ্ন্যাশয় ও ক্ষুদ্রান্ত্র হইতে এক প্রকার বিশেষ রাসায়নিক পদার্থ নিঃসৃত হয়। ইহাদিগকে **উৎসেচক** (enzyme) বলে। এক একটি উৎসেচক এক এক প্রকার জটিল খাদ্যকে বিশ্লেষিত করিয়া সরলতম করিয়া দেয়। কতকগুলি উৎসেচক আমিষ জাতীয় খাদ্যকে অ্যামাইনো অম্লে পরিণত করে, কতকগুলি শ্বেতসারকে শর্করা ও চর্বি জাতীয় খাদ্যকে ফ্যাটি অম্ল ও গ্লিসারলে ভাঙ্গিয়া দেয়। এই পরিপাক ক্রিয়া দেহের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন প্রকার উৎসেচক কর্তৃক সংঘটিত হয়।

পরিপাক (digestion)—আমরা যে সমস্ত খাদ্য মুখদ্বারা গ্রহণ করি উহা দন্তের সাহায্যে কর্তিত, চর্বিত ও পিষ্ট হইয়া ছোট ছোট অংশে বিভক্ত হয়। জিহ্বা দ্বারা এই খাদ্য ইতস্ততঃ পরিচালিত হয়। মুখগহ্বরে লালা-গ্রন্থিগুলি-

নিঃসৃত লালা এই খাদ্যের সহিত মিশ্রিত হইয়া উহাকে নরম ও পিচ্ছিল করে। লালার মধ্যে **টায়ালিন** (ptyalin) ও **মলটেজ** (maltase) এই দুই উৎসেচক শ্বেতসার জাতীয় খাদ্যকে কিছু পরিমাণে গ্লুকোজে পরিবর্তিত করে। লালারসের ক্রিয়া পাকস্থীর মধ্যে গিয়াও কিছু পরিমাণে চলে। এই লালা মিশ্রিত খাদ্য মুখগহ্বর হইতে গ্রাসনালীর মধ্য দিয়া পাকস্থলীতে আসে।

পাকস্থলীর বিভিন্ন কোষ হইতে যে জারক রস নিঃসৃত হয় তাহাকে **পাচকরস** (gastric juice) বলে। এই রস পরিষ্কার, ইহাতে শতকরা নিরানব্বই ভাগ জল, 0·5 হাইড্রোক্লোরিক অম্ল ও বাকী **পেপসিন** (pepsin), **রেনিন** (rennin) ও **লাইপেজ** (lipase) জাতীয় রাসায়নিক উৎসেচক থাকে। হাইড্রোক্লোরিক অম্ল ও পেপসিন কতকগুলি গ্রন্থির সাহায্যে রক্ত হইতে প্রস্তুত হইয়া পাকস্থলীতে নিঃসৃত হয়। পেপসিন পাকস্থলীর প্রধান উৎসেচক। ইহা হাইড্রোক্লোরিক অম্লের সহিত মিশ্রিত অবস্থায় আমিষ জাতীয় খাদ্যকে আংশিক-ভাবে সরলতর **প্রোটিওজ** (proteose) ও **পেপটোনে** (peptone) পরি-বর্তিত করে। হাইড্রোক্লোরিক অম্ল টায়ালিন মিশ্রিত শ্বেতসার জাতীয় খাদ্যকেও কিছু পরিমাণে ভাঙ্গিয়া **সরলতম শর্করায়** (glucose) পরিবর্তিত করে। ইহা খাদ্যের সহিত যেসকল রোগজীবাণু পাকস্থলীর মধ্যে প্রবেশ করে তাহাদিগকেও বিনষ্ট করে। **রেনিন** উৎসেচক দুগ্ধ আমিষকে (milk protein) অদ্রবণীয় **কেসিনে** (casein) পরিবর্তিত করে, ফলে দুগ্ধ জমিয়া যায়। এই অদ্রবণীয় কেসিন পরে ক্যালসিয়ামের সহিত যুক্ত হয় ও হাইড্রোক্লোরিক অম্ল ও পেপসিনের সাহায্যে সম্পূর্ণভাবে জীর্ণ হয়। পাচকরসস্থ লাইপেজ উৎসেচক পাকস্থলী মধ্যস্থ চর্বিজাতীয় খাদ্যকে কিছু পরিমাণে ভাঙ্গিয়া সরলতম গ্লিসারল ও ফ্যাটি অম্লে পরিবর্তিত করে। ইহা উল্লেখযোগ্য যে পাকস্থলীতে পাচকরস ও উৎসেচকের সাহায্যে খাদ্যদ্রব্যের আংশিক পরিপাক ঘটে। পাকস্থলীতে খাদ্যদ্রব্য প্রায় তিন ঘণ্টা কাল থাকে এবং এই সময়ের মধ্যে পাচক-রসের সহিত মিলিত হইয়া **মণ্ডের** (chyme) আকার ধারণ করে। এই অর্ধজীর্ণ খাদ্যমণ্ড তিন চার ঘণ্টার মধ্যেই পাকস্থলী হইতে ক্ষুদ্রান্ত্রে প্রবেশ করে এবং তথায় সম্পূর্ণ পরিপাক ঘটিয়া থাকে। সেইজন্য অনেক সময় পাকস্থলী কাটিয়া বাদ দিলেও স্বাস্থ্যহানি হয় না।

আংশিকভাবে জীর্ণ তীব্র অম্লাত্মক খাদ্যপিণ্ড ক্ষুদ্রান্ত্রে আসিলে তথায় ক্ষুদ্রান্ত্রের সংকোচন ও প্রসারণ (peristalsis) এর ফলে উহা নিম্নাভিমুখে যাইতে থাকে।

ক্ষুদ্রান্ত্র নিঃসৃত জারক রস পিণ্ডটিকে পরিপাক করে। ক্ষুদ্রান্ত্রে খাদ্যপিণ্ড (1) অগ্ন্যাশয় হইতে নিঃসৃত **অগ্ন্যাশয় রস** (pancreatic juice), (2) যকৃৎ হইতে আগত **পিত্ত** (bile) ও (3) ক্ষারধর্মী **আন্ত্রিক রসের** (succus entericus) সাহায্যে জীর্ণ হয়। অগ্ন্যাশয় রসে চারিপ্রকার উৎসেচক আছে। যথা— **ট্রিপসিন, অ্যামাইলেজ, মলটেজ, লাইপেজ**। পাকস্থলীতে যে আমিষ জাতীয় খাদ্যগুলি পেপটোনে পরিবর্তিত হইয়াছিল ট্রিপসিন তাহাদিগকে অ্যামাইনো অম্লে পরিণত করে। অ্যামাইলেজ উৎসেচক শ্বেতসারকে মলটোজ চিনিতে রূপান্তরিত করে এবং মলটেজ্ উৎসেচক ঐ মলটোজকে আরও ভাঙ্গিয়া দেয় ও আন্ত্রিক রস উহাকে সরলতম গ্লুকোজ চিনিতে পরিণত করে। লাইপেজ উৎসেচক চর্বিজাতীয় খাদ্যকে ফ্যাটি অম্ল ও গ্লিসারিলে পরিবর্তিত করে। ইহা ব্যতীত অগ্ন্যাশয় রসে কিছু পরিমাণ **রেনিন** (rennin) উৎসেচক এবং **ইনসুলিন** (insuline) আছে। রেনিন দুধকে জমায় ও ইনসুলিন রক্তের চিনিকে দহন করিয়া দেহের উত্তাপ যোগায়। যকৃৎ নিঃসৃত পিত্ত ও অগ্ন্যাশয় নিঃসৃত রস একটি সাধারণ নালী দিয়া ডিয়োডিনামে পড়ে। পিত্ত চর্বিজাতীয় খাদ্যকে জীর্ণ ও শোষণ করিতে সাহায্য করে। পিত্তরসে কোন উৎসেচক নাই। তবে ইহা লাইপেজ উৎসেচকের ক্ষমতা বৃদ্ধি করে। পিত্তস্থিত লবণগুলি ডিয়োডিনাম হইতে পুনরায় রক্তমধ্যে শোষিত হয়। শোষিত হইবার কালে **সিক্রিটিন** (secretine) নামক একটি পদার্থ রক্তমধ্যে শোষণ করে। উহা অগ্ন্যাশয় গ্রন্থিকে জারকরস নিঃসরণে উত্তেজিত করে। পিত্তরস অগ্ন্যাশয় রসের সহিত না মিলিত হইলে শতকরা পঁচানব্বই ভাগ চর্বি পরিপাক না হইয়া মলের সহিত নির্গত হইয়া যায়। আন্ত্রিক রস ক্ষারজাতীয় তরল পদার্থ। ইহাতে অনেকগুলি উৎসেচক আছে। এইগুলি দ্বারা খাদ্যের বাকী অংশ সম্পূর্ণরূপে পরিপাক হয়। ইহার **ইরেপসিন** (erepsin) উৎসেচক অগ্ন্যাশয় নিঃসৃত ট্রিপসিনের সহিত একত্রে অজীর্ণ আমিষজাতীয় খাদ্যকে অ্যামাইনো অম্লে পরিবর্তিত করে। ইহার **ইনভার্টেজ** (invertase), **মলটেজ** (maltase) ও **ল্যাকটেজ** (lactase) উৎসেচকেরা জটিল শর্করাকে সরলতম গ্লুকোজ জাতীয় শর্করায় পরিবর্তিত করে। এইরূপে ক্ষুদ্রান্ত্রেই পরিপাক ক্রিয়া প্রায় সম্পূর্ণরূপে সম্পাদিত হয় এবং সরলতম খাদ্যগুলি অসংখ্য শোষণযন্ত্র কর্তৃক শোষিত হইয়া রক্তনালীর মধ্যে আসে। পরিপাকান্তে তরল খাদ্যসামগ্রী ক্ষুদ্রান্ত্রের প্রাচীরের পর্যায়ক্রমে সংকোচন ও প্রসারণের ফলে ক্রমে নীচের দিকে নামিতে থাকে। ক্ষুদ্রান্ত্রে খাদ্য জীর্ণ ও শোষিত হইবার পর তরল অংশ বৃহদন্ত্রের মধ্যে প্রবেশ করে।

বৃহদন্ত্রের প্রাচীর হইতে কোন উৎসেচক নিঃসৃত হয় না সেইজন্য এখানে পরিপাক ক্রিয়া সামান্যই হয়। এইখানে **মিউসিন** (mucin) নামক এক প্রকার পিচ্ছিল রস নির্গত হয়, উহা মলকে পিচ্ছিল করে। বৃহদন্ত্রের কোলনের মধ্যে খাদ্যমণ্ডের জলীয়ভাগ শোষিত হয় এবং উহা ক্রমশঃ কঠিন অবস্থা ধারণ করে। বৃহদন্ত্রের কুঞ্চন ও প্রসারণের জন্য মল ধীরে ধীরে নামিয়া মলভাণ্ডে পৌঁছে। বৃহদন্ত্রে প্রায় সত্তর আশী প্রকারের জীবাণু বাস করে। ইহারা মলের মধ্যে যে সকল দুষ্পাচ্য খাদ্যসামগ্রী থাকে তাহাদিগকে ভাঙ্গিয়া ফেলে ও তাহাদের মধ্য হইতে খাদ্য সংগ্রহ করে। ইহারা ভাঙ্গিয়া ফেলিলে উহা হইতে অনেক আমিষজাতীয় খাদ্য বৃহদন্ত্রে বাহির হইয়া পড়ে। এইগুলি পরে অন্ত্রগাত্রস্থ রক্তনালী কর্তৃক শোষিত হয়। খাদ্যের প্রয়োজনীয় অংশ গ্রহণ করিবার পরে যে অপ্রয়োজনীয় অংশ মলরূপে অবশিষ্ট থাকে তাহা খাদ্যগ্রহণের প্রায় 48 ঘণ্টা পরে মলভাণ্ডের উপরিভাগে আসে। পরে মলভাণ্ডের সংকোচনের ফলে উহা পায়ুছিদ্র দিয়া বাহির হইয়া যায়।

প্রশ্নাবলী

1. পাচন তন্ত্র কাহাকে বলে? ইহার অংশগুলি সংক্ষেপে বর্ণনা কর।

2. পৌষ্টিক নালীর বিভিন্ন অংশে কিরূপে পরিপাক-ক্রিয়া সংঘটিত হয় তাহার একটি বিবরণ লিখ।

3. উৎসেচক কি? খাদ্য পরিপাকে ইহার ক্রিয়া বিশদভাবে বর্ণনা কর।

4. মানুষের মুখগহ্বরে কয়টি ও কতপ্রকার দন্ত আছে। একটি দন্তের গঠন বর্ণনা কর। পরিপাক ক্রিয়ায় দন্ত কি কাজ করে?

5. নিম্নলিখিতগুলি সম্বন্ধে যাহা জান লিখ :—

জিহ্বা, পাকস্থলী, ক্ষুদ্রান্ত্র, বৃহদন্ত্র, যকৃৎ ও অগ্ন্যাশয়।

6. শূন্যস্থান পূরণ কর :—

মুখগহ্বরের পশ্চাৎভাগের নাম —। ইহার নিম্নভাগ দুইটি নালীতে বিভক্ত। সম্মুখের দিকের নালীটির নাম —। ইহা দুইটি — সহিত সংযুক্ত। ইহার পশ্চাৎভাগের নালীটির নাম —। ইহার মধ্য দিয়া চর্বিত খাদ্যদ্রব্য — ভিতরে যায়।

7. পার্শ্বের শূন্যস্থানে নিম্নলিখিত কারণ তিনটির মধ্যে উপযুক্ত কারণটি (a) অথবা (b) অথবা (c) লিখিয়া চিহ্নিত কর :—

অনেক সময় পাকস্থলী কাটিয়া বাদ দিলেও স্বাস্থ্যহানি হয় না। কারণ —।

(a) পাকস্থলীতে পরিপাক ক্রিয়া আংশিক হয়।

(b) ক্ষুদ্রান্ত্রে খাদ্যের সম্পূর্ণ পরিপাক ঘটে।

(c) পাকস্থলীতে খাদ্য বেশী সময় থাকে না।

8. শুদ্ধ (✓) অথবা ভুল (×) পার্শ্বে উপযুক্ত চিহ্ন দ্বারা চিহ্নিত কর :—

(a) যকৃৎ ও অগ্ন্যাশয় পাচন-তন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত নহে।

(b) লাইপেজ উৎসেচক চর্বিজাতীয় খাদ্য পরিপাকে সহায়তা করে।

(c) পিত্ত একটি উৎসেচক।

(d) কোলন বৃহদন্ত্রের অংশ।

(e) পিত্তনালী ও অগ্ন্যাশয় নালী একত্র মিলিত হইয়া ডিয়োডিনামে পড়ে।

(f) লালাগ্রন্থি পাকস্থলীমধ্যে অবস্থিত।

9. নিম্নে প্রথম সারিতে কতকগুলি জারক রসের নাম ও দ্বিতীয় সারিতে কতকগুলি উৎসেচকের নাম দেওয়া হইল। প্রথম সারিতে প্রতিটি নামের পার্শ্বে উহাতে যে যে উৎসেচক আছে তাহাদের নাম লিখিয়া দাও।

জারক রস	উৎসেচক
লালা	লাইপেজ
পাচক রস	টায়ালিন
অগ্ন্যাশয় রস	পেপসিন
আন্ত্রিক রস	ট্রিপসিন
	ইরেপসিন
	এমাইলেজ

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়

খাদ্য (Food)

খাদ্য—আমরা সর্বদাই কিছু না কিছু কাজ করিতেছি। এইরূপ অবিশ্রান্ত কাজ করিবার জন্য শক্তির প্রয়োজন। এই শক্তি আমরা লাভ করি খাদ্য হইতে। ইহা ব্যতীত সর্বদা কাজ করার ফলে আমাদের শরীর ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। এই ক্ষয় পূরণ ও দেহ সংস্কারের জন্যও খাদ্যের প্রয়োজন। শিশুদেহে কোষ বিভাজনের ফলে নূতন নূতন কোষ সৃষ্টি করিয়া দেহের বৃদ্ধি সাধনের জন্যও খাদ্য একান্ত

প্রয়োজন। সুতরাং যে সকল সামগ্রী আহার করিলে আমাদের শরীরের পুষ্টি ও বৃদ্ধিসাধন, দৈহিক ক্ষয় ক্ষতিপূরণ, স্বাভাবিক উত্তাপ রক্ষণ, রোগ প্রতিশেধন হয় ও নানাবিধ কার্য করিবার শক্তি জন্মে তাহাকে **খাদ্য** (Food) বলা যাইতে পারে।

সাধারণতঃ প্রাণী, উদ্ভিদ্ ও খনিজ পদার্থ হইতে আমরা খাদ্য সংগ্রহ করিয়া থাকি। শরীরে কি প্রকার কার্য করে সেই হিসাবে খাদ্যকে মোটামুটি দুই ভাগে ভাগ করা যায়। (A) **দেহ পোষক খাদ্য** ও (B) **দেহ সংরক্ষক খাদ্য।**

(A) **দেহ পোষক খাদ্য (nutritive or proximate principle) :**— **প্রোটিন** (protein) জাতীয়, **শ্বেতসার ও শর্করা** (carbohydrates) জাতীয় ও **চর্বি বা স্নেহ** (fats and oils) জাতীয় খাদ্য এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। ইহারা দেহের গঠন, বৃদ্ধি, পুষ্টি ও মেরামতের কাজ করে। দেহে শক্তি ও উত্তাপ যোগায়। ইহা উল্লেখযোগ্য যে, যে জাতীয় খাদ্যের মধ্যে যে বিশিষ্ট উপাদান অধিক পরিমাণে আছে সেই অনুযায়ী উহার নামকরণ করা হয়। যথা প্রোটিন জাতীয় খাদ্যের মধ্যে প্রোটিন খাদ্য সর্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে আছে। তবে এরূপ মনে করিবার কোন কারণ নাই যে উহার মধ্যে শ্বেতসার ও স্নেহজাতীয় খাদ্য আদৌ নাই। প্রত্যেক বিশিষ্ট জাতীয় খাদ্যের মধ্যে অল্পমাত্রায় অন্য জাতীয় খাদ্যও বর্তমান থাকে।

1. **প্রোটিন জাতীয় খাদ্য :**—মাছ, মাংস, ডিম, ছানা, দুধ, ডাল, সয়াবিন, শাক প্রভৃতিতে প্রোটিন জাতীয় খাদ্য আছে। অঙ্গার, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন ও গন্ধক লইয়া প্রোটিন গঠিত।

প্রোটিন এই কথাটির অর্থ প্রথম (protos = first)। দেহ পুষ্টিতে প্রোটিনের স্থান সর্বপ্রথম। পূর্বে আমরা দেখিয়াছি যে প্রোটিনের শেষ পরিণতি **অ্যামাইনো অম্ল** (amino acid)। এই অ্যামাইনো অম্ল বহু প্রকারের হয়। যথা **আর্গিনিন** (arginine), **হিষ্টিডিন** (histidine), **লাইসিন** (lysine) ইত্যাদি। যে সকল প্রোটিন বহুসংখ্যক অ্যামাইনো অম্লে পরিণত হইতে পারে ও দেহের বেশীর ভাগ কোষের কাজে লাগে তাহাদিগকে সম্পূর্ণ প্রোটিন (complete protein) বলে। মাংস, ডিম, ছানা, দুধ ইত্যাদির প্রোটিন সম্পূর্ণ। ইহাদের মধ্যে ছানার প্রোটিন সর্বাপেক্ষা উত্তম। খাদ্যের প্রোটিন শতকরা 40 ভাগ জৈব ও 60 ভাগ উদ্ভিজ্জ হওয়া উচিত। প্রত্যহ অন্ততঃ 70-80 গ্রাম (এক, দেড় ছটাক) প্রোটিন খাওয়া উচিত। মানুষের, প্রতি এক কিলোগ্রাম

দেহের ওজনে দেড় গ্রাম প্রোটিন খাদ্য যথেষ্ট। প্রোটিন খাদ্যের শতকরা 75 ভাগ নাইট্রোজেন যুক্ত, যাহার শক্তিদানের ক্ষমতা নাই। প্রোটিন দেহ-ভাণ্ডারে খুব কম পরিমাণে জমা থাকে। ইহা দেহতন্তুকে খাদ্য জোগায় ও প্রয়োজন মত সংস্কার সাধন করিয়া থাকে। খাদ্য হইতে যতটা নাইট্রোজেন আমরা প্রত্যহ পাই তাহা 16 ঘণ্টার মধ্যে মলমূত্ররূপে নির্গত হইয়া যায়।

প্রোটিন শরীরের ক্ষয় পূরণ করিয়া বিভিন্ন কলার পুষ্টি সাধন করে। ইহারা স্নেহজাতীয় খাদ্য উৎপাদন করিতে পারে, কারণ দুগ্ধের স্নেহ অংশের প্রায় সম্পূর্ণ ভাগই প্রোটিন হইতে প্রস্তুত হয়। প্রোটিন শরীর মধ্যে তাপের সৃষ্টি করে, শরীরে কর্মশক্তি ও মনে স্ফূর্তি যোগায়। প্রোটিন কম খাইলে মাংসপেশী প্রভৃতি নাইট্রোজেন বহুল তন্তুর ক্ষয় হয়।

(2) **শ্বেতসার ও শর্করা জাতীয় খাদ্য ঃ**—শ্বেতসার জাতীয় খাদ্য অঙ্গার, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন সহযোগে গঠিত। ইহাদের মধ্যে হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন 2 ঃ 1 অনুপাতে বর্তমান। এই প্রকার খাদ্যকে মোটামুটি তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়।

(a) **মনোস্যাকারাইড** (monosaccharides)—ইহারা সরলতম শর্করা এবং অনায়াসে রক্তের মধ্যে শোষিত হইতে পারে। ইহারা নানা প্রকারের হয়, যথা—**আঙ্গুর শর্করা** (glucose),—আঙ্গুরফল, মনাক্কা, ও নানাপ্রকার ফলের মিষ্ট রসে পাওয়া যায় ; **ফল শর্করা** (fructose), ইহাও ফলের মিষ্ট রসে বর্তমান থাকে।

(b) **ডাইস্যাকারাইড** (disaccharides)—ইহারা পূর্বোক্ত শর্করা অপেক্ষা জটিল। ডাইস্যাকারাইড নানা প্রকারের হয়, যথা **ইক্ষুশর্করা** (sucrose)—ইক্ষুরসে, তালের রসে, বীটপালং, গুড়, চিনি, মিছরি প্রভৃতিতে বর্তমান। **দুগ্ধশর্করা** (lactose) দুগ্ধের মধ্যে বর্তমান। **যবশর্করা** (maltose) যব, ছোলা প্রভৃতি শস্যে বর্তমান।

(গ) **পলিস্যাকারাইড** (polysaccharides)—এই জাতীয় খাদ্য বেশ জটিল। ইহারা আলু, চাউল, ডাল, আটা, ময়দা, সুজি, সাগু, এরারুট প্রভৃতিতে বর্তমান। পরিপাক কালে ইহারা জারক রসের সাহায্যে মনোস্যাকারাইডে পরিবর্তিত হইয়া রক্তে শোষিত হয়। **সেলুলোজ** (cellulose) নামক একপ্রকার পলিস্যাকারাইড মূল, খোসা, ভূষি প্রভৃতিতে বর্তমান থাকে। সেলুলোজে নানা-জাতীয় লবণ থাকে বলিয়া ইহারা খাদ্য হিসাবে রুচিকর ও মূল্যবান। কিন্তু ইহাদের

আমরা পরিপাক করিতে পারি না বলিয়া ইহারা মলের সহিত বাহির হইয়া যায়। এই অকেজো অংশকে **রাফেজ** (roughage) বলে। খাদ্য হিসাবে রক্তের মধ্যে গৃহীত না হইলেও ইহারা মলের আয়তন (bulk) বৃদ্ধি করিয়া অন্ত্রকে সংকুচিত ও প্রসারিত হইতে (peristalsis) সাহায্য করে। অন্ত্রের সংকোচন ও প্রসারণ পরিপাকের জন্য বিশেষ প্রয়োজনীয়। শ্বেতসার জাতীয় খাদ্য রক্ত মধ্যস্থ অক্সিজেনের সাহায্যে ধীরে ধীরে দগ্ধ হয় এবং শরীরে তাপ ও কর্মশক্তি উৎপন্ন করে। ইহারা কিছু পরিমাণে মেদ উৎপন্ন করিতে পারে। ইহারা রক্তের ক্ষারত্ব বজায় রাখে ও মল নিষ্কাশনে সহায়তা করে।

(3) **স্নেহ বা চর্বিজাতীয় খাদ্য**—স্নেহ জাতীয় পদার্থ অঙ্গার, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন লইয়া গঠিত। কিন্তু ইহাতে হাইড্রোজেনের পরিমাণ অক্সিজেনের তুলনায় অনেক বেশী। ইহাতে প্রায় তিন ভাগ **ফ্যাটি অম্ল** (fatty acid) ও একভাগ **গ্লিসেরল** (glycerol) মিলিত অবস্থায় থাকে। উদ্ভিজ্জ স্নেহ তিল, সরিষা, বাদাম ইত্যাদিতে এবং জান্তব স্নেহ, ঘৃত, মাখন, নবনী, চর্বি প্রভৃতিতে প্রচুর পরিমাণে আছে।

স্নেহ জাতীয় খাদ্য ভক্ষণ করিলে প্রোটিনজাতীয় খাদ্য কম খাইলেও চলে। ইহারা শ্বেতসার জাতীয় খাদ্য অপেক্ষা প্রায় আড়াইগুণ বেশী শক্তি প্রদান করিতে পারে। স্নেহ জাতীয় খাদ্য দেহে প্রচুর পরিমাণে উত্তাপ ও কর্মশক্তি দান করে। সেইজন্য যাহারা বেশী পরিশ্রম করে তাহাদের উপযুক্ত পরিমাণে স্নেহজাতীয় খাদ্য গ্রহণ করা আবশ্যক। এস্কিমো ও শীতপ্রধান দেশের অধিবাসীরা সেইজন্য প্রচুর পরিমাণে স্নেহজাতীয় খাদ্য গ্রহণ করিয়া দেহের উত্তাপ ঠিক রাখে। স্নেহজাতীয় খাদ্য আমাদের শরীরের মেদ বৃদ্ধি করে ও ভবিষ্যতের জন্য খাদ্য সঞ্চয় করিয়া রাখে। খাইতে না দিলে অধিক মেদযুক্ত ব্যক্তি অধিক দিন বাঁচিয়া থাকিতে পারে। এই জাতীয় খাদ্য ত্বককে মসৃণ রাখে, শরীরের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে, যকৃৎ ও অগ্ন্যাশয়ের রস নিঃসরণে সাহায্য করে। খাদ্যে চর্বির অভাব হইলে রাত্র্যান্ধতা প্রভৃতি রোগ দেখা দেয়।

(B) **দেহ সংরক্ষক খাদ্য (Protective principles)**

লবণ, জল ও ভাইটামিন (vitamins) এই তিনপ্রকার খাদ্য দেহ সংরক্ষণের কার্যে ও রক্তের ক্ষারত্ব ঠিক রাখার কার্যে বিশেষ প্রয়োজনীয়।

1. **লবণ (Salts)** :—আমাদের শরীরের ওজনের শতকরা প্রায় ছয় ভাগ লবণ। প্রয়োজনীয় লবণগুলি ক্যালসিয়াম, সোডিয়াম, পটাসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম,

লৌহ, ফসফরাস, সালফার, ক্লোরিন, আইয়োডিন, সিলিকন প্রভৃতি মৌলিক পদার্থ হইতে গঠিত। ফল, মূল, শাক সবজি, মাছ, মাংস, দুগ্ধ, চাউল, ময়দা ইত্যাদি হইতে আমরা নানাপ্রকার প্রয়োজনীয় লবণ গ্রহণ করি। যদিও এই সকল লবণ আমাদিগকে কোন শক্তি প্রদান করে না তথাপি এইগুলি জীবনধারণের জন্য একান্ত প্রয়োজনীয়। এইগুলির অভাবে মৃত্যু পর্যন্ত হইতে পারে। এই সকল লবণ দেহকলা (tissues) গঠন করে ও তাহাদিগকে সুস্থ রাখে। নানাপ্রকার জারক রস ও অন্যান্য রস নিঃসরণে সহায়তা করে। রক্তের ক্ষারত্ব বজায় রাখে। যকৃৎ ও পিত্তে বর্তমান থাকিয়া পরিপাক কার্যে সহায়তা করে। শরীরের পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কয়েকটি লবণের বিষয় নিম্নে আলোচিত হইল।

(i) **লৌহ (Iron) :**—লৌহ জাতীয় লবণ দুগ্ধ ও মাখন ব্যতীত সকল প্রকার প্রাণিজ খাদ্যে ও সবুজ তরিতরকারিতে বর্তমান। ডিমের কুসুম, মাংস, পালংশাক, কপিপাতা, ডুমুর, কাঁচকলা, নারিকেল, জলপাই, বাদাম ইত্যাদি হইতেও আমরা উহা সংগ্রহ করি। আমাদের শরীরে লৌহ দৈনিক প্রায় 15-20 মিলিগ্রাম প্রয়োজন হয়। উদ্ভিদের **সবুজকণা** (chlorophyll) এবং **পিত্তস্থিত রঞ্জক পদার্থ** (bile pigments) লৌহ জাতীয় লবণ শোষণে সহায়তা করে। লৌহ জাতীয় লবণ যকৃৎ, প্লীহা ও অস্থি মজ্জায় সঞ্চিত থাকে। লৌহের অভাবে দেহে রক্তাল্পতা (anaemia) ঘটে। রক্তের লোহিত কণিকার মধ্যে হিমোগ্লোবিন নামক যে লাল রঞ্জক পদার্থ আছে তাহাতে প্রচুর পরিমাণে (সমস্ত রক্তের মধ্যে যত লৌহ আছে তাহার প্রায় 92-94%) লৌহ আছে। এই লৌহ পরমাণুগুলি অক্সিজেন গ্রহণ করে ও শরীরের মধ্যে বহন করে। শরীরে লৌহ কম হইলে রক্তের অক্সিজেন গ্রহণের ক্ষমতা কমিয়া যায় বলিয়া শরীর দুর্বল হইয়া পড়ে।

(ii) **ক্যালসিয়াম (Calcium)**—ক্যালসিয়াম বা চুনজাত লবণ আমাদের শরীরের পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। ইহা কঠিন জল (hard water), ডিম, দুধ, পনির ; মৌরলা, চিংড়ী, পুঁটি প্রভৃতি মাছ ; সয়াবিন, গাজর, ফুলকপি, লেবু, ওল, কচু ও অন্যান্য শাকসবজি প্রভৃতি হইতে আমরা সংগ্রহ করি। পানের সহিত যে চুন আমরা খাই উহাও শরীরকে কিছু পরিমাণে ক্যালসিয়াম দান করে। আমাদের শরীরে ক্যালসিয়াম দৈনিক প্রায় 0 9—1 গ্রাম প্রয়োজন হয়।

ইহা অস্থি ও দন্তের প্রধান উপাদান। আমাদের দেহাস্থির প্রায় শতকরা 60 ভাগ ক্যালসিয়াম ফসফেট। ক্যালসিয়াম লবণ রক্তত্কনে (coagulation

of blood) সহায়তা করে। মাংসপেশী ও স্নায়ুগুলির স্বাস্থ্য বজায় রাখে। হৃৎপিণ্ডের সংকোচন ও প্রসারণ নিয়ন্ত্রিত করে। ক্ষয়রোগের জীবাণু ফুসফুসে প্রবেশ করিলে ক্যালসিয়াম উহাকে আবদ্ধ করিয়া ফেলে। ইহার অভাবে রিকেট হয়, শরীর সর্দি কাশি, ক্ষয়রোগ ইত্যাদিতে আক্রান্ত হয়, এবং অস্থি ক্ষণভঙ্গুর হয়।

(iii) **সোডিয়াম (Sodium)** ও **পটাসিয়াম (Potassium)**— সোডিয়াম ক্লোরাইড (sodium chloride) বা খাদ্য লবণ আমাদের শরীরের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয়। দৈনিক প্রায় 8-10 গ্রাম খাদ্য লবণ আমাদের শরীরের পক্ষে প্রয়োজন হয়। ইহা দুধ, জল, নারিকেল, ডাল ও বিভিন্নপ্রকার শাকসবজিতে বর্তমান। ইহা ব্যতীত খাদ্যের সহিত আমরা যথেষ্ট পরিমাণে লবণ ব্যবহার করি। ইহা পাকস্থলীতে হাইড্রোক্লোরিক অম্ল এবং পিত্তে, পিত্তলবণ ইত্যাদি প্রস্তুতে সহায়তা করে। ইহা হৃৎপিণ্ডকে সংকুচিত করে। ঘর্মের সহিত প্রচুর পরিমাণে খাদ্যলবণ বাহির হইয়া যায়। সেইজন্য গ্রীষ্মপ্রধান দেশে অধিক পরিমাণে খাদ্যলবণ গ্রহণ করা প্রয়োজন।

আমাদের শরীরে প্রত্যহ প্রায় 4 গ্রাম পটাসিয়ামজাত লবণ প্রয়োজন হয়। উহা আমরা বাদাম, দুধ, গম, ডাল এবং মাংসে পাই। ইহা দেহতন্তুর বৃদ্ধিসাধন করে, হৃৎপিণ্ডকে প্রসারিত করে। রক্তের লোহিত কণিকাস্থিত হিমোগ্লোবিনকে অঙ্গারাম্ল গ্যাস পরিবহণে সহায়তা করে।

(iv) **ফসফরাস (Phosphorus)**ঃ ফসফরাস জাত লবণ দুগ্ধ, মাংস, ডিম, মাছ, বাদাম, কড়াইশুঁটি, বিলাতী বেগুন, ডাল ও অন্যান্য শাক সবজিতে পাওয়া যায়। দৈনিক প্রায় 1·3 গ্রাম ফসফরাসজাত লবণ আমাদের শরীরের পক্ষে প্রয়োজন হয়। ইহা রক্তের ক্ষারত্ব ও প্রস্রাবের অম্লত্ব বজায় রাখে এবং অস্থি ও দন্ত গঠনে, দৈহিক পুষ্টি ও পেশী সংকোচনে সহায়তা করে। ইহা কিছু পরিমাণে রক্ততঞ্চনে, পাকস্থলীর জারকরসে হাইড্রোক্লোরিক অম্ল নির্মাণে ও স্নেহজাতীয় খাদ্যের পরিপাকে সাহায্য করে।

(v) **আয়োডিন (Iodine)**ঃ অত্যন্ত কম পরিমাণে হইলেও আয়োডিন জাত লবণ আমাদের শরীরের একটি অতি আবশ্যকীয় পদার্থ। ইহা সমুদ্রের জলে, সামুদ্রিক মৎস্যে, কডলিভার তৈলে, রসুন, শালগম প্রভৃতিতে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। খাদ্য লবণেও কিঞ্চিৎ পরিমাণে আয়োডিন আছে। দৈনিক প্রায় 0·05 মিলিগ্রাম আয়োডিন আমাদের শরীরে প্রয়োজন হয়। ইহা আমাদের শরীরে থাইরয়েড গ্রন্থিতে (thyroid gland) **থাইরক্সিন** (thyroxine) হিসাবে বর্তমান

থাকে। ইহা দেহের পরিপাক নিয়ন্ত্রণ করে। খাদ্যে আয়োডিন কম হইলে গলগণ্ড (goitre) হয়, চক্ষুগোলক বাহির হইয়া আসিবার উপক্রম (exopthalmic goitre) হয়।

2. **জল (Water) ঃ** জল আমাদের খাদ্যের একটি প্রধান অংশ। জল না হইলে কোন জীবই জীবন ধারণ করিতে পারে না। আমাদের দেহের ওজনের শতকরা প্রায় 70 ভাগ জল। প্রতিদিন আমাদের শরীর হইতে ঘর্ম, মূত্র, মল ইত্যাদির মাধ্যমে প্রায় $2\frac{1}{2}$ লিটার জল বাহির হইয়া যাইতেছে। এই জল খাদ্য ও পানীয় হিসাবে পুনরায় শরীরের মধ্যে গৃহীত না হইলে পরিপাক কার্য ব্যাহত হয় এমন কি জীবনধারণ পর্যন্ত সম্ভব হয় না। অধিক পরিশ্রম করিলে অধিক পরিমাণ জল শরীরের পক্ষে প্রয়োজন হয়। জলের প্রয়োজন হইলে আমরা তৃষ্ণা বোধ করি।

জল, কঠিন খাদ্য-বস্তুকে তরল করিয়া পরিপাকের ও শোষণের সহায়তা করে, রক্তকে তরল রাখে, দেহ হইতে ঘর্ম ও মূত্রের মাধ্যমে দূষিত পদার্থ নিষ্কাশিত করে। জারক রস, উৎসেচক ইত্যাদি প্রস্তুত করে, দেহের উত্তাপের সমতা রক্ষা করে। জলের অভাবে কোষ্ঠবদ্ধতা, অজীর্ণ প্রভৃতি রোগ দেখা দেয় এবং দেহ দুর্বল হইয়া পড়ে।

3. **ভাইটামিন (Vitamins) ঃ** দেখা গিয়াছে খাদ্যে শ্বেতসার, প্রোটিন, স্নেহজাতীয় পদার্থ, জল ও লবণ উপযুক্ত পরিমাণে থাকিলেও আমাদের শরীরের সকল প্রকার প্রক্রিয়া সুচারুরূপে চলিতে পারে না। অধ্যাপক **হপকিন্‌স** (Prof. Hopkins) পরীক্ষা করিয়া দেখাইয়াছেন যে শরীরের উপযুক্ত পুষ্টি ও বৃদ্ধি সাধনের জন্য কতকগুলি জৈব পদার্থ অতি অল্প পরিমাণে খাদ্যে উপস্থিত থাকার প্রয়োজন হয়। এই পদার্থগুলির নাম **ভাইটামিন** (vitamins) বা **খাদ্যপ্রাণ**। ভাইটামিনগুলি নাইট্রোজেন বিহীন জৈব পদার্থ। ইহাতে হাইড্রোজেন ও অঙ্গার বর্তমান। ইহা এমন একটি রাসায়নিক পদার্থ যাহা হইতে আমরা জীবনীশক্তি লাভ করি। ইহার অভাবে আমাদের স্বাস্থ্য ভঙ্গ হয়। স্কার্ভি, বেরিবেরি, রিকেটস, পেলাগ্রা প্রভৃতি রোগ হয়। অঙ্গ প্রত্যঙ্গের পুষ্টি সাধন হয় না।

বৈজ্ঞানিক **ফুঙ্ক** (Funk) সর্বপ্রথম ভাইটামিনের নামকরণ করেন। বর্তমানে মোটামুটিভাবে সাত প্রকার ভাইটামিনের কথা জানা গিয়াছে। ইহাদের মধ্যে (i) **ভাইটামিন এ, ডি, ই** ও **কে** তৈল বা স্নেহজাতীয় পদার্থে

দ্রবণীয় এবং (ii) **বি, সি ও পি** জলে দ্রবণীয়। আমাদের দেহ আবশ্যকীয় সকল ভাইটামিন খাদ্য হইতেই সংগ্রহ করে। অন্ত্রমধ্যে অবস্থিত অসংখ্য কীটাণু, দেহকে **ভাইটামিন বি ও কে** সরবরাহ করে। ভাইটামিনগুলি শরীর গঠনে প্রত্যক্ষভাবে কোন অংশ গ্রহণ করে না; উহা অতি অল্প পরিমাণে বর্তমান থাকিয়া শরীরের নানা প্রকার পরিপাক ক্রিয়ার সহায়তা করে। এইজন্য ইহাদিকে **সহকারী খাদ্য** (accessory food) বলা হয়। নিম্নে বিভিন্ন প্রকার ভাইটামিন সম্বন্ধে আলোচনা করা হইল।

(i) **স্নেহ পদার্থে দ্রবণীয় ভাইটামিন** (Fat soluble vitamins):

ভাইটামিন এঃ আমাদের দেহে ইহার দৈনন্দিন চাহিদা প্রায় 5000 আন্তর্জাতিক ইউনিট (1 ইউনিট = 0·0006 মিলিগ্রাম)। ইহা ঘি, ননী, মাখন, দুধ, মাছ, ডিম, কডলিভার তৈল, মটরশুঁটি, পালংশাক, নটে শাক, বাঁধাকপি, বিলাতী বেগুন, গাজর প্রভৃতি খাদ্যে প্রচুর পরিমাণে থাকে। প্রত্যহ দেড় পোয়া খাঁটি দুধ, আধ ছটাক মাখন, দুই তিনটি কাঁচা গাজর ও কিছু শাকসবজি খাইলে ইহার দৈনিক চাহিদা পূরণ হয়। রান্না করিলে এই ভাইটামিন তেমন নষ্ট হয় না। ইহা দেহ বৃদ্ধি করে, রোগের আক্রমণ প্রতিরোধ করে, চক্ষু সুস্থ রাখে। ইহার অভাবে দৈহিক বৃদ্ধি হ্রাস পায়, চর্ম শক্ত ও খসখসে হয়, চক্ষু শুষ্ক ও ক্ষতযুক্ত হয়, মূত্রথলিতে ও বৃক্কে পাথুরি প্রভৃতি রোগ জন্মায়, নখ ও দন্তের বিকৃতি ঘটে। রাত্রান্ধতা ও রক্তাল্পতা দেখা দেয়।

ভাইটামিন—ডিঃ আমাদের দেহে ইহার দৈনন্দিন চাহিদা 200 হইতে 500 ইউনিট এবং শিশু দেহে 2000 হইতে 5000 ইউনিট। ইলিশ, কড প্রভৃতি মাছের যকৃতের তৈল, মাছের ডিম, ডিমের কুসুম, মাখন, ছানা, গুগলি, মাংস, কাঁচা দুধ, পালংশাক, বাঁধাকপির উপর অংশের পাতা, আটা, কলা, মটরশুঁটি, টাটকা নারিকেল তৈল ও আলট্রাভায়োলেট রশ্মিস্নাত খাদ্যদ্রব্যে **ভাইটামিন ডি** প্রচুর পরিমাণে থাকে। এই প্রকার ভাইটামিন উত্তাপে সহজে ধ্বংস হয় না। তৈল, জল প্রভৃতি সূর্যকিরণে রাখিলে এই ভাইটামিন তাহাতে প্রবেশ করে। বেশী পরিমাণে ইহা ব্যবহার করিলে উদরাময়, দেহের ওজন হ্রাস প্রভৃতি রোগ দেখা দেয়। **ভাইটামিন ডি** ক্যালসিয়াম, ফসফরাস ও স্নেহ জাতীয় পদার্থের পরিপাক-ক্রিয়া সম্পন্ন করে, মাংসপেশী দৃঢ় করে, অস্থি গঠনে সাহায্য করে। ইহার অভাবে শিশুদের রিকেট নামে অস্থি-বিকৃতি রোগ দেখা দেয়। দন্তপীড়া ও মূত্রথলিতে পাথুরি প্রভৃতি রোগ হয়।

ভাইটামিন—ই ঃ শরীরে ইহার দৈনন্দিন চাহিদা প্রায় 3 মিলিগ্রাম। এই প্রকার ভাইটামিন কডলিভার তৈল, ঢেঁকি ছাঁটা চাউল, ডিমের কুসুম, ছোলা ও গমের অঙ্কুর, লেটুস শাক, চা প্রভৃতিতে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। ইহা রন্ধনজনিত উত্তাপে নষ্ট হয় না। ইহা প্রজনন কার্যে সহায়তা করে। দেহের ও মনের স্ফূর্তি বর্ধন করে। রক্তের অনুচক্রিকার সংখ্যা বৃদ্ধি করে এবং রক্ত চলাচল দ্রুত করে। ইহার অভাবে প্রজনন ক্ষমতা হ্রাস পায়।

ভাইটামিন—কে ঃ এই প্রকার ভাইটামিনের দৈনন্দিন চাহিদা সঠিক নির্ণীত হয় নাই। ইহা পালংশাক, কপি প্রভৃতি তরিতরকারিতে বর্তমান। মানবদেহের বৃহদন্ত্র মধ্যস্থ মৃত জীবাণু-দেহে এই প্রকার ভাইটামিন প্রচুর পরিমাণে থাকে। ইহা রক্তের জমাট বাঁধার শক্তি ঠিক রাখে। ইহাদের অভাব ঘটিলে রক্তপাত সহজে বন্ধ হয় না। রন্ধনজনিত উত্তাপে এই প্রকার ভাইটামিন সহজে নষ্ট হয় না।

(ii) **জলে দ্রবণীয় ভাইটামিন** (Water soluble vitamins) :

ভাইটামিন-বি ঃ ইহা প্রকৃতপক্ষে একটি মাত্র ভাইটামিন নহে। **ভাইটামিন বি$_1$, বি$_2$** প্রভৃতি বারটি পৃথক পৃথক খাদ্যপ্রাণকে এই প্রকার ভাইটামিনের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। এই কারণে ইহাকে **ভাইটামিন বি-কমপ্লেক্স** (B-Complex) বলা হয়। আমাদের শরীরে দৈনিক প্রায় 500 হইতে 2000 ইউনিট পর্যন্ত ভাইটামিন বি$_1$ এবং 10 হইতে 22 মিলিগ্রাম পর্যন্ত ভাইটামিন বি$_2$ প্রয়োজন হয়। **ভাইটামিন বি** ঢেঁকিছাটা চাউল, গম, চিনাবাদাম, অঙ্কুরিত মুগ, ছোলা, পালংশাক, বিলাতী বেগুন, দুগ্ধ, দধি, বাঁধাকপি, আলু, বরবটি, নারিকেল, ডিমের কুসুম, মাছ, মাংস, ঢেঁড়স, কচু, আপেল, কমলালেবু, ইষ্ট ছত্রাক ইত্যাদিতে থাকে। রন্ধন জনিত উত্তাপে ইহা নষ্ট হয় না। পূর্ণবয়স্কদের স্বাস্থ্য রক্ষার্থে ইহারা অতীব প্রয়োজনীয়। ইহা বেরিবেরি, পেলাগ্রা, প্রভৃতি রোগ নিবারণ করে। ক্ষুধা ও পুষ্টি বর্ধন করে। শ্বেতসার জাতীয় খাদ্য পরিপাকে সহায়তা করে ও স্নায়বিক উত্তেজনা প্রদান করে। ইহার অভাব ঘটিলে চর্মরোগ, কোষ্ঠবদ্ধতা, হৃদ্‌রোগ, ক্ষুধামান্দ্য ও শরীরের স্বাভাবিক বৃদ্ধির ব্যাঘাত ঘটে। রক্তাল্পতা, ওষ্ঠ ফাটিয়া যাওয়া, মাথায় টাক পড়া, চক্ষুতে ছানি পড়া এবং পক্ষাঘাত ইত্যাদি ঘটিতে পারে।

ভাইটামিন-সি ঃ আমাদের শরীরে ইহার দৈনন্দিন চাহিদা প্রায় 1000,

ইউনিট (প্রায় 50 মিলিগ্রাম)। ইহা

ইহা কমলালেবু, পাতিলেবু, বিলাতী বেগুন, পাকা ... পাওয়া যায়। আমলকী, আনারস, কলা, আম, পেঁপে, কাঁচালঙ্কা, ... প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। খাদ্য ফুটাইলে এই ভাইটামিনের বেশী ভাগ ... হইয়া যায়। ইহা ক্যালসিয়াম লবণের উপচয় ঘটায়। রোগ প্রতিরোধ করে। কর্মশক্তি বৃদ্ধি করে। রক্তে লোহিত কণিকা এবং অনুচক্রিকা নির্মাণ করে। রক্ত... সহায়তা করে। ইহার অভাবে অস্থি ও দন্তের পুষ্টি হয় না। দেহের বৃদ্ধি হয় না, রক্তাল্পতা দেখা দেয়, চর্ম ফাটিয়া যায় ও দেহমধ্যে কৈশিকনালী ছিন্ন হইয়া রক্তপাত হয়, কাটিয়া গেলে রক্ত সহজে জমাট বাঁধে না, অস্থি ভঙ্গুর হয় এবং শরীরে স্কার্ভি নামক পীড়া দেখা দেয়।

ভাইটামিন-পি ঃ আমাদের শরীরে ইহা স্বল্প পরিমাণে প্রয়োজন হয়। ইহা লেবুর খোসায়, এস্কর্বিক অম্লের সহিত একত্র যোগে থাকে। ইহা কৈশিকনালী-প্রাচীরের ভেদ্যতা রক্ষা করে ও ভাইটামিন-সি এর কার্যে সহায়তা করে। কোন কোন বৈজ্ঞানিকের মতে ইহারই অভাবে স্কার্ভি রোগে কৈশিক নালী হইতে রক্তপাত হয়। তাঁহাদের মতে কেবল ভাইটামিন-সি এর অভাব এই রোগের কারণ নহে।

খাদ্য মানবদেহে শক্তির উৎস (Food is the source of energy for man) ঃ আমাদের শরীর সকল সময়েই কিছু না কিছু কাজ করিতেছে। এই অবিশ্রান্ত কাজ করিবার জন্য যে কর্মশক্তির (energy) প্রয়োজন তাহা আসে খাদ্য হইতে। আমরা যে সকল খাদ্য গ্রহণ করি তাহা আমাদের পরিপাক-তন্ত্রের মধ্যে বিভিন্ন জারক রস ও উৎসেচকের সাহায্যে সরলতম অবস্থায় পরিণত হইলে, উহা রক্তের মাধ্যমে দেহকোষে সঞ্চিত হয়। শ্বাসগ্রহণ কালে আমরা যে অক্সিজেন গ্যাস ফুসফুসের মধ্যে টানিয়া লই তাহা রক্তকণিকার হিমোগ্লোবিনের সহিত মিশিয়া দেহকোষে পৌঁছে ও তথাকার সঞ্চিত খাদ্যদ্রব্যকে দহন করে। ফলে আমরা উত্তাপ-শক্তি লাভ করি। কোন একটি মোমবাতিকে দহন করিলে অর্থাৎ ইহার সহিত অক্সিজেন গ্যাস যুক্ত করিলে যেরূপ উহা হইতে উত্তাপ-শক্তি, জল ও অঙ্গারাম্ল গ্যাস উৎপন্ন হয় সেইরূপ শরীর মধ্যে খাদ্য দগ্ধ হইলেও উত্তাপ-শক্তি, জল ও অঙ্গারাম্ল গ্যাস উৎপন্ন হয়। এই শক্তির সাহায্যে আমরা শরীরের যাবতীয় কার্য সম্পাদন করি ও উত্তাপ রক্ষা করি।

সরল খাদ্য + অক্সিজেন = অঙ্গারাম্ল গ্যাস + জল + উত্তাপ-শক্তি

উত্তাপ-শক্তি ও কর্মশক্তি পরস্পর বিনিময়শীল। দেহে যতটা উত্তাপ-শক্তি উৎপন্ন হয় তাহার প্রায় $\frac{1}{6}$ ভাগ কর্মশক্তিতে রূপান্তরিত হয় ও প্রায় $\frac{5}{6}$ ভাগ দেহের উত্তাপ রক্ষার কাজে ব্যয়িত হয়। দহনের ফলে বিভিন্নপ্রকার খাদ্যের উত্তাপশক্তি উৎপন্ন করার ক্ষমতাও বিভিন্ন। কোন খাদ্য দেহের বাহিরে অক্সিজেনে দহন করিলে যে পরিমাণ শক্তি দান করে, দেহের ভিতরের অক্সিজেনে দহন করিলেও সেই পরিমাণ শক্তি দান করে ইহা প্রমাণিত সত্য। সুতরাং বিভিন্নপ্রকার খাদ্যের শক্তি-উৎপাদন ক্ষমতা গবেষণাগারে নির্ণয় করিয়া, কোন জাতীয় খাদ্য কত পরিমাণে খাইলে শুধু তাহা হইতেই দেহের উত্তাপ ও কর্মশক্তি যথাযথ রক্ষিত হয় তাহা জানা যায় এবং সেই অনুযায়ী সুষম খাদ্য-তালিকা নির্মাণ করা হয়।

ফরাসী মাপ অনুযায়ী 1 গ্রাম জলকে 1 ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড উত্তপ্ত করিতে যতটা উত্তাপ প্রয়োজন হয় তাহাকে এক **ক্যালরি** (calorie) বলে। খাদ্য হইতে উৎপন্ন উত্তাপশক্তি নির্ধারণ করিবার জন্যও ক্যালরি একক মান ব্যবহার করা হয়। পরীক্ষার দ্বারা দেখা গিয়াছে যে দৈহিক প্রতি কিলোগ্রাম ওজন পিছু দৈনিক গড়ে 55 ক্যালরি উত্তাপের প্রয়োজন। সুতরাং কোন ব্যক্তির দৈহিক ওজন যত কিলোগ্রাম তাহাকে 55 দিয়া গুণ করিয়া সারাদিনে গড়ে তাহার কত ক্যালরি-যুক্ত খাদ্য আবশ্যক তাহা নির্ধারণ করা যায়। একজন সাধারণ লোকের সম্পূর্ণ বিশ্রামকালে, জাগ্রত অবস্থায় ঘণ্টায় 75 ক্যালরি হিসাবে 16 ঘণ্টায় $75 \times 16 = 1200$ ক্যালরি ও নিদ্রাকালে ঘণ্টায় 60 ক্যালরি হিসাবে 8 ঘণ্টায় $60 \times 8 = 480$ ক্যালরি অর্থাৎ মোট প্রায় 1680 ক্যালরি শক্তি প্রয়োজন হয়। ইহাকে ঐ ব্যক্তির **বেসাল মেটাবলিজ্‌ম** (basal metabolism) বলে। সাধারণ পরিশ্রম কালে ঐ ব্যক্তির আরও প্রায় 1320 ক্যালরি-যুক্ত খাদ্যের প্রয়োজন হয়। সুতরাং 54·5 কিলোগ্রাম ওজন-যুক্ত একজন পূর্ণবয়স্ক পুরুষের সাধারণ পরিশ্রম কালে মোট প্রায় 3000 ক্যালরি-যুক্ত খাদ্য আবশ্যক হয়। এই খাদ্যের মোট ক্যালরির শতকরা প্রায় 15—20 ভাগ প্রোটিন হইতে, 30—35 ভাগ স্নেহ পদার্থ হইতে ও অবশিষ্ট প্রায় 55—60 ভাগ শ্বেতসার ও শর্করা হইতে আসা উচিত।

পরীক্ষার দ্বারা জানা গিয়াছে যে 1 গ্রাম ওজনের প্রোটিন হইতে 4·1 ক্যালরি, স্নেহ বা চর্বি হইতে 9·3 ক্যালরি ও শ্বেতসার হইতে 4 ক্যালরি উত্তাপশক্তি পাওয়া যায়। সুতরাং কোন খাদ্যে যত পরিমাণ প্রোটিন ও শ্বেতসার আছে তাহাকে 4 দিয়া এবং যত পরিমাণ স্নেহ বা চর্বি জাতীয় পদার্থ আছে তাহাকে 9·3 দিয়া গুণ করিয়া যোগ করিলেই সেই খাদ্যের মোট ক্যালরি মান অর্থাৎ সেই

খাদ্যের কতখানি উত্তাপশক্তি দান করিবার ক্ষমতা আছে তাহা নির্ণয় করা যায়। অথবা প্রয়োজনীয় ক্যালরি মান জানা থাকিলে বিভিন্নপ্রকার খাদ্যের পরিমাণ নির্ণয় করা যায়। এই হিসাব অনুযায়ী উপরোক্ত সাধারণ পরিশ্রমকারী ব্যক্তির দৈনিক প্রায় 125 গ্রাম প্রোটিন, 55 গ্রাম স্নেহ পদার্থ ও 500 গ্রাম শ্বেতসার বা শর্করা গ্রহণ করা উচিত।

নিম্নে একটি পূর্ণবয়স্ক পুরুষের পরিশ্রমের তারতম্য অনুসারে দৈনিক কত ক্যালরি উত্তাপশক্তির প্রয়োজন ও তাহা মোটামুটি লাভ করিতে হইলে কোন প্রকার দেহপোষক খাদ্য কি পরিমাণে গ্রহণ করা উচিত তাহার একটি তালিকা দেওয়া হইল।

	কাজের পরিমাণ	দেহপোষক খাদ্য			মোট ক্যালরি
		প্রোটিন	স্নেহ	শ্বেতসার	
পূর্ণবয়স্ক পুরুষ	হালকা কাজ	120 গ্রাম	50 গ্রাম	375 গ্রাম	2400
ওজন—54·5	সাধারণ কাজ	125 "	55 "	500 "	3000
কিলোগ্রাম	কঠোর কাজ	160 "	70 "	575 "	3600

শিশুদের বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দৈনিক ক্যালরি উত্তাপের চাহিদা বৃদ্ধি পায়। নিম্নের তালিকা হইতে উহার একটি ধারণা পাওয়া যাইবে।

বয়স	1—2	2—3	3—6	6—8	8—10	10—12	12—14
ক্যালরি	1000	1250	1550	1890	2150	2550	2900

12 বৎসরের পর একটি শিশুর আহার প্রায় একটি যুবার মতই হয়। একই বয়সের বালকের তুলনায় সেই বয়সের বালিকার মোট ক্যালরি উত্তাপ কম প্রয়োজন হয়। একটি পূর্ণ বয়স্কা স্ত্রীলোকের সাধারণ পরিশ্রমে দৈনিক 2500 ক্যালরি উত্তাপের প্রয়োজন হয় কিন্তু একটি পূর্ণবয়স্ক পুরুষের ঐ পরিশ্রমে প্রায় 3000 ক্যালরি শক্তির উত্তাপ আবশ্যক হয়।

সুষম খাদ্য (Balanced diet): যে খাদ্য কোন ব্যক্তির শরীরের ক্ষয়ক্ষতি পূরণ করিয়া উপযুক্ত পরিমাণে শক্তিদান করিতে পারে তাহাই ঐ ব্যক্তির পক্ষে **সুষম খাদ্য** (balanced diet)। পূর্বে আমরা দেখিয়াছি যে একজন সাধারণ পরিশ্রমকারী ব্যক্তির অন্ততঃ 3000 ক্যালরি যুক্ত খাদ্যের প্রয়োজন। ঐ ব্যক্তি

যে খাদ্য হইতে প্রয়োজনীয় 3000 ক্যালরি উত্তাপশক্তি পাইবে তাহাই উহার সুষম খাদ্য হইবে। সুষম খাদ্যে প্রোটিন, স্নেহপদার্থ, শ্বেতসার, জল, লবণ ও ভাইটামিন উপযুক্ত পরিমাণে থাকা উচিত। কোন একপ্রকার খাদ্যে এই সবগুলির গুণাবলী বর্তমান থাকিতে পারে না। উপরোক্ত কোন একটি খাদ্য খাইয়া দেহের পক্ষে প্রয়োজনীয় ক্যালরি-শক্তি লাভ করাও স্বাস্থ্য বিরুদ্ধ। দুগ্ধ ও ডিমে এইগুলির মধ্যে অনেকগুলি খাদ্য বর্তমান থাকে, সেইজন্য দুগ্ধ ও ডিম শিশু ও রোগীর পক্ষে বিশেষ উপকারী।

সুষম খাদ্যের উপাদানগুলির পরিমাণ, বয়স, দৈর্ঘ্য, ওজন, লিঙ্গ, দেশ, বৃত্তি ও ঋতু ভেদে পরিবর্তন করা উচিত। যথা একটি শিশুর সুষম খাদ্যে যে পরিমাণ প্রোটিন, স্নেহপদার্থ, ক্যালসিয়াম ও লৌহ থাকা উচিত, তাহা একজন বয়স্ক ব্যক্তির পক্ষে প্রয়োজন হয় না। একজন শীতপ্রধান দেশের অধিবাসী যথা এস্কিমোর খাদ্যে যে পরিমাণ স্নেহজাতীয় পদার্থ থাকা উচিত তাহা গ্রীষ্মপ্রধান দেশের অধিবাসীদের খাদ্যে নিষ্প্রয়োজন। নিরামিষাশীদের প্রোটিনের অভাব পূরণ করিবার জন্য সুষম খাদ্যে অন্যান্য উপাদানগুলির পরিমাণ বর্ধিত করিতে হয়, ফলে উহাদিগকে অপেক্ষাকৃত বেশী পরিমাণ খাদ্য পরিপাক করিতে হয়।

সুষম খাদ্য তালিকা নির্মাণকালে, বিভিন্নপ্রকার খাদ্যের ক্যালরিমান সম্বন্ধে জ্ঞান থাকা উচিত। নিম্নে ডাঃ রোজের নির্ণীত তালিকা হইতে মোটামুটি কোন প্রকার খাদ্যের ক্যালরিমান কত তাহা জানা যায়।

	শতকরা প্রোটিন	স্নেহ	শ্বেতসার	1 কিলোগ্রামের ক্যালরি
চাউল	8	0·3	79·0	3381
গম	13·8	1·9	71·9	3464
মাংস	18·0	18·0	—	1338
দুধ	3·0	4·0	5·0	668
ডিম	13·8	11·0	—	1428
মাখন	1·0	81·0	—	7017
মটর	6·7	0·4	17·7	987
কলা	1·2	0·2	23·0	946
আলু	2·0	1·0	19·1	818

আমাদের দেশে পূর্ণবয়স্ক সাধারণ পরিশ্রমী কোন ব্যক্তির পক্ষে প্রয়োজনীয় ক্যালরি-শক্তি পাইতে হইলে মোটামুটি নিম্নতালিকা রূপ দৈনিক খাদ্য গ্রহণ করা উচিত।

খাদ্য	পরিমাণ	তাপের পরিমাণ
চাউল	292 গ্রাম	992 ক্যালরি
আটা	292 ”	876 ”
ডাল	58 ”	176 ”
তরিতরকারী	292 ”	96 ”
সরিষার তৈল	29 ”	252 ”
গুড়	14 ”	50 ”
মাছ বা মাংস	233 ”	185 ”
দুগ্ধ	292 ”	165 ”
ফল	175 ”	70 ”
লবণ	30 ”	
জল	1·87 কিলোগ্রাম	

এই তালিকা অনুযায়ী খাদ্যে প্রায় 2862 ক্যালরি উত্তাপ-শক্তি পাওয়া যায়। অবশিষ্ট পরিমাণ শক্তির জন্য কিছু চিড়া, মুড়ি, নারিকেল, অঙ্কুরিত ছোলা, মিষ্টান্ন প্রভৃতি খাওয়া উচিত। উপরোক্ত দেহপোষক খাদ্যগুলি ব্যতীত খাদ্যে যাহাতে উপযুক্ত পরিমাণে ভাইটামিন, লবণ ও জল প্রভৃতি দেহসংরক্ষক খাদ্যগুলিও বর্তমান থাকে তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখা উচিত। কিছু পরিমাণ বিলাতী বেগুন, লেবু, লেটুস, কড়াইশুঁটি, পালংশাক, পিঁয়াজ ইত্যাদি খাইলে উপযুক্ত পরিমাণ ভাইটামিন পাওয়া যায়। দৈনিক খাদ্যের সহিত অন্ততঃ 1·87 কিলোগ্রাম (প্রায় 2 সের) জল খাওয়া উচিত।

শিশুদের প্রতি কিলোগ্রাম ওজন পিছু বয়স্কদের তুলনায় বেশী ক্যালরিযুক্ত খাদ্যের প্রয়োজন হয়। এই ক্যালরিমানের 12-13 ভাগ প্রোটিন খাদ্য হইতে, অন্ততঃ 20 ভাগ স্নেহ পদার্থ হইতে ও বাকী অংশ শ্বেতসার হইতে আসা উচিত। শিশুদের সুষমখাদ্যে দৈনিক অন্ততঃ 1 সের দুগ্ধ ও কিছু জান্তব স্নেহ পদার্থ যথা কড মাছের তৈল, মাখন ইত্যাদি থাকিলে ভাল হয়। বয়স্ক ব্যক্তিদের খাদ্যে স্নেহপদার্থ ও প্রোটিনের

একটি শোলার বলকে শব্দায়মান স্বরশলাকার বাহুর সহিত স্পর্শ করিয়া ঝুলাইয়া রাখিলে দেখা যায় যে, বলটি স্বরশলাকার গায়ে বার বার আঘাত খাইয়া দূরে সরিয়া যাইতেছে। এখন স্বরশলাকার বাহু দুইটিকে হাত দিয়া চাপিয়া ধরিয়া ছাড়িয়া দিলে উহার স্পন্দন বন্ধ হইবে এবং সঙ্গে সঙ্গে শব্দও বন্ধ হইবে। ইহার দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, স্বরশলাকা স্পন্দিত হইতেছে এবং স্পন্দন বা কম্পন হইতেই শব্দের উদ্ভব হইতেছে।

সেতার, পিয়ানো, এসরাজ প্রভৃতি বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্রের তার (String) স্পন্দিত হইলে শব্দ সৃষ্টি হয়। বাঁশিতে ফুঁ দিলে, হাতুড়ি দিয়া পেরেকের উপর আঘাত করিলে বস্তুর কম্পন হয় এবং ঐ কম্পন হইতেই যে শব্দের উৎপত্তি তাহা সহজেই বোঝা যায়।

শব্দ নির্দিষ্ট বেগে চলে। 0°C তাপমাত্রায় বায়ু-মাধ্যমে শব্দের বেগ প্রতি সেকেণ্ডে প্রায় 1120 ফুট বা 320 মিটার। বিভিন্ন মাধ্যমে শব্দের বেগ বিভিন্ন। গ্যাসে বা বায়ুতে শব্দের যে বেগ তাহা কঠিন ও তরল পদার্থের মধ্যে শব্দের বেগ হইতে ভিন্ন। 8·1°C তাপমাত্রায় জলে (তরল) শব্দের বেগ প্রতি সেকেণ্ডে প্রায় 1436 মিটার। লোহার (কঠিন পদার্থ) ভিতর শব্দের বেগ বায়ু মধ্যে শব্দের বেগের প্রায় 9 গুণ।

দ্বিতীয় অধ্যায়

3. শব্দের বিস্তারের জন্য বস্তু মাধ্যম প্রয়োজনীয় (Material medium is necessary for the propagation of sound) :

স্পন্দনশীল বস্তু হইতে শব্দ আমাদের কানে পৌঁছাইলে আমরা শুনিতে পাই। যে বস্তুর মধ্য দিয়া শব্দ আমাদের কানে পৌঁছায় তাহাকেই শব্দের মাধ্যম বলা হয়। সচরাচর বায়ু মাধ্যমেই শব্দ সঞ্চালিত হয়। সম্পূর্ণ বায়ুশূন্য অবস্থায় শব্দ সঞ্চারিত হয় না। কঠিন, তরল অথবা বায়ু মাধ্যমের মধ্য দিয়া শব্দ সঞ্চারিত হয়। নিম্নে বর্ণিত পরীক্ষার দ্বারা আমরা প্রমাণ করিতে পারি যে বায়ু (বস্তু) মাধ্যম না থাকিলে শব্দ আমাদের কানে পৌঁছাইতে পারে না।

পরীক্ষা ঃ—একটি বায়ু নিষ্কাশন পাম্পের উপর একটি বড় কাচপাত্র (বেল্‌জার) বায়ু নিরুদ্ধ করিয়া বসান হয়। কাচপাত্রের উপরের খোলা মুখ একটি কর্ক দ্বারা আটকান হয়। পাত্রে একটি বৈদ্যুতিক ঘণ্টা উপর হইতে নীচের দিকে ঝুলান হয় (চিত্র 2)। একটি উপযুক্ত ব্যাটারীর সহিত বৈদ্যুতিক ঘণ্টার সংযোগ করিয়া দেওয়া হয়। তড়িৎ বর্তনীতে একটি টেপা চাবি থাকে। চাবি টিপিলে বৈদ্যুতিক প্রবাহ ঘণ্টার ভিতর দিয়া যাইবে এবং হাতুড়ি ঘণ্টার উপর আঘাত করিবে ও সঙ্গে সঙ্গে শব্দ হইবে এবং উহা স্পষ্ট শুনিতে পাওয়া যাইবে। যতক্ষণ কাচপাত্রটিতে বায়ু থাকিবে ততক্ষণ সেতার টিপিলে ঘণ্টার শব্দ শুনিতে পাওয়া যাইবে। এখন পাম্প চালাইয়া দিলে পাত্র হইতে বায়ু ধীরে ধীরে অপসারিত হইবে এবং ঘণ্টার শব্দ ক্ষীণ হইতে হইতে শেষ পর্যন্ত আর প্রায় শুনা যাইবে না। ভিতরে বায়ু আবার প্রবেশ করিতে দিলে শব্দ পুনরায় শুনিতে পাওয়া যাইবে। সুতরাং এই পরীক্ষা হইতে ইহাই প্রমাণিত হয় যে, বায়ুশূন্য স্থানের মধ্য দিয়া শব্দ চলিতে পারে না অর্থাৎ শব্দ সঞ্চারণের জন্য জড় মাধ্যমের প্রয়োজন। এইজন্য চন্দ্রে বা অন্য কোন গ্রহে যদি বিরাট বিস্ফোরণ কিছু হয় তাহার শব্দ পৃথিবীতে কখনও পৌছাইবে না। চাঁদ ও পৃথিবীর মধ্যে বেশীর ভাগ স্থান শূন্য থাকায় অর্থাৎ কোন জড়মাধ্যম না থাকায় শব্দ পৃথিবীতে আসিতে পারে না। কঠিন ও তরল মাধ্যমের ভিতর অর্থাৎ যে কোন পার্থিব বস্তুর ভিতর দিয়াও শব্দ বিস্তার করে।



চিত্র 2
কাচপাত্র হইতে বায়ু বাহির করিয়া লইলে বৈদ্যুতিক ঘণ্টার শব্দ শোনা যাইবে না

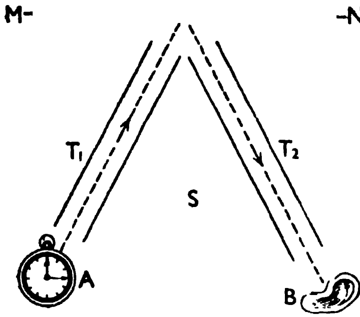
4. শব্দের প্রতিফলন (Reflection of Sound) ঃ

দর্পণের সাহায্যে আলোকের প্রতিফলনের ন্যায় উপযুক্ত প্রতিফলকের সাহায্যে শব্দেরও প্রতিফলন সম্ভব। আলোক যেমন প্রতিফলনের দুইটি নিয়ম মানিয়া চলে শব্দের প্রতিফলনও তেমন ঐ দুইটি নিয়ম দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। কিন্তু আলোকের তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য অপেক্ষা শব্দের তরঙ্গদৈর্ঘ্য বড় বলিয়া শব্দের ক্ষেত্রে প্রতিফলক তলটি বেশ বড় হওয়া প্রয়োজন। ঐ তল খুব মসৃণ না হইলেও চলে। সেইজন্য বাড়ির

দেওয়াল, পাহাড়ের গাত্র, গাছের সারি প্রভৃতি হইতেও শব্দ-তরঙ্গ প্রতিফলিত হইতে পারে।

5. শব্দের প্রতিফলনের পরীক্ষা :

চিত্র 3-এ *MN* একটি কাঠের তৈয়ারী সমতল প্রতিফলক বোর্ড। উহাকে খাড়াভাবে শক্ত করিয়া বসান হইয়াছে। ইহার সামনে তলের সঙ্গে একটি নির্দিষ্ট সূক্ষ্ম কোণ করিয়া T_1 ফাঁপা নলটি বসানো আছে, উহা বোর্ডের সহিত O বিন্দুতে মিলিত হইয়াছে। এই নলটির অনুরূপ আর একটি নল T_2 এমন ভাবে বসানো হয় যেন উহার অক্ষ সর্বদা O বিন্দুর দিকে থাকে। এই দুই নলের মাঝখানে S একটি কাঠের পার্টিসান। শব্দ সোজাসুজি-ভাবে কানে যাহাতে না পৌছায় তাহার জন্য ইহা রাখা হয়। নলটির বহির্মুখে একটি ঘড়ি (টাইম পিস্) বসাইয়া T_2 নলের বহির্মুখে কান পাতিয়া রাখিয়া উহার O প্রান্তকে ঠিক রাখিয়া উহাকে আস্তে আস্তে ঘুরাইলে এমন এক অবস্থান আসিবে যখন স্পষ্ট টিক্ টিক্ শব্দ শোনা যাইবে। মাপিলে দেখা যাইবে যে আপতন কোণ $\angle AOS$ = প্রতিফলন কোণ $\angle BOS$। এখন T_2 নলটি দক্ষিণে বা বামে যদি ঘুরানো যায় তবে শব্দ আর শোনা যাইবে না হা হইতে প্রমাণ করা যায় যে আলোকের ন্যায় শব্দও প্রতিফলকের তলে এমনভাবে প্রতিফলিত হয় যে, শব্দের আপতন কোণ উহার প্রতিফলন কোণের সমান হয়। প্রতিফলিত শব্দরশ্মি এবং আপতিত শব্দরশ্মি অর্থাৎ T_1 নলের অক্ষ, T_2 নলের অক্ষ এবং আপতন বিন্দুতে (O) বোর্ডের উপর অভিলম্ব (Normal) একই সমতলে অবস্থিত।



চিত্র 8
শব্দের প্রতিফলন

শব্দ প্রতিফলনের ব্যবহারিক প্রয়োগ :

(1) ডাক্তারেরা রোগীর বুক পরীক্ষা করিবার জন্য Stethoscope নামক যে যন্ত্রটি ব্যবহার করিয়া থাকেন তাহা শব্দ প্রতিফলনের ব্যবহারিক প্রয়োগ মাত্র। ইহাতে দুইটি রবারের লম্বা নল থাকে এবং নল দুইটি এক জায়গায় মিলিত হইয়া একটি বীতব নলের সহিত যুক্ত থাকে এবং উহা অপর একটি পাতলা পর্দাযুক্ত

(Diaphragm) যন্ত্রের সহিত যুক্ত থাকে। এই যন্ত্র রোগীর বুকে রাখিলে শব্দরশ্মি নলের দেওয়াল হইতে বার বার প্রতিফলিত হইয়া ক্রমে ডাক্তারের কানে আসিয়া পৌছায়।

(2) বড় বড় মোটরগাড়িতে আরোহী ও চালকের মধ্যে কথাবার্তা চালাইার জন্য একপ্রকার নল ব্যবহার করা হয়, ইহাকে Speaking tube বলে। এই নলের একদিকে কেহ কথা বলিলে নলের গায়ে শব্দরশ্মি বারবার প্রতিফলিত হইয়া অন্য প্রান্তে পৌছায় এবং শব্দ স্পষ্ট শোনা যায়।

গ্রামোফোনের চোঙ, বধিরেরা বা যারা কানে কম শুনিতে পায় তাহারা যে যন্ত্র ব্যবহার করে তাহার নাম Ear-trumpet। ইহাতেও শব্দের প্রতিফলনকে কাজে লাগান হয়।

6. **প্রতিধ্বনি (Echo)**ঃ ধ্বনির পুনরাবৃত্তিকে **প্রতিধ্বনি** বলে। ধ্বনি বা শব্দের প্রতিফলনের জন্যই প্রতিধ্বনির সৃষ্টি হয়। কোন প্রাচীরের বা পাহাড়ের অনতিদূরে দাঁড়াইয়া, রাত্রিবেলা নদীর পাড়ে দাঁড়াইয়া, ইঁদারার উপর মুখ রাখিয়া শব্দ করা হইলে অল্পক্ষণ পরেই সেই শব্দের পুনরাবৃত্তি শোনা যায়। সুতরাং কোন প্রতিফলক হইতে ফিরিয়া আসা ধ্বনিই প্রতিধ্বনি। গাছের সারি ও বড় বাড়ির দেওয়াল, পাহাড়ের খাড়া ধার প্রতিফলকের কার্য করে। কিন্তু শব্দ করিলেই যে শব্দের প্রতিধ্বনি শুনিতে পাওয়া যাইবে তাহা নহে। কোন ধ্বনি আমাদের কানে পৌছিবার পর তাহার রেশ কিছুক্ষণ যাবং ($\frac{1}{10}$ সেকেণ্ড কাল) স্থায়ী হয়। ইহাকে **শব্দ-নিবন্ধ** (Persistence of hearing) বলে। যদি মূল শব্দ শেষ হইবার মধ্যেই ঐ প্রতিফলিত শব্দ কানে আসিয়া পৌছায় তাহা হইলে উহা মস্তিষ্কে কোন অনুভূতি জাগাইবে না। কেননা তখন ধ্বনি ও প্রতিধ্বনির ভিতর কোন পার্থক্য করা যায় না। সুতরাং প্রতিধ্বনি কানে পৌছাইবার মধ্যে কমপক্ষে $\frac{1}{10}$ সেকেণ্ড সময় অতিবাহিত করিতে হইবে এবং শব্দ ও প্রতিফলনের দূরত্ব অন্ততঃ এতটা হওয়া দরকার যাহাতে একটি শব্দের রেশ শেষ হইবার পূর্বেই প্রতিধ্বনি বক্তার নিকট যেন উপস্থিত না হয়। এখন বায়ুতে শব্দের বেগ যদি সেকেণ্ডে 1120 ফুট ধরা হয় তাহা হইলে $\frac{1}{10}$ সেকেণ্ডে শব্দ বায়ুতে 112 ফুট যাইতে পারে। সুতরাং প্রতিফলক বক্তা হইতে অন্ততঃ $\frac{112}{2}$ বা 56 ফুট দূরে রাখিতে হইবে। ঐ দূরত্ব 56 ফুটের কম হইলে, শব্দের অনুভূতির স্থায়িত্বকালের মধ্যে প্রতিধ্বনি ফিরিয়া আসিয়া ধ্বনির সহিত মিশিয়া এক বিভ্রান্তি সৃষ্টি করিবে।

আবার, আমরা সেকেণ্ডে 5টির বেশী শব্দাংশ (syllable) স্পষ্ট উচ্চারণ করিতে

পারি না এবং কানও উহার বেশী শুনিয়া স্পষ্ট বুঝিতে পারে না। সুতরাং একমাত্রিক (monosyllabic) যেমন 'a', শব্দ উচ্চারণ করিলে উহাতে $\frac{1}{5}$ সেকেণ্ড সময় লাগিবে। কাজেই ধ্বনি ও প্রতিধ্বনির মধ্যে ন্যূনতম সময়ের ব্যবধান থাকিবে $\frac{1}{5}$ সে.। বায়ুতে শব্দের বেগ সেকেণ্ডে 1120 ফুট হইলে ঐ $\frac{1}{5}$ সেকেণ্ডে শব্দ যাইবে $\frac{1120}{5}$ বা 224 ফুট। অতএব এক সেকেণ্ডে একমাত্রিক শব্দের প্রতিধ্বনি শুনিতে হইলে প্রতিফলকের দূরত্ব কমপক্ষে $\frac{224}{2}$ বা 112 ফুট হওয়া দরকার। তেমনি দ্বিমাত্রিক (Disyllabic), ত্রিমাত্রিক (Trisyllabic) শব্দের ক্ষেত্রে এই দূরত্ব যথাক্রমে 112×2 ফুট বা 224 ফুট এবং 112×3 ফুট বা 336 ফুট হওয়া প্রয়োজন।

কখনও কখনও কোন মূল ধ্বনির বার বার প্রতিফলনের জন্য একবার শব্দ করিয়া অনেক প্রতিধ্বনি শোনা যায়। দুইটি সমান্তরাল পাহাড়ের মাঝখানে দাঁড়াইয়া একবার শব্দ করিলে বা বন্দুক ছুঁড়িলে ঐ শব্দ দুই পাহাড়ের গা হইতে বারবার প্রতিফলিত হইয়া একাধিকবার প্রতিধ্বনি সৃষ্টি করে। বিভিন্ন স্তরের মেঘ কর্তৃক বার বার প্রতিফলনের জন্যই মেঘের অবিচ্ছিন্ন গুরু গুরু ধ্বনি সৃষ্টি হয়। বিভিন্ন মেঘ হইতে ধ্বনি উৎপন্ন হয় এবং তাহা $\frac{1}{10}$ সেকেণ্ডের মধ্যে আমাদের কানে আসিয়া পৌঁছায় বলিয়া আমরা মেঘের ধ্বনি ও প্রতিধ্বনির মধ্যে কোন পার্থক্য নির্ণয় করিতে পারি না।

আমরা যখন খালি বড় হল ঘরে শব্দ করি তখন আমরা ঘরে অনেকক্ষণ ধরিয়া সেই গম্‌গম্‌ শব্দ শুনিতে পাই। এই ধ্বনের শব্দকে **অনুরণন** (Reverberation) বলা হয়। আওয়াজ হইতে উৎপন্ন শব্দ-তরঙ্গমালা ঘরের দেওয়াল কর্তৃক পুনঃপুনঃ প্রতিফলনের জন্যই হইয়া থাকে। দেওয়ালের গায়ে, জানালার পর্দা, ঘরে চেয়ার, টেবিল প্রভৃতি আসবাব পত্র বেশী থাকিলে ইহারা এই শব্দকে শোষণ করিয়া লয় বলিয়া সাধারণতঃ আসবাব পূর্ণ ঘরে ঐরূপ গম্‌গম্‌ শব্দ শোনা যায় না। শব্দের প্রতিধ্বনির সাহায্যে সমুদ্রের গভীরতা বা উড়োজাহাজের উচ্চতা নির্ণয় করা হয়। সমুদ্রের গভীরতা মাপিবার জন্য হাইড্রোফোন (Hydrophone) নামক একটি গ্রাহক যন্ত্র জলের ভিতর রাখা হয়। একটি বিস্ফোরণের সাহায্যে শব্দ সৃষ্টি করিয়া সেই শব্দকে সমুদ্রের তলদেশ হইতে প্রতিফলিত হইয়া আসিতে দেওয়া হয়। মূলশব্দ অর্থাৎ ধ্বনি এবং প্রতিধ্বনির মধ্যবর্তী সময়ের ব্যবধান হাইড্রোফোন সংযুক্ত একটি স্বয়ংক্রিয় বৈদ্যুতিক যন্ত্রের সাহায্যে মাপা হয়। যদি এই সময়ের ব্যবধান T, সমুদ্র জলে শব্দের বেগ V হয়, তবে শব্দ মোট দূরত্ব

অতিক্রম করিবে VT, ইহা সমুদ্র-গভীরতার দ্বিগুণ। সুতরাং D সমুদ্র-গভীরতা হইলে $D = \frac{VT}{2}$.

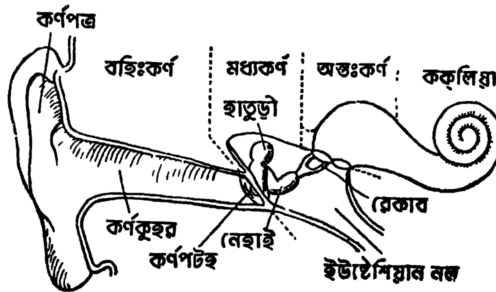
সমুদ্রের গভীরতা মাপিবার কাজে শব্দোত্তর তরঙ্গ (Supersonic Waves) নামক একপ্রকার তরঙ্গ ব্যবহার সর্বাপেক্ষা সুবিধাজনক। ইহার কম্পন-সংখ্যা সেকেণ্ডে 20,000-এর অধিক। এইরূপ তরঙ্গ কানে শোনা যায় না বটে কিন্তু সরলরেখায় যায় এবং সমুদ্রের জলে ইহার সৃষ্টি হইলে সোজা চলিয়া যাইবে এবং কোন প্রতিবন্ধকের গায়ে ধাক্কা লাগিলে সহজেই প্রতিফলিত হইবে।

7. আমাদের শব্দের অনুভূতি ও কর্ণ (How we hear ; human ear) :

শব্দ সন্ধানী : কোন মাধ্যমের মধ্য দিয়া যখন শব্দ প্রবাহিত হয় তখন ঐ স্থানে উপযুক্ত যন্ত্র রাখিলে উহাতে ঐ শব্দের সাড়া পাওয়া যায়। ঐ প্রকার যন্ত্রকে **শব্দ সন্ধানী** (Sound detector) বলে। মানুষের কর্ণ বা শ্রবণ-যন্ত্র একটি উৎকৃষ্ট শব্দ সন্ধানী যন্ত্র।

কর্ণ (Ear) : মানুষের কর্ণের তিনটি অংশ আছে—(1) বহিঃকর্ণ (External ear), (2) মধ্যকর্ণ (Middle ear) এবং (3) অন্তঃকর্ণ (Internal ear)। 4 চিত্রে কর্ণের বিভিন্ন অংশের গঠন দেখান হইয়াছে।

(1) বহিঃকর্ণ : একটি ছিদ্রবিশেষ। ইহার বাহিরের অংশই আমাদের নিকট **কান** বা **কর্ণপত্র** (Pinna) বলিয়া পরিচিত। ইহা চ্যাপ্টা ও প্রায়



চিত্র 4

ফানেলের আকৃতিবিশিষ্ট। ইহার সহিত একটি নলের যোগ আছে যাহাকে **কর্ণকুহর** বলা হয়। এই নলের শেষে একটি পর্দা (membrane) আছে

যাহার নাম **কর্ণপটহ** (Ear drum or tympanic membrane)। এই স্থান হইতেই মধ্যকর্ণের সীমা আরম্ভ। বহিঃকর্ণের কাজ হইতেছে স্বনক হইতে সৃষ্ট শব্দতরঙ্গকে শ্রবণ-অনুভূতির জন্য সংগ্রহ করা। বহিঃকর্ণ যে শব্দ সংগ্রহ করে তাহা কর্ণকুহরের মধ্য দিয়া কর্ণপটহে আঘাত করে।

(2) **মধ্যকর্ণ**ঃ ইহা অস্থি দ্বারা বেষ্টিত একটি অসমান গহ্বর বিশেষ। ইহার মধ্যে বায়ু থাকে। এই গহ্বরের এক সীমান্তে কর্ণপটহ বা কানের পর্দা ও অপর দিকে অন্তঃকর্ণের সহিত সংযোগকারী ডিম্বাকৃতি **গবাক্ষের** (Fenestra-ovalis) আচ্ছাদনী। এই গহ্বরের মধ্যে তিনটি খণ্ড অস্থি **হাতুড়ি** (Hammer bone বা Malleus), **নেহাই** (Anvil বা Incus বা stapes) ও **রেকাব** Stirrup বা stapes) রহিয়াছে।

প্রথম অস্থির সহিত কর্ণপটহের এবং শেষ অস্থির সহিত অন্তঃকর্ণের সংযোগ আছে। এই অস্থি তিনটি কর্ণপটহ হইতে শব্দ-তরঙ্গ বহন করিয়া অন্তঃকর্ণে পৌছাইয়া দেয়। কর্ণপটহের উভয় দিকে বায়ুর চাপের সমতা রক্ষণ করিবার জন্য মধ্যকর্ণের গহ্বরটি একটি নলের সাহায্যে মুখের সহিত যুক্ত থাকে। ঐ নলকে **ইউষ্টেশিয়ান নল** (Eustachian tube) বা **শ্রুতিনালী** বলে। কর্ণকুহরের বায়ুতে তরঙ্গ প্রবেশ করিয়া কর্ণপটহে কম্পন সৃষ্টি করে। কানের পর্দা কাঁপিতে থাকে। ইহার ফলে এই কম্পন হাতুড়ি, নেহাই ও রেকাবকে কাঁপাইতে থাকে। রেকাবের শেষ প্রান্ত কাঁপিয়া অন্তঃকর্ণে কম্পন সৃষ্টি করে।

(3) **অন্তঃকর্ণ**ঃ অন্তঃকর্ণের গঠনপ্রণালী খুবই জটিল ও চক্রাকার। সেইজন্য ইহাকে **চক্রাকার প্রণালী** (Labyrinth) বলে। ইহার ভিতর একটি পেঁচানো নল আছে। তাহাকে **ককলিয়া** (Cochlea) বলে। এই নলটি আগাগোড়া, অস্থি ও ঝিল্লি আবরণ দ্বারা দুইটি অংশে বিভক্ত। ঝিল্লির পর্দার গায়ে বহু সংখ্যক তন্ত্রী আছে। নলের ভিতরে জেলির ন্যায় একপ্রকার তরল পদার্থ আছে। স্নায়ুর দ্বারা এই নলের সঙ্গে মস্তিষ্কের শব্দগ্রাহী নার্ভের সংযোগ আছে। অন্তঃকর্ণে আরও তিনটি বৃত্তাকৃতি নল আছে। ঐগুলিকে **অর্ধ-বৃত্তাকার** (Semicircular canal) বলে। উহারা শ্রুতিবোধে অংশ গ্রহণ করে না। খুব সম্ভব মানুষ ইহাদের সাহায্যে নিজের ভারসাম্য রক্ষা করে। অন্তঃকর্ণে যখন কম্পন সৃষ্টি হয় তখন শব্দের জাতি ও তীক্ষ্ণতা অনুযায়ী বিভিন্ন তন্ত্রীতে সাড়া জাগায় ও তাহা স্নায়ুবাহিত হইয়া মস্তিষ্কে শব্দের অনুভূতি জাগায় ও আমরা শব্দ শুনিতে পাই।

প্রশ্নাবলী

1. শব্দ কাহাকে বলে? শব্দের জন্য যে কম্পমান বস্তুর প্রয়োজন, তাহা একটি পরীক্ষা দ্বারা বুঝাইয়া দাও।

2. শব্দ কি শূন্যস্থান দিয়া যাইতে পারে? কি পরীক্ষা দ্বারা তোমার উত্তরের সত্যতা প্রমাণ করিতে পার? পৃথিবীর উপর বোমা বিস্ফোরণের শব্দ কি চাঁদে পৌঁছাইতে পারে? [H. S. Exam. 1961]

3. আলোকের ন্যায় শব্দেরও প্রতিফলন হয় ইহা পরীক্ষার দ্বারা প্রমাণ কর। শব্দ প্রতিফলনের কয়েকটি ব্যবহারিক প্রয়োগ উল্লেখ কর।

4. প্রতিধ্বনি কাহাকে বলে? ইহার সাহায্যে কেমন করিয়া সমুদ্রের গভীরতা নির্ণয় করা যায়?

5. নিম্নলিখিত প্রশ্নটির পার্শ্বে তিনটি উত্তর দেওয়া আছে। তিনটির মধ্যে একটি মাত্র সঠিক। কেবলমাত্র সঠিক উত্তরটির নীচে একটি রেখা টান।

মেঘের গুরু গুরু ধ্বনি হয় কেন? উত্তর :—(i) শব্দের পুনঃপুনঃ প্রতিফলনের জন্য; (ii) একসঙ্গে বহু মেঘের শব্দ হয় বলিয়া; (iii) মেঘগুলির দ্রুত কম্পনের জন্য।

6. চিত্র সহ কর্ণের বিভিন্ন অংশের গঠন-প্রণালী এবং উহাদের কার্য-প্রণালী বর্ণনা কর।

দ্বিতীয় অধ্যায়

বিদ্যুৎ (Electricity)

তড়িৎ প্রবাহ, ভোল্টার তড়িৎ কোষ ও তড়িৎ-বিভব
(Electric current, Voltaic cell, Electric Potential)

8. তড়িৎ (Electricity) :

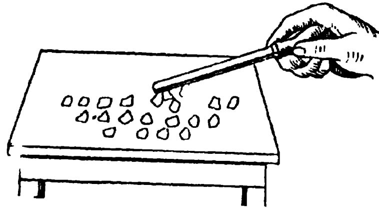
বর্তমান যুগকে আমরা 'তড়িতের যুগ' বলিয়া অভিহিত করি। বর্তমান বিশ্বের বিস্ময়কর নানাবিধ বিষয়ের উন্নতির মূলে রহিয়াছে প্রবাহী তড়িতের ব্যাপক প্রয়োগ এবং উহার সাফল্যের জন্যই আধুনিক যুগের নাম 'তড়িতের যুগ'। তড়িৎ ছাড়া আমাদের দৈনন্দিন জীবনের সুখস্বাচ্ছন্দ্য, আনন্দ কোন কিছুরই যেন আজ আমরা কল্পনা করিতে পারি না। তাপ, আলোক এবং শব্দ শক্তির ন্যায় বিদ্যুৎ একপ্রকার শক্তি। বিদ্যুৎকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়—(1) স্থির বিদ্যুৎ (Statical electricity) ও (2) চল বিদ্যুৎ (Current electricity)।

আকাশে মেঘের কোলে বিদ্যুতের খেলা দেখিয়াছ ও বিদ্যুৎ চমকাবার পর প্রচণ্ড শব্দও শুনিয়াছ। মানব-সভ্যতার আদিমকাল হইতে আকাশে বিদ্যুতের খেলা মানুষের মনকে আকৃষ্ট করিয়া আসিতেছে। আর আজ আধুনিক বিশ্বে বিজ্ঞানীদের তড়িৎশক্তি লইয়া খেলার ফল এক যুগান্তর সৃষ্টি করিয়াছে। টেলিগ্রাফ, টেলিফোন, রেডিও, টেলিভিসন, বৈদ্যুতিক আলো, পাখা, ডায়নামো, মোটর প্রভৃতিতে যে বৈদ্যুতিক শক্তি কাজে লাগানো হয় তাহার সহিত আকাশের বিদ্যুতের কোন পার্থক্য নাই—দুইই মূলতঃ একই প্রকার শক্তি। যে সকল ক্ষেত্রে বিদ্যুৎ কোন পদার্থে স্থির ভাবে থাকে ঐ সকল ক্ষেত্রে উহাকে **স্থির বিদ্যুৎ,** আর যে সকল ক্ষেত্রে উহা প্রবাহমান থাকে ঐ সকল ক্ষেত্রে উহাকে **চল** বা **প্রবাহী-তড়িৎ** বলা হয়। বায়ুমণ্ডলের উত্তপ্ত বায়ু হাল্কা হইয়া উপরে উঠিবার সময় বায়ুস্থিত জলীয় বাষ্পকণার সহিত ঘর্ষণের ফলেই আকাশে বিদ্যুৎ উৎপন্ন হইয়া মেঘে সঞ্চিত হয়।

ঘর্ষণে তড়িৎ সৃষ্টি (Electrification by rubbing) **:**

আজ হইতে প্রায় 2560 বৎসর পূর্বে প্রাচীন গ্রীক পণ্ডিতগণ লক্ষ্য করিয়াছিলেন, Amber নামক একপ্রকার পদার্থকে রেশমী কাপড় দ্বারা ঘর্ষণ করিলে পদার্থটির মধ্যে

আকর্ষণী শক্তি জন্মায়। ঐ শক্তির দ্বারা আম্বার (Amber) কাগজের টুকরা আকর্ষণ করিতে পারে অর্থাৎ ঘর্ষণের দ্বারা আম্বারের মধ্যে বিদ্যুৎ উৎপাদিত হয় বলিয়া উহার মধ্যে আকর্ষণী শক্তি জন্মায়। সেলুলয়েডের চিরুণী দ্বারা পরিষ্কার শুষ্ক চুল আঁচড়াইলে চিরুণী চুলকে আকর্ষণ করে। তখন পট্ পট্ শব্দ হয়।



চিত্র 5

ঘর্ষণ জনিত বিদ্যুৎ

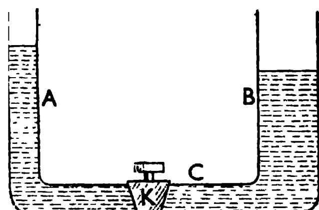
পরীক্ষা ঃ একটি ইবোনাইটের দণ্ড ও এক টুকরা ফ্লানেলের কাপড় লইয়া রৌদ্রে রাখিয়া শুষ্ক ও উষ্ণ করা হইল (চিত্র 5)। দণ্ডটির একপ্রান্ত হাতে ধরিয়া অপর প্রান্ত ঐ কাপড় দ্বারা বেশ কয়েকবার ঘর্ষণ করিয়া টেবিলের উপর রক্ষিত ছোট ছোট কাগজের টুকরার সামনে ধরা হইল। লক্ষ্য করা হইল যে, ঐ কাগজের টুকরাগুলি দণ্ড কর্তৃক আকৃষ্ট হইতেছে। টুকরাগুলি লাফাইয়া উহার গায়ে গিয়া লাগে। ঐরূপ অবস্থায় দণ্টি তড়িতাহিত হইয়াছে বলা হয়। কিন্তু ঘর্ষণের পূর্বে ঐ দণ্ডটি কাগজ টুকরাগুলিকে আকর্ষণ করে নাই। কাচের দণ্ডকে রেশমী কাপড় দ্বারা ঘষিলেও অনুরূপ ফল পাওয়া যায়। বিদ্যুতের প্রকৃতি দুই প্রকার—**পজিটিভ** (Positive) এবং **নেগেটিভ** (Negative)। একটি অপরটির বিপরীতধর্মী।

9. তড়িৎ প্রবাহ ও তড়িৎ বিভব (Electric current and Electric potential) ঃ

বিভব ও বিভব-প্রভেদ সম্পর্কে ধারণা সুস্পষ্ট না হইলে পবাহী তড়িৎ-বিজ্ঞান সম্বন্ধে কিছুই বোধগম্য হইবে না। আমরা জানি যে জল উঁচু হইতে নীচুতে গড়াইয়া পড়ে। পাহাড় পর্বত হইতে বৃষ্টির জল গড়াইয়া সমতল ভূমিতে নামিয়া আসিয়া নদীর সহিত মিশিয়া প্রবাহিত হইতে থাকে। অবশ্য কখন কখন এরূপও পরিলক্ষিত

হয় যে জল নীচুতল হইতে আপনা আপনি উঁচুতলে যাইতেছে। ইহার কারণ বিভিন্ন। একটি পরীক্ষার দ্বারা এই প্রবাহ বেশ পরিষ্কারভাবে বুঝান যাইবে।

পরীক্ষা ঃ—A ও B দুইটি একমুখ খোলা পাত্র একটি পাইপ C দ্বারা সংযুক্ত করা হইল (চিত্র 6)। স্টপকর্ক (K) বন্ধ করিয়া পাত্র দুইটিতে এমনভাবে জল চালান হইল যে A পাত্রে জলের উচ্চতা (level) B পাত্র হইতে বেশী হয়। এইবার স্টপকর্কটি খুলিয়া দিলে দেখা যাইবে যে, A পাত্র হইতে জল C পাইপের মধ্য দিয়া B পাত্রে যাইতেছে। যতক্ষণ না A ও B পাত্র দুইটির জলের উচ্চতা ঠিক সমান হয় ততক্ষণ এই জলপ্রবাহ চলিবে অর্থাৎ জলের তল এক হইলে জলপ্রবাহ বন্ধ হইবে। সুতরাং জলের তল দেখিয়া আমরা বুঝিতে পারি যে, কোন্ দিক হইতে কোন্ দিকে জলের প্রবাহ হইবে। জলের পরিমাণ দ্বারা এই প্রবাহের দিক বলা সম্ভবপর হইবে না।



চিত্র 6
স্টপকর্ক খুলিয়া দিলে জল A পাত্র হইতে B পাত্রে যাইবে।

তড়িৎ প্রবাহের ক্ষেত্রেও ঠিক অনুরূপ ব্যাপার ঘটে। যখনই কোন বস্তুকে তড়িতাহিত (electrified) করা হয় তখন তাহার এমন একটি তড়িতাবস্থার সৃষ্টি হয় যাহা দ্বারা বলিতে পারা যায় যে উক্ত বস্তুটি অন্য বস্তুকে তড়িৎ দিবে কিংবা অন্য বস্তু হইতে তড়িৎ গ্রহণ করিবে। এই অবস্থাকে উহার **'তড়িৎ-বিভব'** বলে। সুতরাং তড়িৎ-বিভবকে জলের তলের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে।

যদি দুই বস্তু তড়িতাহিত হয় এবং একটির বিভব অপরটির বিভব অপেক্ষা বেশী হয় তবে ঐ দুই বস্তুকে একটি ধাতব তার দ্বারা যুক্ত করিয়া দিলে উচ্চ বিভব বিশিষ্ট বস্তু হইতে সর্বদা নিম্নবিভববিশিষ্ট বস্তুতে তড়িৎ যাইতে থাকিবে যতক্ষণ না দুই বস্তুর বিভব সমান হয়। তড়িতাধানের এই প্রবাহকে **তড়িৎ প্রবাহ** বলে।

10. তড়িৎ সু-পরিবাহী, কু-পরিবাহী ও অ-পরিবাহী বস্তু (Good conductor, bad conductor and non-conductor of electricity) ঃ

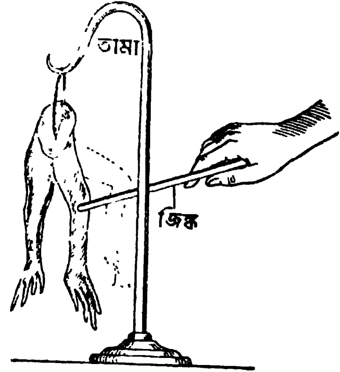
আমরা দেখিয়াছি পজিটিভ চার্জ সর্বদা উচ্চ বিভব হইতে নিম্ন বিভবের দিকে চলে। কিন্তু এই চার্জ বা বিদ্যুৎ যে সকল নৈসর্গিক বা কৃত্রিম বস্তুর মধ্য দিয়া চলে তাহাদিগের সাধারণ নাম বিদ্যুতের পরিবাহী পদার্থ। কিন্তু সকল বস্তুর মধ্য দিয়া বিদ্যুৎ সহজে

চলিতে পারে না। যাহাদের বিদ্যুৎ পরিবহন ধর্ম অতি উত্তম তাহাদিগকে বিদ্যুতের **সু-পরিবাহী** আর যাহাদের এই ধর্ম উত্তম নহে তাহাদিগকে **কু-পরিবাহী** বলে। সকল প্রকার ধাতু, এ্যাসিড, লবণের দ্রবণ, প্রাণিজ দেহ, মাটি প্রভৃতি বিদ্যুতের সু-পরিবাহী ; বায়ু, কাগজ, কাঠ প্রভৃতি কু-পরিবাহী।

আবার, পরিবাহী পদার্থ ছাড়া অন্য যত পদার্থ আছে সাধারণভাবে উহাদিগকে বিদ্যুতের অ-পরিবাহী পদার্থ বা অন্তরক বলে। কাঁচ, রবার, ইবনাইট প্রভৃতি বিদ্যুতের অ-পরিবাহী পদার্থ।

11. সরল ভোল্টার তড়িৎকোষ (Simple Voltaic cell) :

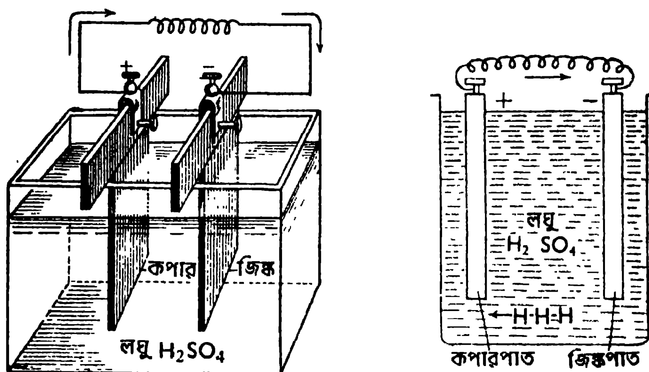
ইতালির বোলাগ্না বিশ্ববিদ্যালয়ের শরীর-বৃত্ত বিজ্ঞানী অধ্যাপক গ্যালভনি (Galvani) 1786 খ্রীষ্টাব্দে সর্বপ্রথম তড়িৎকোষ প্রস্তুত করিবার পন্থা আবিষ্কার করেন। একটি আপাত সাধারণ পর্যবেক্ষণ হইতে তিনি এক যুগান্তকারী উপলব্ধি লাভ করেন। তিনি পরীক্ষার জন্য একটি সদ্য কাটা এবং চামড়া ছাড়ানো ব্যাঙের ঠ্যাঙ লোহার বরগা হইতে তামার আংটায় তাঁহার ল্যাবুরেটরিতে ঝুলাইয়া রাখিয়াছিলেন। হঠাৎ তিনি লক্ষ্য করিলেন যে বাতাসে দুলিতে দুলিতে যখনই ব্যাঙের ঠ্যাঙ লোহার বরগা স্পর্শ করে তখনই ব্যাঙের মাংসপেশীর সংকোচনের জন্য উহা জীবন্ত ব্যাঙের মত পা ছিটকাইতে থাকে। ইহার পর গ্যালভনি আরও দেখাইলেন যে, সদ্য কাটা একটি ব্যাঙের মাংসপেশীকে লবণজলে ডুবাইয়া যদি একই সঙ্গে তামা ও দস্তার দণ্ড দিয়া স্পর্শ করা যায় তাহা হইলে উহার পেশীর সংকোচন খুব বেশী হয় (চিত্র 7); তিনি বলিলেন এইরূপ হইবার কারণ **বৈদ্যুতিক**। ব্যাঙের মাংসপেশীতে বিদ্যুৎ আছে। পরে 1800 খ্রীষ্টাব্দে পদার্থ-বিজ্ঞানী ভোল্টা বলিলেন, প্রাণীর মাংসপেশীতে বিদ্যুৎ থাকে না। তিনি ইহার অন্যরূপ ব্যাখ্যা করেন। তাঁহার তত্ত্বটির মূল কথা এই যে দুইটি বিভিন্ন পরিবাহী লবণ জলের মাধ্যমে পরস্পর সংস্পর্শে থাকিলে, এক বিভব-বৈষম্য (potential difference) সৃষ্ট হয়। ইহার ফলে বিদ্যুৎ সৃষ্টি হয়। লবণ জলের মাধ্যমে



চিত্র 7
গ্যালভনির পরীক্ষা

মাংসপেশীতে দুইটি বিভিন্ন ধাতুর সংযোগ হওয়ার জন্য গ্যালভনির পরীক্ষায় ঐরূপ বিদ্যুৎ পদার্থের সৃষ্টি হইয়াছিল।

সরল ভোল্টার কোষঃ—যে ব্যবহার দ্বারা রাসায়নিক শক্তির বদলে স্থায়ী তড়িৎপ্রবাহ সৃষ্টি করা যায় তাহাকে **তড়িৎকোষ** বলে। সরল ভোল্টার কোষে একটি কাচের পাত্রে লঘু সালফিউরিক অ্যাসিড H_2SO_4) লওয়া হয় (চিত্র 8)। জল ও অ্যাসিডের অনুপাত 1 : 8 হইবে। এই দ্রবণের মধ্যে একটি তামার পাত



চিত্র 8

সরল ভোল্টার কোষ

(copper plate) ও একটি দস্তার পাত (zinc plate) আংশিকভাবে এমনভাবে ডুবানো হয় যেন পাত দুইটি পাশাপাশি থাকিয়াও পরস্পরকে স্পর্শ না করে এবং কঠিন পাত্রকেও স্পর্শ করে না (চিত্র 8)। অনিমজ্জিত বাহিরের অংশে পাত দুইটিকে একটি পরিবাহী তার দ্বারা যুক্ত করিয়া দিলে তারের মধ্য দিয়া তড়িৎপ্রবাহ (electric current) বহিতে থাকে। কোষের ভিতরে দস্তা হইতে তামা এবং কোষের বাহিরে তামা হইতে দস্তার দিকে আয়ত বিদ্যুৎ প্রবাহ হয়।

ভোল্টা সর্বপ্রথম এই ধরনের সরল কোষ নির্মাণ করেন বলিয়া ইহাকে **ভোল্টার কোষ** বলে। এই কোষে দস্তা ও সালফিউরিক অ্যাসিডের মধ্যে রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলে পাত দুইটির মধ্যে এক তড়িৎ বিভব বৈষম্য সৃষ্ট হয় এবং ঐ উপাদানগুলির রাসায়নিক শক্তিসত্তার সৃষ্ট তড়িৎপ্রবাহের শক্তি সরবরাহ করে। তামার পাতটিকে **পজিটিভ মেরু** (positive pole) এবং দস্তার পাতটিকে **নেগেটিভ মেরু**

(negative pole) বলে। তামার পাতটি পজিটিভ তড়িংআধান ও দস্তার পাতটি নেগেটিভ তড়িংআধান লাভ করে। **মনে রাখিতে হইবে তড়িৎ-চক্র সম্পূর্ণ না হইলে কখনও তড়িৎপ্রবাহ চলে না।**

সরল ভোণ্টার কোষের ত্রুটি (Defects of simple voltaic cell) :—এই কোষে প্রধারণতঃ দুইটি ত্রুটি (defects) আছে। এই ত্রুটি দুইটি হইতেছে:— (1) স্থানীয় ক্রিয়া (local action) ও (2) ছদন (polarisation)। এই দুইটি ত্রুটি থাকার জন্য ভোণ্টার তড়িং কোষে কিছুক্ষণ পরেই বিদ্যুৎপ্রবাহ বন্ধ হইয়া যায়।

(1) স্থানীয় ক্রিয়া (Local action) :

সাধারণতঃ সরল তড়িংকোষে বাজারের যে সাধারণ দস্তা ব্যবহৃত হয় তাহা বিশুদ্ধ নয়। তাহাতে লোহা, সীসা, কার্বন, আর্সেনিক প্রভৃতি অপদ্রব্য (impurities) মিশ্রিত থাকে। ঐরূপ দস্তার পাত H_2SO_4 অ্যাসিডে ডুবাইলে এই সকল অপদ্রব্যগুলির (খাদের ধাতু) অ্যাসিডের সংস্পর্শে আসে। ইহার ফলে অ্যাসিডের সংস্পর্শে দুইটি ভিন্ন ভিন্ন ধাতু থাকায় দস্তার পাতের উপরই ছোট ছোট অনেক কোষের সৃষ্টি হয়। এই স্থানীয় তড়িং কোষগুলির সৃষ্টির ফলে যে তড়িত প্রবাহের উংপত্তি হয় তাহা মূল প্রবাহেব সহিত যুক্ত হয় না এবং মূল কোষের বর্তনী চালু করা না হইলেও এই প্রবাহ সর্বদা চালু থাকে। ফলে অনাবশ্যক ও অবিরতভাবে দস্তার ক্ষয় হয়, দস্তা-পাতের রাসায়নিক শক্তির দ্রুত লাঘব ঘটে এবং শীঘ্রই মূল কোষটি অকেজো হইয়া পড়ে। ইহাই **স্থানীয় ক্রিয়া**।

প্রতিকার (Remedy) : বিশুদ্ধ এবং খাদবিহীন দস্তা ব্যবহার করিলে স্থানীয় ক্রিয়ার প্রতিকার করা যায় কিন্তু এইরূপ দস্তা পাওয়া কঠিন এবং দুর্মূল্য। সাধারণতঃ দস্তার উপর পারদের প্রলেপ (4% পারদ) লাগাইয়া স্থানীয় ক্রিয়ার প্রভাব নষ্ট করা যায়। এইরূপ করিবার পূর্বে দস্তার পাতটিকে পাতলা সালফিউরিক বা হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড দ্বারা উত্তমরূপে ধৌত করিতে হয়। দস্তা পারদে দ্রবীভূত হইয়া উপরেই থাকে এবং অ্যাসিডের সহিত সংস্পর্শে আসিয়া মূল কোষের কার্য অব্যাহত রাখে। অপদ্রব্যটি দস্তার উপরে পারদের আস্তরণে ঢাকা পড়িয়া যায় এবং অ্যাসিডের সংস্পর্শে আসিতে পারে না। এইভাবে স্থানীয় ক্রিয়া বন্ধ হইয়া যায়।

(2) ছদন (Polarisation) : সংলগ্ন তড়িংকোষের যখন বিদ্যুৎ-প্রবাহ চলিতে থাকে, তখন হইড্রোজেনের আয়নগুলি (পরমাণু+তড়িৎ−আয়ন) তামার পাতে আসিয়া প্রথমে হাইড্রোজেনের পরমাণু ও তাহা হইতে উহার অণুতে পরিণত

হয়। ইহারা তামার পাতের উপর জমে। ইহার ফলে (*i*) কিছুক্ষণ কাজ হইবার পর তামার পাতের উপর উদাসীন (নিস্তড়িৎ) হাইড্রোজেন অণুগুলির যে গ্যাসীয় আবরণ সৃষ্ট হয় তাহা বিদ্যুতের অপরিবাহী বলিয়া নবাগত হাইড্রোজেন আয়নগুলি তামার পাতে পৌঁছিতে পারে না। সুতরাং তামা ও দস্তার পাতের মধ্যে বিভব-বৈষম্য কমিতে থাকে। ইহার ফলে বিদ্যুৎ-প্রবাহ ক্রমশঃ কমিতে কমিতে শেষ পর্যন্ত বন্ধ হইয়া যায়।

(*ii*) হাইড্রোজেনের গ্যাসীয় আবরণ জমিতে থাকার সঙ্গে সঙ্গে উহার ঠিক বাহিরে দ্রব্যের ভিতর হাইড্রোজেনের আয়নগুলির ভিড় জমিয়া যায়। তাহার ফলে নবাগত হাইড্রোজেন আয়নগুলি তামার পাতের কাছে আসিতেই সমতড়িৎ কর্তৃক বিকর্ষিত হইয়া তামা হইতে দস্তার পাতের দিকে ধাবিত হয় এবং ক্রিয়ার ফলে একটি বিপরীত মুখ্য বা বিরুদ্ধ তড়িৎচালক বলের সৃষ্টি হয়। ইহা মূল তড়িৎচালক বলের মাত্রা কমাইয়া দেয়। কোষের ক্রিয়ায় উহার কোন তড়িৎদ্বারের প্রকৃতির পরিবর্তন ঘটাকেই **ছদন** বলে।

প্রতিকার ঃ ছদন বন্ধ করিতে হইলে মাঝে মাঝে কোষ হইতে তামার পাতকে তুলিয়া ব্রাশ দিয়া ঘষিয়া হাইড্রোজেনের গ্যাসের বুদ্‌বুদ্‌গুলিকে দূরীভূত করিয়া আবার কোষে স্থাপন করিলে বিদ্যুৎ-প্রবাহ পুনরায় চালু হয়। এই প্রণালীকে **যান্ত্রিক পদ্ধতি** বলে। ইহা খুব সুবিধাজনক নহে। সেইজন্য কার্যতর তড়িত-কোষে এমন একটি রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহৃত হয়, যাহার সহিত হাইড্রোজেনের রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলে হাইড্রোজেন জলে পরিণত হয়। সুতরাং এইরূপে ছদন বন্ধ করা হয়। আর ঐ ধরনের রাসায়নিক পদার্থকে **ছদন নিবারক** (Depolariser) বলে। যেমন Leclanche cell-এ Manganese dioxide (MnO_2) ছদন নিবারক হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

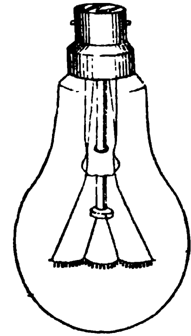
12. তড়িৎ-প্রবাহের ফল (Effects of Electric current) ঃ

যখন কোন তারের (পরিবাহী) মধ্য দিয়া তড়িৎ-প্রবাহ হয়, তখন নিম্নলিখিত তিনটি ফল দেখিতে পাওয়া যায়। (1) তাপীয় ফল (heating effect), (2) চুম্বকীয় ফল (magnetic effect) ও (3) রাসায়নিক ফল (chemical effect)।

(1) তাপীয় ফল ঃ

যখন কোন তারের মধ্য দিয়া তড়িৎ-প্রবাহ চলে তখন তারটি গরম হইয়া উঠে। তার যত সরু ও দীর্ঘ হইবে উহা তত বেশী উত্তপ্ত হইবে। ইহার কারণ তার যত সরু হইবে, উহা বিদ্যুৎ-প্রবাহকে তত বেশী বাধা দিবে। বাধা পাওয়ার,

জন্য তড়িৎ-শক্তি তাপ-শক্তিতে রূপান্তরিত হয়। আমাদের দৈনন্দিন জীবনে তড়িৎ-শক্তি হইতে তাপশক্তির রূপান্তরের বহু ঘটনার পরিচয় ঘটে। টর্চের বাল্‌বের তারের ভিতর দিয়া যখন তড়িৎ প্রবাহিত হয় তখন তার গরম হইয়া ভাস্বর (Incandescent) হয়। বৈদ্যুতিক আলোর বাল্‌বের (চিত্র 9) ভিতর অতি সরু টাংস্টেন (Tangsten) বা মলিবডেনাম (Molybdenum) তারের কুণ্ডলী থাকে। বাল্‌বের তারের মধ্য দিয়া তড়িৎ প্রবাহিত হইলে উহা অত্যন্ত উত্তপ্ত হইয়া ভাস্বর হইয়া উঠে। বৈদ্যুতিক হিটার (Electric heater) ও ইস্তিরিতে (Electric iron) এই রকম দীর্ঘ সরু তারের কুণ্ডলী থাকে। তড়িৎপ্রবাহে ঐ তারও উত্তপ্ত হইয়া ভাস্বর হইয়া উঠে। এস্থলে তড়িৎ-শক্তি তাপ ও আলোক শক্তিতে রূপান্তরিত হয়।

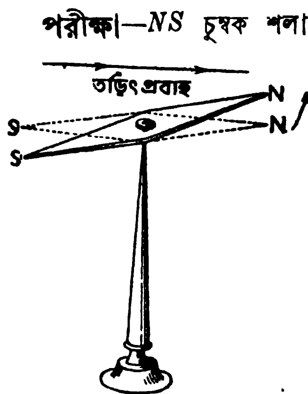


চিত্র 9
বৈদ্যুতিক বাল্‌ব

(2) **চুম্বকীয় ফল :**

তড়িৎ প্রবাহের সহিত চুম্বকত্বের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। 1812 খ্রীষ্টাব্দে বৈজ্ঞানিক ওয়রষ্টেড (Oersted) নিম্নবর্ণিতরূপের একটি পরীক্ষার সাহায্যে তড়িৎপ্রবাহে চুম্বকীয় ক্রিয়ার বিষয় সর্বপ্রথম আবিষ্কার করেন।

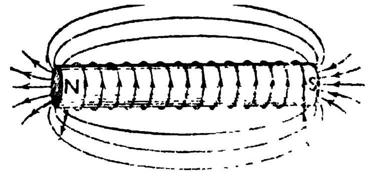
পরীক্ষা—*NS* চুম্বক শলাকাটি (চিত্র 10) চুম্বকীয় মধ্যতলে স্থিতিসাম্য অবস্থায় আছে। শলাকার উপরে উহার সমান্তরালভাবে একটি তার আছে। এখন তারটির ভিতর দিয়া তড়িৎ-প্রবাহ চালাইলে (তড়িৎকোষে দুই প্রান্ত ঐ সমান্তরাল তারটির সহিত যুক্ত করিয়া) দেখা যাইবে যে, চুম্বক-শলাকাটি বিক্ষিপ্ত হইতেছে। ইহাতে প্রমাণ হয় যে, তাহার মধ্য দিয়া তড়িৎপ্রবাহের ফলে উহার চতুর্দিকে একটি চৌম্বক ক্ষেত্রের (magnetic field) সৃষ্টি হয়। এই চৌম্বক ক্ষেত্রের প্রভাব চুম্বক শলাকার উপর বিস্তার লাভ করে। যদি মনে করা যায় তড়িৎপ্রবাহের অনুকূলে



চিত্র 10
বিদ্যুৎপ্রবাহে চুম্বক ক্রিয়া

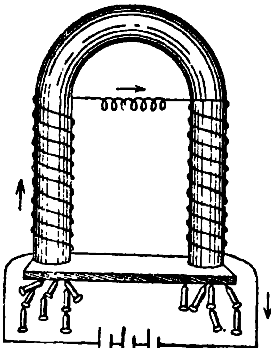
একজন উপুড় হইয়া সাঁতার কাটিতেছে, তাহা হইলে চুম্বক-শলাকাটির উত্তরমেরু বাম হাতের দিকে বিক্ষিপ্ত হইবে। তড়িৎপ্রবাহের দিক পরিবর্তন করিলে শলাকার বিক্ষেপের দিক পরিবর্তন হইবে। ইহাকে **অ্যাম্পিয়ারের সূত্র** (Ampere's Swimming rule) বলে। এই সম্বন্ধে পরে বিস্তারিত আলোচনা হইবে। তড়িৎবাহী তারে এই চুম্বক-শক্তিকে কাজে লাগাইয়া **তড়িৎ-চুম্বক** (electromagnet) প্রস্তুত করা হয়।

তড়িৎ-চুম্বক বা **বৈদ্যুতিক-চুম্বক** একটি কাঁচা লোহার দণ্ড লইয়া উহার উপর একটি রেশমমণ্ডিত অর্থাৎ অন্তরিক (insulated) তামার তার জড়াইয়া ঐ কুণ্ডলীর দুই প্রান্ত একটি লেকল্যান্সি (Leclanche) কোষের দুই প্রান্তে সংযুক্ত করিয়া তড়িৎ-প্রবাহ চালাইলে, কাঁচা লোহার দণ্ডটি অস্থায়ী শক্তিশালী চুম্বকে পরিণত হয়। বিদ্যুৎ-প্রবাহ বন্ধ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই উহা চুম্বক-শক্তি সম্পূর্ণরূপে হারাইয়া ফেলে। এই প্রকার চুম্বককে **তড়িৎ-চুম্বক** বা **বৈদ্যুতিক চুম্বক** বলে। সাধারণ চুম্বকের মত তড়িৎ-চুম্বকেও এক প্রান্তে উত্তর মেরু ও অপর প্রান্তে দক্ষিণ মেরু হয় (চিত্র 11)।



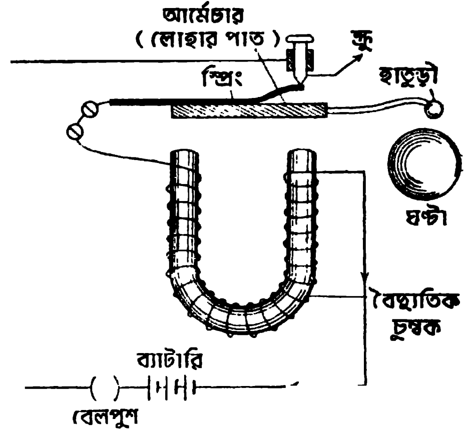
সাধারণ তড়িৎচুম্বক

একটি অশ্বক্ষুরাকৃতি কাঁচা লোহার (কোমল লোহা, soft iron) দণ্ডের চারিদিকে একটি রেশম সূতা দ্বারা অন্তরিত (insulated) তামার তার দ্বারা জড়াইয়া উহার মধ্য দিয়া তড়িৎ প্রবাহিত করিলেও অশ্বক্ষুরাকৃতি দণ্ডটি একটি অস্থায়ী চুম্বকে পরিণত হইবে (চিত্র 12)। এইরূপ বৈদ্যুতিক চুম্বকেও উত্তর ও দক্ষিণ মেরু থাকিবে। কাঁচা লোহার পরিবর্তে ইস্পাত ব্যবহার করিলে উহা স্থায়ী চুম্বকে পরিণত হইবে।


চিত্র 12
অশ্বক্ষুরাকৃতি তড়িৎ-চুম্বক

বৈদ্যুতিক ঘণ্টা, ডায়নামো, টেলিফোন, মোটর (Electric motor) প্রভৃতি যন্ত্রে বৈদ্যুতিক চুম্বক ব্যবহৃত হয়। **মনে রাখিতে হইবে বৈদ্যুতিক চুম্বকে সর্বদাই কাঁচা লোহা ব্যবহার করিতে হয়।**

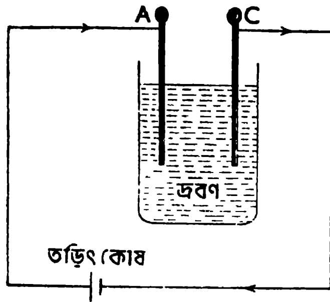
বৈদ্যুতিক ঘণ্টা (Electric bell) **:** বৈদ্যুতিক ঘণ্টায় (চিত্র 13) একটা *U* আকারের বৈদ্যুতিক চুম্বক ও তাহার মেরুর নিকটে একটি কাঁচা লোহার পাত বা দণ্ড থাকে। ইহাকে **আর্মেচার** (Armature) বলে। ইহা একটি স্প্রিংএর সাহায্যে একটি স্ক্রুতে সংলগ্ন হইয়া থাকে। বৈদ্যুতিক চুম্বকের একটি প্রান্ত একটি বৈদ্যুতিক ব্যাটারির প্রান্তের সহিত যুক্ত থাকে এবং বৈদ্যুতিক চুম্বকের অপর প্রান্তে আর্মেচার স্প্রিংএর সঙ্গে যুক্ত থাকে। স্ক্রু আর একটি তার দ্বারা ব্যাটারির অপর প্রান্তটির সহিত যুক্ত থাকে। এইভাবে বর্তনী (circuit) সম্পূর্ণ হয়। এখন তারের ভিতর দিয়া তড়িৎ-প্রবাহ চলিলে বৈদ্যুতিক চুম্বকটি চুম্বকত্ব প্রাপ্ত হইবে এবং আর্মেচারকে আকর্ষণ করিবে, সঙ্গে সঙ্গে হাতুড়িটি ঘণ্টায় আঘাত করিবে। কিন্তু তাহাতে স্ক্রু এবং আর্মেচারের সংযোগ ছিন্ন হইয়া যায়। ফলে বৈদ্যুতিক বর্তনী ভাঙ্গিয়া যায় এবং বৈদ্যুতিক চুম্বকও ক্ষণস্থায়ী চুম্বক বলিয়া চুম্বকত্ব হারাইয়া ফেলে, তাহাতে আর্মেচারটি ও তাহার সঙ্গে হাতুড়িটি পূর্বস্থানে ফিরিয়া আসে। এই সময়ে বর্তনী আবার সম্পূর্ণ হয় ও আর্মেচার চুম্বকের দিকে আকৃষ্ট হয়। এইভাবে তড়িৎপ্রবাহ বারংবার শুরু হয় এবং তখনই থামিয়া যায় এবং সেইজন্য টুং টুং করিয়া ঘণ্টায় বাজিতে থাকে। সাধারণতঃ একটা বেলযুক্ত স্প্রিং বা চাবি রাখা হয়। উহা টিপিলেই ঘণ্টাটি বৈদ্যুতিক ব্যাটারির সঙ্গে যুক্ত হয় এবং ঘণ্টাটি বাজিতে থাকে। **মনে রাখিও তড়িৎপ্রবাহের দিক পরিবর্তন করিলেও বৈদ্যুতিক ঘণ্টার কোন পরিবর্তন হয় না। বর্তনী সম্পূর্ণ হইলেই ঘণ্টা বাজিতে থাকে।**



চিত্র 13
বৈদ্যুতিক ঘণ্টা

(3) **রাসায়নিক ফল :** ঈষৎ অম্লযুক্ত (acidified) জল, তুঁতের দ্রবণ (Copper sulphate solution) বা সিলভার নাইট্রেট দ্রবণ (Silver nitrate solution) প্রভৃতিকে তরল পরিবাহী বলে। ইহাদের ভিতর দিয়া তড়িৎ-প্রবাহ ঘটিলে জল বা তুঁতে বা সিলভার নাইট্রেট প্রভৃতির ভিতর একটি

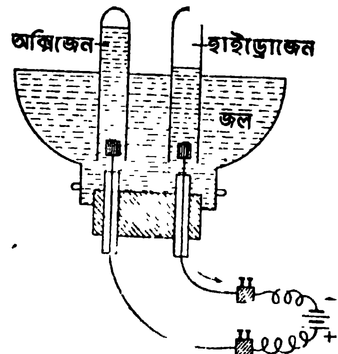
রাসায়নিক ক্রিয়া সংঘটিত হয়, যাহার ফলে উক্ত যৌগিক পদার্থ সমূহের অণুগুলি বিশ্লিষ্ট হইয়া পড়ে। ইহাকে **তড়িৎ-বিশ্লেষণ** (Electrolysis) বলে। আবার বৈদ্যুতিক স্ফুলিঙ্গ দ্বারা হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনকে রাসায়নিকভাবে যুক্ত করিয়া জল উৎপন্ন করা যায়। সুতরাং তড়িতের দ্বারা অনেক ক্ষেত্রে রাসায়নিক বিশ্লেষণ এবং সংশ্লেষ উভয় ক্রিয়াই ঘটানো সম্ভব। যে দুইটি পরিবাহীর সাহায্যে তড়িৎ-কোষ হইতে তড়িৎপ্রবাহ উক্ত অণুগুলির মধ্য দিয়া প্রবাহিত হয় তাহাদের **তড়িৎদ্বার** (Electrode) বলে। A তড়িৎদ্বার (চিত্র 14) তড়িৎ-কোষের ধনাত্মক-পাতের (positive plate) সহিত সংযুক্ত থাকে। তড়িৎ-প্রবাহ A দ্বার দিয়া দ্রবণে প্রবেশ করে। A-তড়িৎ দ্বারকে anode বলা হয়। C-তড়িৎ দ্বার তড়িৎ কোষের ঋণাত্মক পাতের (negative plate) সহিত সংযুক্ত থাকে। সেইজন্য C-দ্বার দিয়া তড়িৎপ্রবাহ বাহির হইয়া যায়। C-দ্বারকে cathode বলা হয়। সমগ্র ব্যবস্থাটির নাম Voltameter।



চিত্র 14
ভোল্টামিটার

পরীক্ষা (1) :

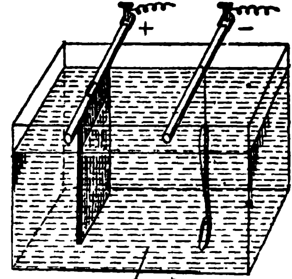
একটি কাচপাত্রে অম্লযুক্ত (acidulated water) জল লওয়া হয় (চিত্র 15)। পরিবাহী তারের দুই প্রান্তে দুইটি প্লাটিনামের পাত আটকানো হয়। অম্লযুক্ত জলের মধ্যে তড়িৎ-প্রবাহ ঘটাইলে দেখা যাইবে যে, ঋণাত্মক তড়িৎ দ্বার হইতে হাইড্রোজেন গ্যাস এবং ধনাত্মক তড়িৎ দ্বার হইতে অক্সিজেন গ্যাস উঠিতেছে। এইভাবে জল হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন নামক দুইটি উপাদানে বিশ্লিষ্ট হয়।



চিত্র 15
জলের তড়িৎ-বিশ্লেষণ

পরীক্ষা (2) :

একটি কাঁচের পাত্রে খানিকটা তুঁতের জল ও একটু সালফিউরিক অ্যাসিড মিশাইয়া লওয়া হয়। ইহার একদিকে একটি তামার পাত এবং বিপরীতদিকে একটি পিতলের পাত বা চামচ ডুবাইয়া রাখা হয়। চামচটিকে পূর্বে স্যাণ্ড পেপার দ্বারা ঘষিয়া পরিষ্কার করিয়া—ভাল করিয়া ধুইয়া লইতে হয়। উহার ওজন লওয়া হয়। পরিষ্কৃত স্থানে হাত লাগান চলিবে না। এখন তামার পাতকে একটি তড়িৎ কোষের ধনাত্মক পাতের সহিত এবং পিতলের চামচটিকে উহার ঋণাত্মক পাতের সহিত সংযুক্ত করা হয়। এইবার কিছুক্ষণ ধরিয়া দ্রবণের মধ্য দিয়া তড়িৎ প্রবাহ চালান হয়। ইহার পর চামচটি তুলিয়া আনিলে দেখা যাইবে যে চামচের উপর তামার প্রলেপ পড়িয়াছে। ওজন করিলে দেখা যাইবে উহার ওজন কিছু বাড়িয়াছে।



চিত্র 16
বিদ্যুতের রাসায়নিক প্রভাব

তড়িৎ প্রবাহের প্রভাবে কপার সালফেটের ($CuSO_4$) অণু হইতে কপারের পরমাণু ঋণাত্মক প্রান্তের চামচের উপর গিয়াছে এবং ধনাত্মকের কপার ক্ষয় হইয়া আবার কপার সালফেট প্রস্তুত হইয়াছে। সেইজন্য ধনাত্মক প্রান্তের কপার পাতের ওজন কমিবে।

এইভাবে লোহার বা তামার মত নিকৃষ্ট ধাতুর তৈয়ারী চামচ, বোতাম, কাঁটা প্রভৃতিতে সোনার পাত, নিকেল প্রভৃতি উৎকৃষ্ট ধাতুর প্রলেপ দেওয়ার নাম **তড়িৎ প্রলেপ** (Electroplating)।

13. প্রবাহমাত্রা ও রোধের ধারণা (Idea of intensity and resistance) :

প্রবাহমাত্রা (Intensity of current) : কোন পরিবাহী তারকে একটি তড়িৎ কোষের দুইটি পাতের সহিত সংযুক্ত করিলে তারের ভিতর দিয়া তড়িৎ প্রবাহ চলিতে থাকে। কিন্তু ঐ প্রবাহের বা কারেণ্টের মাত্রা কি তাহা নির্ণয় করিতে হইবে।

এই তড়িতের স্থায়ী প্রবাহের সঙ্গে জলপ্রবাহের তুলনা করা যাইতে পারে।

ধরা যাক, একটি নলের মধ্য দিয়া জল প্রবাহিত হইতেছে। নলের দুই মুখে যদি জলের চাপের পার্থক্য সর্বদা বজায় রাখা হয়, তবে নল দিয়া স্থায়ী ভাবে জলপ্রবাহ প্রবাহিত হইবে (চিত্র 17)। নলের মধ্য দিয়া প্রতি সেকেণ্ডে যে পরিমাণ জল প্রবাহিত হইবে তাহা দ্বারা জল প্রবাহের মাত্রা মাপা হয়। ধরা যাক 20 সেকেণ্ডে 100 গ্রাম জল নল দিয়া বাহির হইতেছে, সুতরাং জলের প্রবাহ মাত্রা হইবে $\frac{100}{20}$ বা 5 গ্রাম প্রতি সেকেণ্ডে। তড়িতের প্রবাহ মাত্রাও এমনিভাবে মাপা যায়। কোন পরিবাহী তার দিয়া যখন তড়িৎ-প্রবাহ হয় তখন ঐ তারের কোন একটি বিন্দু দিয়া প্রতি সেকেণ্ডে কতখানি তড়িৎ প্রবাহিত করে তাহা দ্বারা তড়িৎ-প্রবাহ মাত্রা মাপা হয়। ধরা যাক, একটি পরিবাহী তারের কোন এক বিন্দুর মধ্য দিয়া t সেকেণ্ডে Q পরিমাণ তড়িৎ অতিক্রম করিতেছে। সুতরাং এক্ষেত্রে প্রবাহ-মাত্রা (current strength) $I=\frac{Q}{t}$.



চিত্র 17

তড়িৎ-প্রবাহ ও জল-প্রবাহের সাদৃশ্য

তড়িতের প্রবাহ-মাত্রা যে এককে প্রকাশিত হয়, তাহার নাম অ্যাম্পিয়ার (Ampere)। সিলভার ভল্টামিটারের মধ্যে যে পরিমাণ তড়িৎ প্রবাহিত হইলে প্রতি সেকেণ্ডে ·001118 গ্রাম রূপা ক্যাথোডে জমা হয় সেই পরিমাণ তড়িৎকে এক অ্যাম্পিয়ার তড়িৎ বা কারেন্ট (current) বলে।

রোধ (Resistance) :

একটি নলের মধ্য দিয়া যখন জল প্রবাহিত হয় তখন দুই মুখের চাপের পার্থক্য ঠিক রাখিয়া জলপ্রবাহের মাত্রা নলের প্রস্থচ্ছেদ (cross section) ও দৈর্ঘ্যের উপর নির্ভর করে। দেখা যায়, প্রস্থচ্ছেদ কম হইলে অর্থাৎ নল সরু হইলে জলের প্রবাহমাত্রা কম হইবে। আবার প্রস্থচ্ছেদ বেশী হইলে অর্থাৎ নলটি যদি মোটা হয়, তবে জলের প্রবাহমাত্রা বাড়িবে। আবার নল দীর্ঘ হইলে প্রবাহ-মাত্রা কমিবে এবং নল ছোট হইলে প্রবাহমাত্রা বাড়িবে। সেইরূপ পরিবাহী তারের মধ্য দিয়া বেশী তড়িৎ প্রবাহিত করিতে হইলে তারের বড় প্রস্থচ্ছেদ হওয়া চাই। সুতরাং তড়িৎ প্রবাহ-মাত্রা তারের প্রস্থচ্ছেদ ও দৈর্ঘ্যের উপর নির্ভর করে। মোটা তারের তড়িৎ-প্রবাহ কম বাধা পায় এবং তারের

দৈর্ঘ্য বাড়িলে বাধাও বৃদ্ধি পায়। তড়িৎ প্রবাহের বিরুদ্ধে এই বাধাকে **রোধ** (Resistance) বলে। আবার সমান প্রস্থচ্ছেদ ও দৈর্ঘ্য হইলে বিভিন্ন ধাতুর মধ্য দিয়া তড়িৎ প্রবাহ বিভিন্ন; সুতরাং কোন পরিবাহী তারে রোধ তারের প্রবাহের দৈর্ঘ্য ও উপাদানের উপর নির্ভর করে। এছাড়া পরিবাহী তারের রোধ উষ্ণতার উপরও নির্ভর করে। ধাতু সু-পরিবাহী বলিয়া রোধ খুব কম। কাঁচ, পশম, কাঠ প্রভৃতি অন্তরকের রোধ খুব বেশী।

'রোধ'কে সাধারণতঃ 'ওহম' (Ohm), এই এককে প্রকাশ করে; বিজ্ঞানী জি. এস. ওহম 1826 খ্রীষ্টাব্দে পরিবাহীর দুই প্রান্তের বিভব-প্রভেদ, উহার রোধ ও প্রবাহ মাত্রা এই তিনটি জিনিসের মধ্যে সম্পর্ক রাখিয়া একটি বিখ্যাত সূত্র নির্ণয় করেন। 'ওহম' এর নামানুসারে এই সূত্রটি **ওহমের সূত্র** (Ohm's law) নামে অভিহিত করা হয়। ওহমের সূত্র এইরূপ, **পরিবাহীর তাপমাত্রা ও অন্যান্য ভৌত অবস্থা অপরিবর্তিত থাকিলে উহার দুই প্রান্তের বিভব-প্রভেদ উহার প্রবাহমাত্রার সমানুপাতিক।**

অর্থাৎ $\frac{\text{বিভব-প্রভেদ}}{\text{প্রবাহমাত্রা}} = \text{ধ্রুবক}$।

এই ধ্রুবকটিকেই **রোধ** বলে।

বিদ্যুৎ-প্রবাহের তীব্রতা (Intensity of current) মাপিবার একককে **অ্যামপিয়ার** (Ampere) বলা হয়। বৈদ্যুতিক প্রবাহের রোধ (R) মাপিবার একককে **ওহম** (Ohm) ধরিলে, বিদ্যুৎ-চালক বল (Electromotive force) মাপিবার একককে ভোল্ট (volt 'V') ধরিলে ওহমের সূত্র অনুসারে

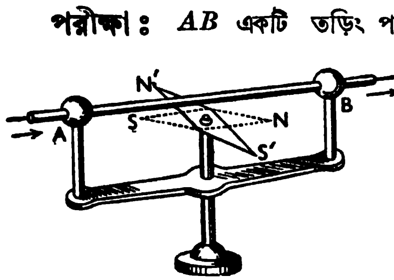
$$I = \frac{V}{R} \quad \therefore \quad R = \frac{V}{I}$$

তড়িৎ চুম্বকের ভিতর পারস্পরিক ক্রিয়া (Interaction of electricity and magnetism)

14. চুম্বকের উপর তড়িৎ-প্রবাহের ক্রিয়া (Action of electric current on magnet):

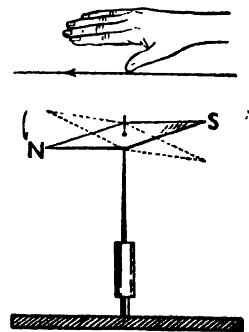
তড়িৎ প্রবাহের বিভিন্ন ফল সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে। বিজ্ঞানী ওয়রষ্টেড (Oersted) 1820 খ্রীষ্টাব্দে তড়িৎ প্রবাহের চৌম্বক ক্রিয়ার বিষয় সর্বপ্রথম আবিষ্কার করেন। তিনি নিম্নলিখিত পরীক্ষার দ্বারা চুম্বকের উপর তড়িৎ প্রবাহের ক্রিয়া ব্যাখ্যা করেন।

পরীক্ষা ঃ *AB* একটি তড়িৎ পরিবাহী তার। উহার নীচে *NS* চুম্বক শলাকাটি (magnetic needle) রাখা হইয়াছে। যখন ঐ তারের মধ্য দিয়া তড়িৎ-প্রবাহ চলে না তখন *NS* শলাকাটি তারের সমান্তরাল ভাবে থাকে। এখন তারটির মধ্য দিয়া তড়িৎ-প্রবাহ চালাইলে দেখা যাইবে চুম্বক শলাকাটি বিক্ষিপ্ত হইতেছে। এই সময়ে উহা তারটির লম্বভাবে (*N'S'*) অবস্থান করে। তড়িৎ প্রবাহ বন্ধ করিলে শলাকা আবার পূর্বতন *O* স্থিতিসাম্য অবস্থায় ফিরিয়া আসিবে। তড়িৎ প্রবাহ বিপরীতমুখী করিলে শলাকার বিক্ষেপও বিপরীতমুখী হয়। আরও দেখা যায় যে, শলাকাটি তারের নীচে থাকিলে যে দিকে বিক্ষেপ হয়, উপরে থাকিলে তার বিপরীত দিকে হয়। ওয়রষ্টেডের যুগান্তকারী এই পরীক্ষার দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, তড়িৎ প্রবাহ চৌম্বক ক্ষেত্র (magnetic field) সৃষ্টি করিতে পারে। কারণ আমরা জানি চুম্বক শলাকার বিক্ষেপ একমাত্র চৌম্বক ক্ষেত্রের প্রভাব দ্বারা সম্ভবপর। **এখানে মনে রাখিতে হইবে যে, এই চৌম্বকক্ষেত্রের দ্বারা পরিবাহীটি চুম্বকিত হয় না। কিন্তু লৌহচূর্ণ পরিবাহীর কাছে আনিলে, পরিবাহী চূর্ণগুলিকে আকর্ষণ করিবে না।**



চিত্র 18
চুম্বকের উপর তড়িৎপ্রবাহের ক্রিয়া

ওয়রষ্টেডের সূত্র ঃ দক্ষিণ হস্তের তালু প্রসারিত করিয়া এমনভাবে স্থাপন করিতে হইবে যে তড়িৎ পরিবাহী তার চুম্বক শলাকা ও তালুর মাঝখানে থাকে (চিত্র 19)। বুড়া আঙুল ভিন্ন অন্য আঙুলগুলি তড়িৎ-প্রবাহের দিক নির্দেশ করিলে, প্রসারিত বুড়া আঙুল চুম্বকের উত্তরমেরুর বিক্ষেপের অভিমুখ নির্দেশ করিবে। **চুম্বক বিক্ষেপের দিক্ নির্ণয়ের নিয়ম** ফরাসী বৈজ্ঞানিক অ্যাম্পিয়ার একই ব্যাপার অন্যভাবে বিবৃত করেন। ইহাকে অ্যাম্পিয়ারের সন্তরণ সূত্র (Ampere's swimming rule) বলে। তিনি বলেন যে, মনে কর যেন কোন মানুষ চুম্বক শলাকার দিকে মুখ রাখিয়া তড়িৎবাহী তারের উপর দিয়া তড়িৎ প্রবাহের



চিত্র 19
চুম্বক শলাকার বিক্ষেপ

অনুকূলে সাঁতার কাটিয়া যাইতেছে। এই অবস্থায় তাহার বাঁ হাত যে দিকে, চুম্বক-শলাকার উত্তর মেরু তড়িৎপ্রবাহের ক্রিয়ার সেই দিকে বিক্ষিপ্ত হইবে।

ম্যাক্সওয়েলের কর্ক-স্ক্রু নিয়ম (Maxwell's cork screw rule) :

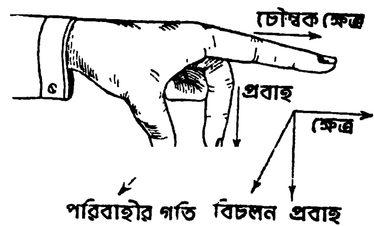
তিনি বলেন যে, একটি দক্ষিণ পাকের (right handed) কর্ক স্ক্রুকে এরূপভাবে ধরিয়া ঘুরাও যাহাতে পরিবাহীতে তড়িৎপ্রবাহ যে অভিমুখে বহিতেছে স্ক্রুর অগ্রবিন্দু ঐ দিকে অগ্রসর হয়। তাহা হইলে স্ক্রু ঘুরাইবার ফলে বুড়া আঙুলটি যে দিকে ঘুরিবে, চুম্বক-শলাকার উত্তর মেরুও সেই দিকে বিক্ষিপ্ত হইবে।

15. তড়িৎ প্রবাহের উপর চুম্বকের ক্রিয়া (Action of magnet on current) :

আমরা Oerstedএর পরীক্ষা হইতে জানিয়াছি যে কোন পরীবাহী তারের মধ্য দিয়া তড়িৎ প্রবাহিত হইলে উহা চুম্বকের মত আচরণ করে এবং উহার চতুর্দিকে এক চৌম্বক ক্ষেত্র সৃষ্টি করে। ঐ চৌম্বক ক্ষেত্রের মধ্যে চুম্বকের কোন মেরু থাকিলে তাহার উপর একটি আকর্ষণ বা বিকর্ষণজনিত ক্রিয়ার কাজ করে এবং উহাকে বিক্ষিপ্ত করে। নিউটনের গতিবিষয়ক তৃতীয় সূত্র অনুসারে আমরা জানি যে, প্রত্যেক ক্রিয়ার সমান ও একটি বিপরীত প্রতিক্রিয়া থাকে। সুতরাং মেরুর উপর ক্রিয়াশীল বলেরও সমান ও বিপরীত প্রতিক্রিয়া থাকিবে। এই প্রতিক্রিয়া পরিবাহীর উপর প্রযুক্ত হয় অর্থাৎ চুম্বক-মেরুও ঐ তড়িৎবাহী তারের উপর একটি বল প্রয়োগ করিবে, যাহার ফলে তারটি মেরু কর্তৃক আকৃষ্ট বা বিকৃষ্ট হইবে। ইহাই তড়িৎ প্রবাহের উপর চুম্বকের ক্রিয়া।

ফ্লেমিং-এর বাম হস্ত সূত্র (Fleming's left hand rule) :

তড়িৎ প্রবাহের দিক্ ও চৌম্বক ক্ষেত্রের দিক্ অনুযায়ী পরিবাহী তার কোন্ দিকে বিক্ষিপ্ত হইবে তাহা ফ্লেমিং এর বাম হস্ত নিয়ম হইতে বোঝা যায়। সূত্রটি এইভাবে বলা যাইতে পারে : বাম হস্তের প্রথম তিনটি আঙুল (অঙ্গুষ্ঠ, তর্জনী ও মধ্যমা) পরস্পরের সমকোণে রাখিয়া পরিবাহীর উপর এমনভাবে প্রসারিত করিতে হইবে যাহাতে মধ্যমা তড়িৎ প্রবাহের দিক নির্দেশ করিবে এবং তর্জনী



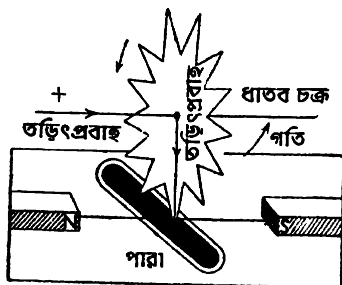
চিত্র 20
ফ্লেমিং এর বামহস্ত নিয়ম

চৌম্বক ক্ষেত্রের অভিমুখ নির্দেশ করিবে, তাহা হইলে পরিবাহী তার অঙ্গুষ্ঠের দিকে বিক্ষিপ্ত হইবে (চিত্র 20)।

পরীক্ষা :

বার্লো চক্র (Barlow's wheel) :

তড়িৎ-বাহী তারের উপর চুম্বক যে বল প্রয়োগ করে তাহার সাহায্যে অবিরাম গতি উৎপন্ন করা যায়। বার্লো চক্রের সাহায্যে এই প্রকার অবিরাম গতি দেখান যাইতে পারে। এই যন্ত্রে কয়েকটি লম্বা দাঁত বিশিষ্ট তারকাকৃতি পাতলা ধাতব চক্র (তামা) উল্লম্বভাবে ঝোলানো আছে ইহা একটি অনুভূমিক অক্ষের চতুর্দিকে ঘুরিতে পারে। যন্ত্রের ভূমির উপর চক্রের দুই পাশে একই রেখা বরাবর বিপরীত মেরু (N এবং S) মুখোমুখী করিয়া দুইটি বার চুম্বক বসানো হয় (চিত্র 21)। একটি শক্তিশালী অশ্বক্ষুর চুম্বকের দুই মেরু চক্রের দুই পার্শ্বে সংযোগ করাও যাইতে



চিত্র 21
বার্লো চক্র

পারে। চক্রটির কাঠের পাটাতনের উপর একটি সরু লম্বা গর্তের মধ্যে কিছু পারা রাখা হয়। চক্রটি ঘুরিবার সময় পর্যায়ক্রমে চক্রের এক একটি দাঁত (spoke এই পারদ স্পর্শ করে অর্থাৎ পারদের সহিত চক্রের সংযোগ অবিচ্ছিন্ন থাকে। এই গতিকে দুইটি চুম্বকের বিপরীত মেরুর মধ্যে বা শক্তিশালী অশ্বক্ষুরাকৃতি চুম্বকের মেরুদ্বয়ের মধ্যে অবস্থিত। দুইটি বন্ধনীর সাহায্যে তড়িৎপ্রবাহ চক্র ও পারদের মধ্য দিয়া তড়িৎকোষে ফিরিয়া যাইবে এবং চক্রটি নির্দিষ্ট অভিমুখে অবিরাম ঘুরিতে থাকিবে। যদি তড়িৎ প্রবাহ চক্র দিয়া উপর হইতে নীচের দিকে যায় তাহা হইলে চিত্রে প্রদর্শিত তীর চিহ্নের দিকে চক্রটি ঘুরিতে শুরু করিবে। ফ্লেমিং এর বাম হস্ত সূত্র হইতে চক্রের আবর্তনের দিক ঠিক করা যায়। প্রবাহের দিক পরিবর্তন করিলে, অথবা চুম্বকের মেরু ঘুরাইয়া দিলে চক্রের ঘূর্ণনের দিক পরিবর্তিত হইবে। এইভাবে কোন পরিবাহীতে তড়িৎ প্রবাহ চালাইয়া চৌম্বক ক্ষেত্রের সাহায্যে পরিবাহীর ঘূর্ণন সৃষ্টি যে যন্ত্রে করা হয় উহাকে একটি **বৈদ্যুতিক মোটর বলে** (Electric motor)।

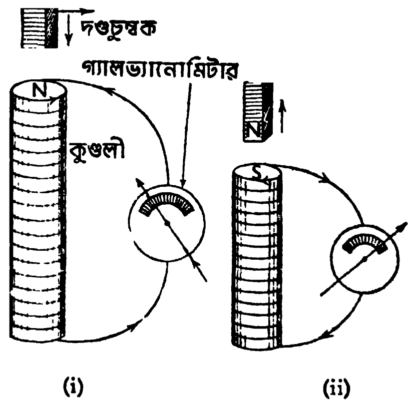
16. তড়িৎ চুম্বকীয় আবেশ (Electromagnetic Induction) :

1820 খ্রীষ্টাব্দে (Oersted) তড়িৎপ্রবাহের ক্রিয়ার চৌম্বক ক্ষেত্রের সৃষ্টি হয়, এই তত্ত্ব আবিষ্কার করিবার পর হইতে চৌম্বক ক্ষেত্রের প্রভাবে তড়িৎপ্রবাহ সৃষ্টি হয় কিনা ইহা লইয়া বহু বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা করিয়াছেন। এইরূপ চেষ্টার ফলে 1831 খ্রীষ্টাব্দে বৈজ্ঞানিক মাইকেল ফ্যারাডে (Michael Faraday) তড়িৎ চুম্বকীয় আবেশের তথ্য আবিষ্কার করেন। তিনি আবিষ্কার করেন যে বদ্ধ বর্তনীর ভিতর চৌম্বক ক্ষেত্রের কোনও প্রকার হ্রাসবৃদ্ধি ঘটিলেই ঐ বর্তনীতে তড়িৎপ্রবাহের উৎপত্তি হয়। ইহাকে **আবিষ্ট তড়িৎপ্রবাহ** (Induced current) এবং এই ঘটনাকে **তড়িৎ-চুম্বকীয় আবেশ** (Electromagnetic induction) বলে। বিদ্যুৎ উৎপাদনকারী ডাইনামো (Dynamo) তড়িৎ চুম্বকীয় আবেশ ক্রিয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যবহারিক প্রয়োগের দৃষ্টান্ত। এই ক্রিয়ার সাহায্যে ট্রান্সফর্মার প্রভৃতি অত্যাবশ্যকীয় বৈদ্যুতিক কৌশলী উপায়ও সৃষ্টি করা সম্ভব হইয়াছে।

16. (a) তড়িৎ-চুম্বকীয় আবেশ সম্পর্কিত পরীক্ষা :—

(i) **চুম্বক কর্তৃক আবিষ্ট প্রবাহ** (Current induced by a magnet) :

একটি কার্ডবোর্ডের চোঙের উপর বেশ কয়েক পাক সুতা জড়ানো তামার তার জড়াইয়া একটি বদ্ধ কুণ্ডলী প্রস্তুত করা হয়। চোঙটিকে খাড়াভাবে রাখিয়া তারটির দুই প্রান্ত একটি গ্যালভ্যানোমিটার যন্ত্রের সহিত যুক্ত করা হয়। কোন বর্তনীতে তড়িৎপ্রবাহ হইতেছে কিনা গ্যালভ্যানোমিটার সাহায্যে বোঝা যায়। একটি দণ্ড-চুম্বকের এক মেরু (ধরিলাম N মেরু) তাড়াতাড়ি কুণ্ডলীর দিকে আনিলে গ্যালভ্যানোমিটারে বিক্ষেপ পাওয়া যাইবে (চিত্র 22)। চুম্বককে থামাইয়া দিলে বিক্ষেপ আর থাকে না। চুম্বকের ঐ N মেরু কুণ্ডলী হইতে তাড়াতাড়ি বাহির করিয়া আনিলে গ্যালভ্যানোমিটারে অনুরূপ ক্ষণস্থায়ী বিক্ষেপ পাওয়া যায়, কিন্তু এই



চিত্র 22
চুম্বক কর্তৃক আবিষ্ট প্রবাহের পরীক্ষা

ক্ষেত্রে বিক্ষেপ হয় পূর্ববর্তী বিক্ষেপের বিপরীত। এই প্রক্রিয়ার দ্বারা যে প্রবাহ উৎপন্ন হয় তাহাকে **আবিষ্ট প্রবাহ** (Induced current) বলে। এই পরীক্ষা হইতে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি যে, চুম্বকের এইপ্রকার গতির দ্বারা কোন বদ্ধ বর্তনীতে তড়িৎপ্রবাহ আবিষ্ট করা যাইতে পারে। চুম্বকের গতি না থাকিলে তড়িৎ-প্রবাহ আবিষ্ট হয় না অর্থাৎ **বদ্ধ বর্তনীর মধ্যে চৌম্বক ক্ষেত্রের পরিবর্তন ঘটিলেই বর্তনীতে তড়িৎ-প্রবাহ উৎপন্ন হয়।** অথবা যে চৌম্বক বলরেখাগুলি কুণ্ডলীকে ছেদ করে তাহার কোন পরিবর্তন হইলেই কুণ্ডলীতে তড়িৎ-প্রবাহ আবিষ্ট হইবে। চুম্বক কুণ্ডলীর কাছে আসিবামাত্রই কুণ্ডলীর মধ্যে বলরেখার সংখ্যা বৃদ্ধি পায় কিন্তু যখন চুম্বক দূরে সরাইয়া লইয়া যাওয়া হয়, তখন কুণ্ডলীর মধ্যে বলরেখার সংখ্যা হ্রাস পায়।

উপরোক্ত পরীক্ষার সময় লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে যে চুম্বকের N মেরু-কুণ্ডলীতে ঢুকাইবার এবং বাহির করিবার সময় কুণ্ডলীর উপরের মুখে (i) এবং (ii) নং চিত্রে যথাক্রমে N এবং S মেরুর উদ্ভব হয়। N মেরুর পরিবর্তে S মেরু ঢুকানো হইলে ঢুকাইবার সময় কুণ্ডলীর মুখে S মেরু এবং বাহির করিয়া লইবার পরে N-মেরুর উদ্ভব হয়।

এই ব্যাপার বিজ্ঞানী **লেঞ্জ** (Lenz) একটি সূত্রাকারে লিপিবদ্ধ করেন। তাঁহার নামানুসারে ইহাকে **লেঞ্জের সূত্র** (Lenz's law) বলে।

লেঞ্জের সূত্রটি নিম্নরূপ—

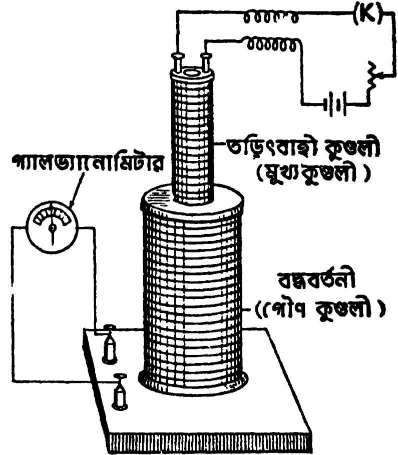
তড়িৎ-চুম্বকীয় আবেশের সকল ক্ষেত্রেই আবিষ্ট তড়িৎচালক বলের অভিমুখ এমন যে উহার ক্রিয়ায় প্রবাহ চলিলে, এই প্রবাহের চৌম্বক ক্রিয়া আবেশের মূল কারণের বিরোধিতা করিবে।

এই সূত্র আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, দণ্ড চুম্বকের গতি বজায় রাখিবার জন্য সর্বদা যান্ত্রিক শক্তির ব্যয় করিতে হয়, ইহার কারণ দণ্ড-চুম্বকটি যখন কুণ্ডলীর মধ্যে ঢুকানো হয় তখন দুই সমমেরুর ভিতর বিকর্ষণজনিত বলের বিরুদ্ধে ঢুকাইতে হয় অর্থাৎ কিছু কার্য করিতে হয় এবং বাহির করিবার পরে দুই বিপরীত মেরুর মধ্যে আকর্ষণজনিত বলের বিরুদ্ধে দণ্ড-চুম্বককে সরাইয়া আনিতে হয়। সুতরাং **এই যান্ত্রিক শক্তিই তড়িৎ-শক্তিতে রূপান্তরিত হইয়া কুণ্ডলীতে তড়িৎ প্রবাহের সৃষ্টি করে।** আবার আবিষ্ট তড়িৎ প্রবাহকে বর্তনী সংশ্লিষ্ট চৌম্বক বলরেখার পরিবর্তনের ফল বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়া **মাইকেল ফ্যারাডে** নিম্নলিখিত

সূত্রটি প্রণয়ন করেন। **ফ্যারাডের সূত্র—(a) আবিষ্ট তড়িৎচালক বলের মান কুণ্ডলীর সঙ্গে জড়িত চৌম্বক বলরেখার সংখ্যার পরিবর্তনের হারের এবং কুণ্ডলী পাকের সংখ্যার সমানুপাতিক।**

(b) চৌম্বক বলরেখার সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে থাকিলে আবিষ্ট তড়িৎ চালক বল বিপরীত (inverse) এবং কমিতে থাকিলে উহা সোজা (direct) হইবে এবং কেবল ততক্ষণই এই তড়িৎচালক বল স্থায়ী হইবে, যতক্ষণ এই সংখ্যা পরিবর্তিত হইতে থাকিবে।

(ii) **প্রবাহ কর্তৃক আবিষ্ট প্রবাহ** (Current induced by current) দণ্ডচুম্বক ব্যবহার না করিয়া অন্য কোন উপায়ে বর্তনীর ভিতরে চৌম্বক ক্ষেত্রের হ্রাস-বৃদ্ধি করিতে পারিলেও তড়িৎ-প্রবাহ পাওয়া যায়। যে কোন কুণ্ডলী দিয়া তড়িৎপ্রবাহ হইলে কুণ্ডলী স্বয়ং চুম্বকের ন্যায় আচরণ করে এবং কাজেই একটি চৌম্বক ক্ষেত্র সৃষ্টি করে। প্রবাহের হ্রাসবৃদ্ধি করিয়া উহা দ্বারা সৃষ্ট চৌম্বক ক্ষেত্রের প্রাবল্য (Intensity) কমানো বা বাড়ানো যায়। সুতরাং কুণ্ডলীর সাহায্যেও আবিষ্ট প্রবাহ পাওয়া যাইবে।



চিত্র 24
প্রবাহ কর্তৃক আবিষ্ট প্রবাহ

পরীক্ষা ঃ একটি তড়িৎবাহী কুণ্ডলী বা সলিনয়েড (Solenoid) ও গ্যালভ্যানোমিটার সম্বলিত একটি বদ্ধ বর্তনী লইতে হইবে (চিত্র 24)। প্রথমোক্ত কুণ্ডলীকে **মুখ্য কুণ্ডলী** (Primary coil) এবং শেষোক্ত কুণ্ডলীকে **গৌণ কুণ্ডলী** (Secondary coil) বলা হয়।

আমরা জানি গৌণ কুণ্ডলীর ভিতর চৌম্বক বলরেখার পরিবর্তনেই আবিষ্ট প্রবাহ উৎপন্ন করে, সেইজন্য মুখ্য কুণ্ডলীর মধ্যে স্থায়ীভাবে রাখিয়া (অথবা গৌণ কুণ্ডলীকে মুখ্য কুণ্ডলীর মধ্যে রাখিয়া) মুখ্য কুণ্ডলীতে প্রবাহ পাঠাইলে বা বন্ধ করিলে গৌণ কুণ্ডলীতে আবিষ্ট প্রবাহ উৎপন্ন হইবে।

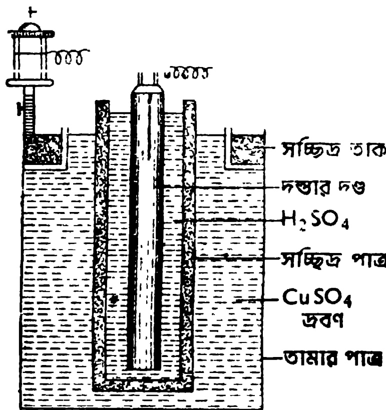
তড়িৎ প্রবাহের উৎস (Sources of Electric current)

17. স্থায়ী তড়িৎ প্রবাহের উৎপাদন করিবার প্রধানতঃ দুইটি উপায়ঃ—(1) তড়িৎ কোষের সাহায্যে অর্থাৎ রাসায়নিক ক্রিয়ার রূপান্তর হইতে তড়িৎ প্রবাহ উৎপাদন।

(2) ডায়নামো যন্ত্রের সাহায্যে অর্থাৎ ফারাডের আবিষ্কৃত তড়িৎ-চুম্বকীয় আবেশের ক্রিয়ার চলশক্তি হইতে। সরল ভোলটার কোষ অপেক্ষা উন্নত ধরনের এবং প্রয়োজনীয় কোষের সম্বন্ধে এইবার আলোচনা করা হইবে।

তড়িৎ কোষ প্রধানতঃ দুই প্রকারের : (1) প্রাথমিক কোষ (Primary cell), যেমন, ড্যানিয়েল কোষ (Daniel cell), লেকল্যান্সি কোষ (Leclanche cell), নির্জল কোষ (Dry cell) ; (2) গৌণমিক কোষ (Secondary cell), যথা সঞ্চয়ক কোষ (Storage cell) বা সঞ্চয়ক (Accumulator).

(1) **ড্যানিয়েল কোষ** ঃ—এই কোষের পাত্রটি তামার তৈয়ারী—(চিত্র 25)। এই পাত্রে তুঁতের দানা (CuSO$_4$ crystals) জলে দ্রবীভূত করিয়া রাখা হয়। এই দ্রবণ সংপৃক্ত। এই দ্রবণের মধ্যে একটি সচ্ছিদ্র পাত্র ডুবাইয়া রাখা হয়। উহার মধ্যে লঘু সালফিউরিক অ্যাসিড এবং একটি পারদ প্রলেপযুক্ত (Mercury amalgamated) দস্তার দণ্ড রাখা হয়। তামার পাত্রের উপরের দিকে দুইটি সচ্ছিদ্র তাকে কিছু তুঁতের দানা রাখা হয়। ইহাতে নীচের দ্রবণের সহিত সবসময় ঐ দানাগুলি যুক্ত থাকে এবং দ্রবণ সর্বদা সংপৃক্ত থাকে। তামার পাত্রের তামা ধনাত্মক মেরু (Anode) এবং দস্তা ঋণাত্মক মেরু (Cathode) এর ক্রিয়া করে। তামার ও দস্তার পাত্রে তার আটকাইবার জন্য যে দুইটি বাইণ্ডিং স্ক্রু থাকে সেইগুলিকে তার দিয়া যুক্ত করিলে তামা (+) হইতে দস্তায় (−) তড়িৎ প্রবাহিত হইবে। এই কোষে দস্তার সহিত সালফিউরিক অ্যাসিডের রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলে তড়িৎপ্রবাহ সৃষ্টি

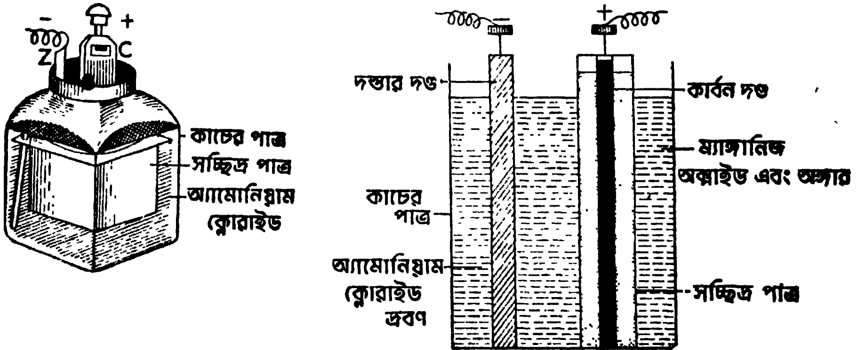


চিত্র 25
ড্যানিয়েল কোষ

হয়। এই কোষের তড়িৎচালক বল (Electromotive force) 1·08 ভোল্ট। এই কোষের ভিতরের রোধ খুব বেশী। সেইজন্য কিছুক্ষণের জন্য সামান্য অথচ অপরিবর্তিত (Constant) তড়িৎপ্রবাহ পাইতে গেলে এই কোষ খুব সুবিধাজনক। ব্যবহারান্তে কোষের উপকরণগুলি আলাদা করিয়া রাখা দরকার। সালফিউরিক অ্যাসিড কোষের সক্রিয় তরল এবং তুঁতের দ্রবণ ছদন-নিবারক।

(2) **লেকলান্সি কোষ (Leclanche cell) :—**

এই কোষে (চিত্র 26) একটি কাঁচের পাত্রের মধ্যে অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইডের জলীয় দ্রবণ ভরিয়া তাহার মধ্যে একটি দস্তার দণ্ড ডুবাইয়া রাখা হয়। এই দস্তার দণ্ডটি ঋণাত্মক মে ; −) ক্রিয়া করে। কাঁচ পাত্রের মাঝখানে অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড দ্রবণের মধ্যে একটি সচ্ছিদ্র চীনামাটির পাত্র বসান থাকে। এই পাত্রের মধ্যে একটি কঠিন দণ্ড থাকে এবং তাহার চারিধারে ম্যাঙ্গানিজ ডাইঅক্সাইড (Manganese dioxide) ও কাঠকয়লার গুঁড়ার মিশ্রণ দিয়া ভরতি থাকে। কার্বন দণ্ডটি ধনাত্মক মেরুর (+) ক্রিয়া করে। কার্বন ও দস্তার বাহিরের দিক পরিবাহী তার দিয়া সংযুক্ত করিলে ঐ তার দিয়া তড়িৎ

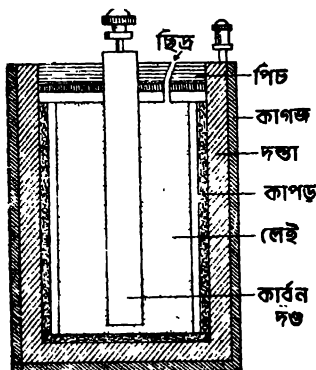


চিত্র 26
লেকল্যান্সি কোষ

প্রবাহ চলিবে। এই কোষের তড়িৎ চালক বল 1·5 ভোল্ট। এই কোষ একটানা কিছুকাল চালান উচিত নহে; চালাইলে কোষের প্রবাহ থামিয়া যায়। বিরতিযুক্ত (Intermittent) কাজের পক্ষে এই কোষ খুব সুবিধাজনক। বৈদ্যুতিক ঘণ্টা, টেলিফোন, টেলিগ্রাফ প্রভৃতি বৈদ্যুতিক যন্ত্রে এই কোষ খুব সুবিধাজনক। অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড দ্রবণ কোষের সক্রিয় তরল এবং MnO_2 ছদন-নিবারক।

(3) নির্জল কোষ (Dry cell) ঃ

টর্চ লাইটের ব্যাটারি, সাইকেলের আলো, বেতার যন্ত্রে ব্যবহৃত নির্জল ব্যাটারি লেকল্যান্সি কোষেরই পরিবর্তিত রূপ। এই কোষে তরলের পরিবর্তে একটি লেই (Paste) ব্যবহার করা হয়। এজন্য ইহাকে **নির্জল কোষ** বলা হয়। প্রকৃত পক্ষে ইহা নির্জল নয়। দস্তার একটি চোঙ এই কোষের ধারকপাত্র এবং কোষের ঋণাত্মক মেরু হিসাবে কাজ করে (চিত্র 27)। অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইডের দ্রবণের সহিত ময়দা, ম্যাঙ্গানিজ ডাই-অক্সাইড, কাঠের গুঁড়া (গ্রাফাইড) প্রভৃতি মিশাইয়া লেই (Paste) তৈয়ারী করা হয়। কখন কখন এক টুকরা কাপড় বা ব্লটিং কাগজ সচ্ছিদ্র পাত্রের কাজ করে। এই ছিদ্র দিয়া অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড দস্তার সহিত রাসায়নিক ক্রিয়া করে। কার্বন-দণ্ড ম্যাঙ্গানিজ ডাই-অক্সাইড ও কাঠের গুঁড়ার মধ্যে জমানো থাকে এবং এইগুলি অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড ও জিঙ্ক ক্লোরাইড দ্রবণে ভিজাইয়া লওয়া হয়। দ্রবণের জল যাহাতে একেবারে শুকাইয়া না যায় সেইজন্য উহাতে একটু জিঙ্ক ক্লোরাইড দ্রবণ মিশানো হয়। কোষের উপরিভাগে গালা বা পিচ্ দিয়া (ইহা তড়িৎ অপরিবাহী) একেবারে বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। কোষের ভিতর হইতে গ্যাস বাহির হইবার জন্য ইহার উপরিস্থলে একটি ক্ষুদ্র ছিদ্র থাকে। নির্জল কোষের তড়িৎচালক বল 1·5 ভোল্ট। অবিরাম ভাবে ব্যবহৃত হইলে ইহাতে ছদন দোষ ঘটে কিন্তু কিছুক্ষণ বর্তনী খোলা থাকিলে ইহার স্বাভাবিক ক্ষমতা ফিরিয়া আসে।



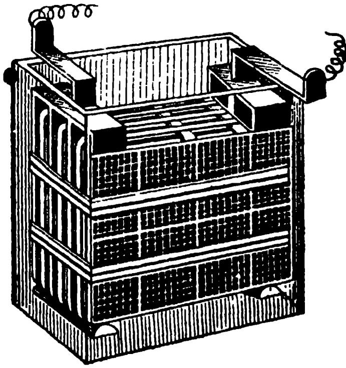
চিত্র 27
নির্জল কোষ

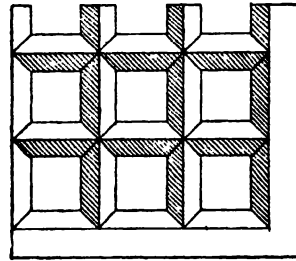
(4) সঞ্চয়ক (Accumulator) বা সঞ্চয়ক কোষ (Storage cell) ঃ—

মৌল বা প্রাথমিক কোষ নিজেরাই তড়িৎপ্রবাহ উৎপন্ন করিতে পারে। আর একপ্রকারের কোষ আছে যাহাদের উপরে প্রথমে তড়িৎপ্রবাহের ক্রিয়া ঘটাইলে পরে উহারা নিজের প্রবাহ দিতে পারে। এইরূপ কোষকে **মাধ্যমিক বা গ্রাহী** কোষ বলে। ইহাতে তড়িৎ সঞ্চার করিয়া রাখা যায় বলিয়া ইহাকে **সহায়ক** কোষ বা **সঞ্চয়ক** বলা হয়।

লেড সঞ্চয়ক কোষ (Lead storage cell) :—

এই কোষের কার্যপ্রণালী প্রাথমিক কোষ হইতে পৃথক। এই কোষের একটি স্বচ্ছ কাঁচের পাত্রের মধ্যে লঘু সালফিউরিক অ্যাসিড থাকে। এই অ্যাসিডের মধ্যে অনেকগুলি সীসার পাত পাশাপাশি সমান্তরালভাবে সাজান থাকে (চিত্র 28)। ঐ পাতগুলি পর্যায়ক্রমে (Alternating) দুইটি তড়িৎ দ্বারের সহিত যুক্ত থাকে। পাতগুলি নিরেট নহে ; ঐগুলি ঝাঁঝরার মত জালি (Grid) করা থাকে। প্রত্যেক দুইটি সীসার পাতের মধ্যে লিথাজ বা সীসা অক্সাইড (PbO) ভরতি থাকে। কিন্তু উহা সালফিউরিক অ্যাসিডের ক্রিয়ায় রেড্‌লেড বা সীসার সালফেটে ($PbSO_4$) পরিণত হয়। এই কোষের দুই প্রান্তে অবস্থিত দুইটি সীসার পাতের প্রান্তের সহিত ডাইনামোর (Dynamo) ধনাত্মক মেরু (+) ও ঋণাত্মক মেরু (−) তার দ্বারা যুক্ত করিয়া ডাইনামো হইতে বিদ্যুৎ চালনা করিলে কোষটি আহিত (Charged) হয়। আহিত করার ফলে তড়িৎশক্তি রাসায়নিক শক্তিতে রূপান্তরিত হইয়া থাকে। রাসায়নিক পদার্থগুলিকে কার্যক্ষম করিবার জন্য বাহিরের কোন উৎস হইতে কোষের ভিতর তড়িৎপ্রবাহ পাঠানো হয়। ইহাকে কোষের **আহিতকরণ** (Charging)





চিত্র 28

সঞ্চয়ক কোষ — সীসার জালি

বলে। কোষটি আহিত হইলে অ্যানোড পাতে সীসার পার-অক্সাইড (Lead peroxide, PbO_2) এবং অন্য পাতে (−) ধাতব সীসা (Lead metal) তৈয়ারী হয়। এই রাসায়নিক ক্রিয়ার জন্য তড়িৎ সঞ্চিত হয় এবং একটি তারের সাহায্যে অ্যানোডের (+) সহিত ক্যাথোড (−) যুক্ত করিয়া দিলে কোষ হইতে তড়িৎপ্রবাহ

পাওয়া যায়। কোষে তড়িৎপ্রবাহ কমিয়া গেলে পুনরায় ইহাকে ডাইনামোর সাহায্যে আহিত করিয়া লইতে হয়। আহিত করা অবস্থায় ইহার বিভবপার্থক্য বা তড়িৎ-চালক বল হয় 2 ভোল্ট। সঞ্চয়ক কোষে তড়িৎ-উৎপাদন ক্ষমতা বেশী। রেল, মোটর লরী, জাহাজ প্রভৃতি যানবাহনে, পরীক্ষাগারে নানাবিধ কার্যের জন্য, পেট্রল ইঞ্জিনে, সঞ্চয়ক কোষ খুব বেশী ব্যবহৃত হয়।

ডাইনামো (Dynamo): বর্তমান যুগ একটি বৈদ্যুতিক যুগ। কার্যক্ষেত্রে চল-বিদ্যুতের ব্যাপক প্রয়োগ এবং উহার সাফল্যের জন্যই আধুনিক সভ্যজগতকে এইরূপ বলা হয়। বর্তমান যুগ তড়িৎশক্তির উপর নির্ভরশীল। বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রচুর পরিমাণে তড়িৎ চুম্বকীয় আবেশের নীতির উপর নির্ভর করিয়া ডাইনামো নামক যন্ত্রের সাহায্যে এত অধিকপরিমাণে তড়িৎপ্রবাহ উৎপন্ন করা সম্ভবপর হইয়াছে। ডাইনামো দুইপ্রকারের হইতে পারে:—(1) অলটারনেটার (Alternator বা A. C.) ডায়নামো যাহার বর্তনীতে পরিবর্তী (Alternating) তড়িৎপ্রবাহ উৎপন্ন করে এবং (2) সমপ্রবাহ (Direct current বা D. C.) ডায়নামো। D. C. ডায়নামো কোন বর্তনীতে সমতড়িৎপ্রবাহ উৎপন্ন করে।

শক্তির উৎস রূপে তড়িৎ

(Electricity as a source of Energy)

18. আমরা জানি, শক্তির বিভিন্ন রূপ আছে, যথা,—তাপ, আলোক, শব্দ, চুম্বক, তড়িৎ। কোন যন্ত্র বা চাকা ঘুরাইতে, পাখা ঘুরাইতে (চলশক্তি), তাপ উৎপাদন করিতে (তাপ শক্তি) ও বাতি জালাইতে (আলোক শক্তি) তড়িৎ-শক্তি সর্বাপেক্ষা বেশি প্রয়োজন অর্থাৎ গৃহকার্যে ও শিল্পকার্যে তড়িতের ব্যবহার অনস্বীকার্য।

(1) কোন পরিবাহীতে তড়িৎপ্রবাহ চালাইয়া চৌম্বক ক্ষেত্রের সাহায্যে পরিবাহী ঘূর্ণন সৃষ্টি যে যন্ত্রে করা যায় উহাকে একটি **তড়িৎ** বা **বৈদ্যুতিক মোটর** বলে। **এখানে তড়িৎ-শক্তি যান্ত্রিক-শক্তিতে রূপান্তরিত হয়।**

(2) তড়িৎ-শক্তিকে তাপ-শক্তিতে রূপান্তরিত করিয়া ইলেকট্রিক আয়রন (Electric iron), ইলেকট্রিক হিটার (Electric heater), ইলেকট্রিক স্টোভ (Electric stove) প্রভৃতি যন্ত্রকে কাজে লাগানো হয়। রোধক তারের (Resistance coil) যথা, নাইক্রোম তার (Nicrome wire) এর মধ্য দিয়া তড়িৎচালনা করিলে তার তড়িৎ-প্রবাহকে যত বাধা দেয় তার ততই গরম হয়। **এইভাবে তড়িৎ-শক্তি তাপ-শক্তিতে রূপান্তরিত হয়।**

(3) খুব সরু রোধক তারের মধ্য দিয়া তড়িৎ প্রবাহিত করিলে তার এত উত্তপ্ত হইয়া উঠে যে তাহার ফলে উহা ভাস্বর (Incandescent) হইয়া উঠে অর্থাৎ তার হইতে আলো বাহির হয়। **এখানে তড়িৎশক্তি তাপ ও আলোক শক্তিতে রূপান্তরিত হয়।** বৈদ্যুতিক আলোকে আমাদের ঘর, দোকান, অফিস, বড় বড় শহরের রাস্তা প্রভৃতি আলোকিত করিয়া রাখে।

বৈদ্যুতিক মোটর (Electric Motor) ঃ

এই যন্ত্রে তড়িৎ-শক্তিকে যান্ত্রিক শক্তিতে রূপান্তরিত করা হয়। উহার কার্যনীতি ডায়নামোর কার্যনীতির ঠিক বিপরীত। ডায়নামো যন্ত্রে যান্ত্রিক শক্তির পরিবর্তে তড়িৎশক্তি পাওয়া যায়। ঐ যন্ত্রে আর্মেচার (Armature)-কে একটি শক্তিশালী চুম্বক-ক্ষেত্রে রাখিয়া ঘুরাইলে, যান্ত্রিক-শক্তি তড়িৎশক্তিতে রূপান্তরিত হয়।

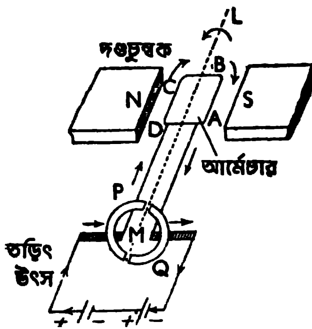
একটি নরম লোহার চোঙের উপর জড়ানো অসংখ্য তামার তার-কুণ্ডলীর নাম **আর্মেচার।**

বার্লোর চক্রে তড়িৎ-প্রবাহের দ্বারা চক্রকে ঘুরানো হয়। ইলেকট্রিক মোটরেও ঐ নীতি অনুযায়ী কাজ হয়। মোটর যন্ত্রের অংশগুলি ঃ—

(1) আর্মেচার (Armature), (2) ক্ষেত্রচুম্বক (Magnetic field), ব্রাশ (Brushes), (4) কমুটেটর (Commutator)।

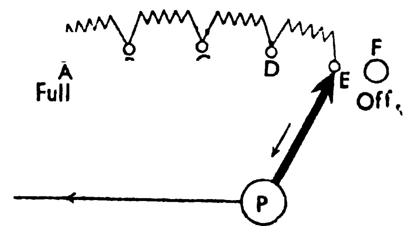
কার্য-প্রণালী ঃ—চিত্র 29-এ $ABCD$ আর্মেচার কুণ্ডলী। একটি শক্তিশালী চুম্বকের দুই মেরুর (NS) মাঝখানে অনুভূমিক অক্ষদণ্ড LM এর সহিত কুণ্ডলীটি সংলগ্ন থাকে। আর্মেচার কুণ্ডলীর প্রান্তদ্বয় একটি খণ্ডিত বলয় কমুটেটরের (Split ring commutator) দুই অংশে P ও Q এর সহিত যুক্ত থাকে। খণ্ডিত বলয় কমুটেটর ও ব্রাশের সাহায্যে তড়িৎকোষের ধনাত্মক ও ঋণাত্মক মেরুর সহিত কুণ্ডলীর

দুই প্রান্তের সংযোগ স্থাপিত হয়। কুণ্ডলীর ভিতর দিয়া তড়িৎ চালনা করিলে কুণ্ডলীটি ও সংলগ্ন অক্ষদণ্ডটি কুণ্ডলীর *LM*-এর চতুর্দিকে ঘুরিতে থাকে। **এখানে তড়িৎ-শক্তি যান্ত্রিক শক্তিতে পরিণত হয়।** আমরা জানি তড়িৎবাহী সঞ্চরণশীল (movable) তার চৌম্বক ক্ষেত্রে রাখিলে তারটি বল অনুভব করে এবং বিক্ষিপ্ত হয়। এই বিক্ষেপ ফ্লেমিং-এর বামহস্ত নিয়ম দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। আর্মেচার যখন উল্লম্ব (vertical) অবস্থায় থাকে, তখনই তড়িৎ প্রবাহের অভিমুখ পরিবর্তন হয়। যাহার ফলে আর্মেচার একই দিকে ঘুরিতে থাকে। মোটরের ভিতর দিয়া যতক্ষণ তড়িৎ-প্রবাহ চলে, আর্মেচারও ততক্ষণ ঘুরিতে থাকে। তড়িৎ-প্রবাহের মাত্রা বাড়াইয়া এবং শক্তিশালী চুম্বক স্থাপন করিয়া আর্মেচার প্রবলবেগে ঘুরানো যাইতে পারে। আর্মেচারের এই ঘূর্ণনকে পাখা চালানোর ও কলকারখানার যন্ত্রাদি, ট্রামগাড়ী, পাম্প প্রভৃতি চালানোর কাজে ব্যবহার করা হয়। বৈদ্যুতিক পাখায় মোটরের কুণ্ডলীর অক্ষদণ্ডের সহিত পাখার ব্লেডগুলি লাগানো হয়। তারের কুণ্ডলীর মধ্যে তড়িৎপ্রবাহ করিলে ইহার সংলগ্ন অক্ষদণ্ডটির সহিত পাখাটিও ঘুরিতে থাকে।



চিত্র 29
বৈদ্যুতিক মোটর

ইলেকট্রিক মোটরের তারের কুণ্ডলীর মধ্যে তড়িৎ-প্রবাহ বৃদ্ধি করিয়া দিলে মোটর জোরে চলে এবং তড়িৎ-প্রবাহ হ্রাস করিয়া দিলে মোটর আস্তে চলে। মোটর চালাইবার সময়ে আর্মেচার প্রথমেই পূর্ণ মাত্রায় তড়িৎ প্রবাহিত করিলে আর্মেচার পুড়িয়া যাইতে পারে। সেইজন্য রেগুলেটর (চিত্র 30) (Regulator)-এর সাহায্যে তড়িৎ প্রবাহ বৃদ্ধি বা হ্রাস করা যায়। রেগুলেটরের ভিতর কতকগুলি রোধক তারের কুণ্ডলী রাখা হয়। ইহার হাতল ঘুরাইয়া রোধ কমাইয়া মোটরের গতি বৃদ্ধি করা হয়। রেগুলেটরটির কাঁটা (pointer) A, B, C, প্রভৃতি বিভিন্ন অবস্থায় থাকিলে তড়িৎপ্রবাহের বৃদ্ধি-হ্রাসের জন্য মোটরটি জোরে বা আস্তে চলিবে।

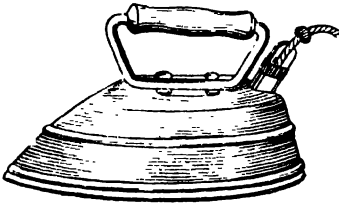


চিত্র 30
রেগুলেটার

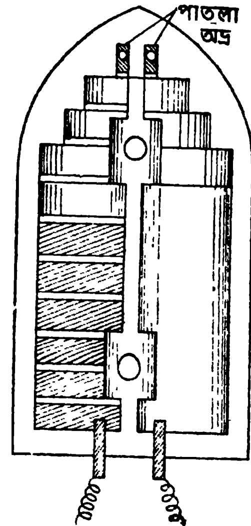
19. বৈদ্যুতিক শক্তিকে তাপ শক্তিতে রূপান্তরিত করা :—

রোধক তারের নির্মিত যন্ত্রে তড়িৎ চালনা করিলে উত্তাপের সৃষ্টি হয়। রোধক তারের মধ্য দিয়া তড়িৎ প্রবাহ বাধাপ্রাপ্ত হয় বলিয়া খানিকটা তড়িৎশক্তি তাপ-শক্তিতে রূপান্তরিত হয় এবং রোধক তারকে গরম করে। তড়িৎ-শক্তিকে কাজে লাগাইয়া তাপ উৎপাদনের জন্য যে সব যন্ত্র আছে, তাহাদের মধ্যে ইলেকট্রিক হিটার (Electric heater), ইলেকট্রিক স্টোভ (Electric stove), ইলেকট্রিক ইস্ত্রি (Electric Iron), আর্ক-দীপ (Arc-lamp), বৈদ্যুতিক চুল্লী (Electric furnace), বৈদ্যুতিক ধাতু জোড়ক (Electric welder) প্রভৃতি।

ইলেকট্রিক ইস্ত্রি :—লোহার ইস্ত্রির (চিত্র 31) ভিতরে রোধক তারের সাহায্যে তড়িৎ প্রবাহ দ্বারা উত্তপ্ত করিবার যন্ত্রকে ইলেকট্রিক ইস্ত্রি বলে। ইহা ইলেকট্রিক হিটারের পর্যায়ে পড়ে। ইহার বাহিরের আবরণটি মরিচাশূন্য ইস্পাতে তৈয়ারী। এই যন্ত্রের ভিতরে পাতলা অভ্রের বা চীনামাটির একটি পাত (plate) (চিত্র 32) আছে। ইহার গায়ে রোধক তার জড়ানো থাকে। যন্ত্রের মধ্য দিয়া



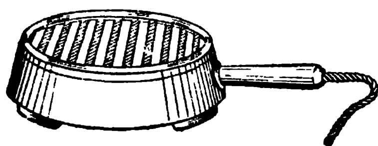
চিত্র 31
ইলেকট্রিক ইস্ত্রি



চিত্র 32
ইলেকট্রিক ইস্ত্রি (ভিতরের অংশ)

তড়িৎ প্রবাহ পাঠানো হইলে রোধক তার উত্তপ্ত হয় ও সেই সঙ্গে লোহার ইস্ত্রিটিও উত্তপ্ত হইয়া উঠে। তখন উহাকে জামা কাপড়ের উপর বসাইয়া চাপ দিয়া জামা কাপড় ইস্ত্রি করা হয়।

ইলেকট্রিক স্টোভ ঃ—এই যন্ত্রে গোল খাঁজ কাটা অগ্নিদগ্ধ মৃত্তিকার (পোড়ান চীনামাটির) খাঁজের মধ্যে রোধক নাইক্রোম তারের কুণ্ডলী জড়ানো থাকে। নিকেল, আয়রন ও ক্রোমিয়াম ধাতু সহযোগে প্রস্তুত সংকর ধাতুর নাম **নাইক্রোম**। এই কুণ্ডলীর মধ্যে তড়িৎপ্রবাহ পাঠান হইলে কুণ্ডলীটি লোহিত তপ্ত (red hot) হইয়া তাপ উৎপন্ন করে। ইহা গৃহস্থালীর নানাবিধ কাজে লাগে। ইহা রান্নার কাজে ব্যবহৃত হয়।



চিত্র 33
ইলেকট্রিক হিটার

ইলেকট্রিক হিটার ঃ—ইলেকট্রিক স্টোভের সহিত ইহার বিশেষ কোন পার্থক্য নাই; সাধারণতঃ ইহা রান্নার কাজে ব্যবহৃত হয় না। অন্যান্য গরম করার কাজে খুবই উপযোগী। ইহারও রোধক তারের মধ্য দিয়া তড়িৎ প্রবাহিত করিয়া কুণ্ডলী উত্তপ্ত করা হয় (চিত্র 33)।

ইলেকট্রিক ফিউজ (Electric fuse) ঃ—উচ্চ তড়িৎ প্রবাহের ক্রিয়ায় অতিরিক্ত উত্তাপ সৃষ্টি হইয়া যাহাতে তড়িৎ বর্তনীর বিভিন্ন অংশ তাপে গলিয়া না যায় বা পুড়িয়া না যায় তাহার জন্য ঐ বর্তনীর কোন নির্দিষ্ট স্থানে **ইলেকট্রিক ফিউজ** ব্যবহার করা হয়। ইহা নিম্ন গলনাঙ্ক বিশিষ্ট কোন ধাতুসংকর দ্বারা তৈয়ারী কোন তার বা পাত বিশেষ। গৃহের ফিউজ তার টিন, সীসা, তামা বা এক বিশেষ ধরনের টিন-সীসার সংকর ধাতু (সীসা 75%, টিন 25%) দ্বারা তৈয়ারী হয়।

20. তড়িৎ শক্তিকে আলোক শক্তিতে রূপান্তরিত করা ঃ

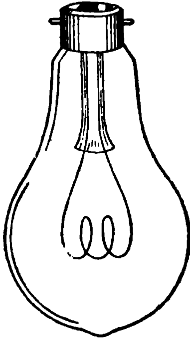
প্রধানতঃ তিন প্রকারে বিদ্যুৎ হইতে আলোক পাওয়া যায়, যথা—

(1) ইলেকট্রিক বাতি (Electric bulb), (2) ইলেকট্রিক আর্ক (Electric arc), (3) ফ্লোরেসেন্ট টিউব (Fluorescent tube) :

ইলেকট্রিক বাতি ঃ—ইহা বায়ুশূন্য অথবা কার্বন গ্যাস ভরা কাঁচের বাল্ব। তাহার মধ্যে টাংষ্টেন (Tungsten) অথবা মলিবডেনামের (Molybdenum) সরু তার ফিট্ করা থাকে। উচ্চ গলনাঙ্ক বিশিষ্ট কোনও সরু ও দীর্ঘ তারের মধ্য দিয়া বেশী তড়িৎপ্রবাহ পাঠাইলে উহা এতই গরম হইয়া উঠে যে উহা ভাস্বর হইয়া উঠে এবং তখন আলোক সৃষ্টি হয়। এই আলোকই বৈদ্যুতিক

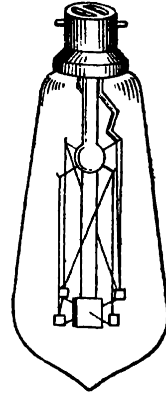
আলো। এই নীতির উপর নির্ভর করিয়া সাধারণ বৈদ্যুতিক বাতির সৃষ্টি। উহাতে ব্যবহৃত সরু ও দীর্ঘ তারকে **filament** বলে।

কার্বন বাতি (Carbon lamp) :—



চিত্র 34

কার্বন বাতি



চিত্র 35

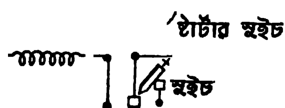
টাংস্টেন বাতি

ইংরেজ বৈজ্ঞানিক সোয়ান (Swan) এবং আমেরিকান বৈজ্ঞানিক এডিসন (Edison) 1880 খ্রীষ্টাব্দে কার্বন বাতি (চিত্র 34) আবিষ্কার করেন। ইহা একটি কাঁচের বালব। ইহার মধ্যের বায়ু সম্পূর্ণরূপে নিষ্কাশিত করিয়া লওয়া হয় অর্থাৎ ইহা বায়ুশূন্য থাকে। এই বালবের মধ্যে কার্বনের একটি সরু তার থাকে। ইহাব মধ্য দিয়া তড়িৎ প্রবাহ পাঠাইলে কার্বন ফিলামেণ্ট ভাস্বর হইয়া উঠে ও আলো প্রদান করে। বালবটি বায়ুশূন্য করিবার কারণ এই যে, কোন তার গরম হইয়া উঠিলে উহার মধ্যে অবস্থিত বায়ুর অক্সিজেনের ঐ কার্বনের সহিত বা তারের ধাতুর সহিত (অন্য বাতির ক্ষেত্রে) রাসায়নিক ক্রিয়া হইবে। ইহার দ্বারা উৎপন্ন অক্সাইডের দ্বারা তার শীঘ্র নষ্ট হইয়া যাইবে। কার্বন বাতির নানা অসুবিধা থাকার জন্য আজকাল কার্বন বাতির প্রচলন কমিয়া গিয়াছে এবং তাহার স্থানে ধাতব ফিলামেণ্টযুক্ত বৈদ্যুতিক বাতির প্রচলন হইয়াছে।

টাংস্টেন বাতি (Tungsten lamp)—ইহা ধাতব ফিলামেণ্টযুক্ত বৈদ্যুতিক বাতি (চিত্র 35)। বায়ুশূন্য কাঁচের বালবের মধ্যে টাংস্টেনের লম্বা তার ঢুকানো

থাকে। ইহাই বাতির ফিলামেণ্ট। ইহা কার্বন বাতি অপেক্ষা অধিক আলো দেয়। আজকাল বালবগুলি প্রথমে বায়ুশূন্য করিয়া পরে আবার সামান্য শুষ্ক নিষ্ক্রিয় গ্যাস (যথা,—আর্গন ও নাইট্রোজেনের মিশ্রণ) দ্বারা পূর্ণ করিয়া দেওয়া হয়। ইহাতে বালবের মধ্যে ফিলামেণ্ট বেশী দিন যায়। সোজা তারে বাতির ঔজ্জ্বল্য কমিয়া যায় বলিয়া আজকাল টাংস্টেনের কুণ্ডলিত তার ব্যবহার করা হয়। ইহাই আধুনিক বৈদ্যুতিক বাতি। বর্তমানে প্রায় সর্বত্র এই বাতি ব্যবহৃত হয়।

ফ্লোরেসেণ্ট বাতি (Fluorescent lamp):—আজকাল ফ্লোরেসেণ্ট বাতির খুব বেশী ব্যবহার হইতেছে। অনেক বাড়ি, পূজামণ্ডপ, দোকান, লাইব্রেরী, হাসপাতাল প্রভৃতি নানাস্থান এই বাতির ব্যবহার করিয়া আলোকিত করা হয়। এই বাতিতে যে লম্বা কাঁচের নল ব্যবহৃত হয় (চিত্র 36) তাহা প্রথমে বায়ুশূন্য করিয়া পরে সামান্য আর্গন বা নাইট্রোজেনের গ্যাস ও খুব সামান্য পারদ বাষ্প ভরা থাকে। নলের ভিতর দিকের দেওয়ালে ফ্লোরেসেণ্ট রঙের প্রলেপ দেওয়া হয়। নলের দুই মুখ বন্ধ করিয়া দুইটি তারের কুণ্ডলী দুই মুখে প্রবেশ করাইয়া দেওয়া হয়। এইগুলি তড়িৎ দ্বার (Electrodes)। একটি স্টার্টার সুইচ চালু করিয়া কুণ্ডলীকে গরম করা হয়। ইহাতে কুণ্ডলী হইতে ইলেকট্রন নির্গত হইতে থাকে এবং নলের মধ্যে পারদের বাষ্পের মাত্রা বাড়িয়া যায়। এই সময় স্টার্টার সুইচ নিজেই বন্ধ হইয়া যায়। সুইচ টিপিয়া বাতির মধ্য দিয়া তড়িৎপ্রবাহ চালনা করিলে পারদ বাষ্পের মধ্য দিয়া তড়িৎপ্রবাহ চলিতে থাকে। কিছুক্ষণ পরে কাঁচের নলের ভিতরের গ্যাস হাল্কা আলো প্রকাশ করে।



চিত্র 36
ফ্লোরেসেণ্ট বাতি

ফ্লোরেসেণ্ট বাতির আলো অনেকটা দিনের আলোর মত সাদা হয়। এই বাতির আলো অধিকতর উজ্জ্বল হয় এবং এই বাতি জ্বালাইতে তড়িতের খরচও কম লাগে।

বিভিন্ন প্রকার ফ্লোরেসেণ্ট রঙের প্রলেপযুক্ত কাঁচের নলের মধ্যে নিয়ন গ্যাসের সহিত সামান্য বাষ্প মিশাইয়া নলের দুই প্রান্তে বিদ্যুৎ ক্ষরণ (discharge) করাইলে বাতির আলো নানা বর্ণের হয়। ইহাই **নিয়ন আলো** (Neon tubes)।

ইলেকট্রিক আর্ক (Electric arc) :—এই প্রণালীর দ্বারা যে আলোর উদ্ভব হয় তাহা খুবই উজ্জ্বল।

দুইটি লম্বা তড়িৎ-পরিবাহী গ্রাফাইটের দণ্ডের (conducting rod) বা গ্যাস কারবনের দণ্ড—দুইটি প্রান্তের সহিত উপযুক্ত ভোল্ট সম্বলিত তড়িৎ-উৎসের ধনাত্মক (+) এবং ঋণাত্মক মেরুতে (−) তার দ্বারা যুক্ত করিয়া আবার দুই প্রান্ত খুব নিকটে আনিলে মিলনস্তরের ফাঁকের মধ্যে বিদ্যুৎ স্ফুলিঙ্গ হইতে থাকে। ইহাতে প্রচণ্ড তাপ উৎপন্ন হইয়া তীব্র আলোর বিকিরণ হইতে থাকে। ইহা যখন ঠিকভাবে জ্বলিতে থাকে তখন তাহাকে **আর্ক বাতি** (Arc lamp) বলে। ম্যাজিক লণ্ঠন ও সিনেমার ছবি দেখাইতে আর্ক বাতি ব্যবহার হয়। যখন এই প্রণালী উত্তাপ উৎপাদনের উদ্দেশ্যে চুল্লীতে (Furnace) ব্যবহৃত হয় তখন ইহাকে **আর্ক চুল্লী** (Arc furnace) বলে।

সংবাদ আদান-প্রদানে তড়িতের ব্যবহার (Electricity for Communication) :—

21. তড়িতের সাহায্যে সংবাদ প্রেরণ :—

সংবাদ আদান প্রদান বা বার্তা বহনের কাজে আজকাল তড়িৎ-শক্তি বিপুল পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। বৈদ্যুতিক উপায়ে এক স্থান হইতে অন্যত্র সংবাদ প্রেরণ দুই প্রকারে করা যায়, যথা—

(1) **তারে**—তড়িৎপ্রবাহের সাহায্যে, যেমন বৈদ্যুতিক ঘণ্টা, টেলিগ্রাফ ও টেলিফোন।

(2) **বে-তারে**—বিদ্যুৎতরঙ্গের সাহায্যে, যেমন রেডিও, টেলিভিসন।

বৈদ্যুতিক টেলিগ্রাফ (Electric Telegraph) :—টেলিগ্রাফ যন্ত্রে তড়িৎ-প্রবাহের সাহায্যে একস্থান হইতে অন্যস্থানে সংকেত (signal) পাঠানো যায়।

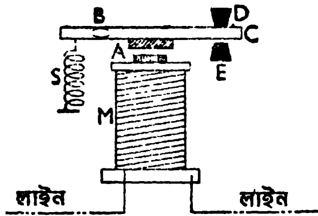
এই যন্ত্রের তিনটি অংশ—(1) **প্রেরক যন্ত্র** (Transmitter) ও **গ্রাহক যন্ত্র** (Receiver), (2) **বৈদ্যুতিক বর্তনী** (Line Circuit) এবং (3) **ব্যাটারি**।

প্রেরক যন্ত্র হইতে যে তার টেলিগ্রাফ পোষ্টের উপর দিয়া গ্রাহক যন্ত্র পর্যন্ত চলিয়া যায় তাহাকে **লাইন তার** বা **বৈদ্যুতিক বর্তনী** বলে।

প্রেরক যন্ত্রের এক প্রান্ত ব্যাটারির সহিত সংযুক্ত থাকে। ঐ ব্যাটারির অপর প্রান্ত মাটিতে পুঁতিয়া দেওয়া হয়। এইভাবে মাটির ভিতর দিয়া বৈদ্যুতিক বর্তনী সম্পূর্ণ হয়।

মুলনীতি ঃ—বৈদ্যুতিক চুম্বকের ক্ষণস্থায়ী চুম্বকত্বের ক্রিয়ার সাহায্যে টেলিগ্রাফ যন্ত্র চালান হয়।

গ্রাহক যন্ত্র (Receiver): ইহার (চিত্র 37) প্রধান অংশ একটি তড়িৎচুম্বক *M*। লাইনের তড়িৎপ্রবাহ এই তড়িৎচুম্বকের তারের মধ্য দিয়া যায় এবং লাইনে যতক্ষণ প্রবাহ থাকে ততক্ষণ ইহা সক্রিয় থাকে। *M* এর মেরুর কাছেই একটি কাঁচা লোহা *A* (Armature) যুক্ত লিভার *BC* থাকে। এই লিভারের আলম্ব *B*তে। লিভারের এক প্রান্তে আবদ্ধ স্প্রিং *S* এর টানে লিভারের অন্যপ্রান্ত উপরের একটা স্ক্রু '*D*'তে ঠেকিয়া থাকে। এই প্রান্তে আর একটি স্ক্রু '*E*' আছে।



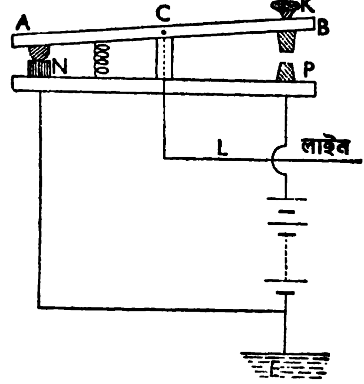
চিত্র 87
গ্রাহক যন্ত্র

চুম্বকের তারের ভিতর দিয়া তড়িৎ প্রবাহিত হইলে তড়িৎচুম্বকটি চুম্বকত্ব প্রাপ্ত হইয়া কাঁচা লোহা *A*কে আকর্ষণ করে। তখন লিভারের প্রান্ত নীচে নামিয়া আসিয়া '*E*' স্ক্রুকে আঘাত করে। ফলে 'টক্' করিয়া একটি শব্দ হয়। প্রবাহ চলিবার সময়ের তারতম্য অনুযায়ী উৎপন্ন দুই শব্দের মধ্যে সময়ের পার্থক্য হইয়া থাকে। স্বল্পক্ষণস্থায়ী প্রবাহ ও দীর্ঘক্ষণস্থায়ী প্রবাহের জন্য শব্দের মধ্যে পার্থক্য বিভিন্ন। স্বল্পক্ষণস্থায়ী প্রবাহের ক্ষেত্রে এই পার্থক্য কম, দীর্ঘক্ষণস্থায়ী প্রবাহের ক্ষেত্রে এই পার্থক্য বেশী। Dot ও Dash সাহায্যে বর্ণমালা বা সংখ্যা নিম্নলিখিত ভাবে বুঝানো হয়।

A—	*M*— —	1 — — — —
B—···	*N*—.	5······
C—.—.	*S*···	6—···
D—.	*T*—	9— — — —.

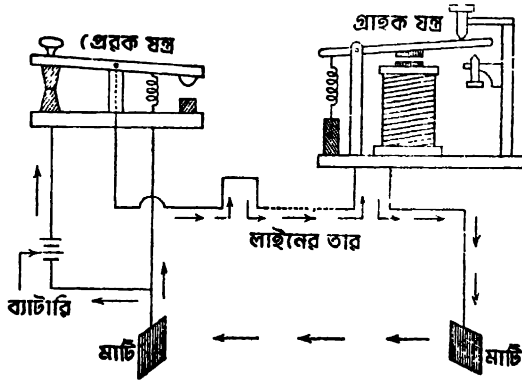
প্রেরক যন্ত্র (Transmitter):—ইহাতে একটি পিতলের তৈয়ারী *AB* দণ্ড থাকে (চিত্র 38)। ইহা লিভারের কাজ করে। উহার আলম্ব *C*

মাঝখানে। সাধারণতঃ 'A' প্রান্ত একটা স্প্রিং S এর টানে নীচে একটা ধাতু (N) এর সঙ্গে যুক্ত হইয়া মাটির সহিত সংযুক্ত থাকে। লিভারের B প্রান্তে একটি চাবি K আছে। K চাবিতে চাপ দিলে ব্যাটারির সহিত লিভারের ধাতুখণ্ড Pএর সংযোগ স্থাপিত হয় এবং লিভারের Nএর সহিত মাটির সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়। ব্যাটারি হইতে বিদ্যুৎ লিভারের মধ্য দিয়া লাইন তারের মাধ্যমে গ্রাহক যন্ত্রে প্রবাহিত হয়। লাইনের দূর প্রান্তও ভূমিসংযুক্ত করা। সুতরাং তড়িৎ বর্তনী লাইন ও ভূমির মধ্যবর্তিতায় সম্পূর্ণ হয় অর্থাৎ প্রবাহ লাইন দিয়া যায় এবং ভূমি দিয়া ব্যাটারিতে ফিরিয়া আসে।



চিত্র 38
প্রেরক যন্ত্র

K চাবি অল্পক্ষণ বা বেশীক্ষণ টিপিয়া থাকিলে প্রবাহ স্বল্পক্ষণ স্থায়ী বা দীর্ঘক্ষণ স্থায়ী হয়। এইরূপ স্বল্পক্ষণস্থায়ী ও দীর্ঘক্ষণস্থায়ী প্রবাহের নানাবিধ সংযোগে



চিত্র 39
বৈদ্যুতিক টেলিগ্রাফ যন্ত্র

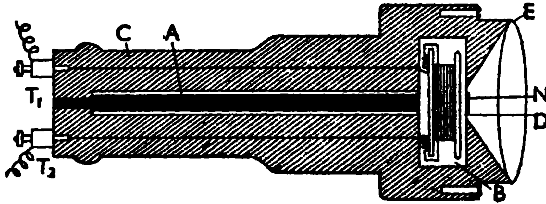
বর্ণমালার বিভিন্ন অক্ষর এবং অন্যান্য সংকেত তৈয়ারী করা হইয়াছে—ইহাই Morse's code বা মর্সের সংকেত।

1884 খ্রীষ্টাব্দে বৈজ্ঞানিক মর্স এই টেলিগ্রাফ পদ্ধতি আবিষ্কার করেন।

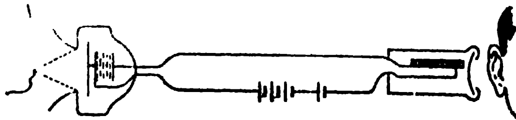
দুই স্টেশনের মধ্যে দূরত্ব বেশী হইলে প্রবাহের স্বতঃক্ষরণ (leakage) হইতে পারে। ফলে প্রবাহ ক্ষীণ হইয়া যায় এবং গ্রাহকযন্ত্রে সাড়া জাগাইতে সক্ষম হয় না। এইরূপ ক্ষেত্রে গ্রাহকযন্ত্র স্থানীয় একটি ব্যাটারির সহিত যুক্ত করিয়া উহার বর্তনী মুক্ত অবস্থায় রাখা হয়। এই রিলে নামক যন্ত্রের সাহায্যেই দূরাগত কোন ক্ষীণ তড়িৎপ্রবাহ এই বর্তনীকে বন্ধ অবস্থায় আনে। তখন স্থানীয় ব্যাটারির ক্রিয়ায় গ্রাহকযন্ত্র সাড়া দেয়। এই রিলের গঠন গ্রাহকযন্ত্রের অনুরূপ। 39 চিত্রে বৈদ্যুতিক টেলিগ্রাফ যন্ত্রটি সম্পূর্ণ দেখান হইয়াছে।

22. **বৈদ্যুতিক টেলিফোন (Electric T‹lephone) :**

টেলিগ্রাফ যন্ত্রে সংকেত পাঠন হয়। তার বিদ্যুতের সাহায্যে মানুষের কণ্ঠস্বর একস্থান হইতে অন্যস্থানে পাঠাইলে, **টেলিফোন** করা হয়। টেলিফোন যন্ত্রের আবিষ্কারক বৈজ্ঞানিক **আলেকজাণ্ডার গ্র্যাহাম বেল**। তিনি 1878 খ্রীষ্টাব্দে এই ব্যবস্থার আবিষ্কার করেন। তাঁহার যন্ত্র **বেল টেলিফোন** নামে খ্যাত। এই যন্ত্রকে রিসিভার হিসাবে ব্যবহার করা হয়। এই যন্ত্রের তিনটি অংশ—(1) প্রেরক যন্ত্র, (2) গ্রাহক যন্ত্র ও (3) লাইন তার—(চিত্র নং 40*a*, 40*b*)। ইহার প্রেরক ও গ্রাহক যন্ত্র একই প্রকার।



চিত্র 40 (a)
বেলএর টেলিফোন



চিত্র 40 (b)
বৈদ্যুতিক টেলিফোন

মূলনীতি : তড়িচ্চুম্বকীয় আবেশের সাহায্যে টেলিফোনে বৈদ্যুতিক ব্যবস্থায় শব্দকে এক স্থান হইতে দূরবর্তী স্থানে পাওয়া যায়।

এই যন্ত্রে (চিত্র 40a) একটি স্থায়ী চুম্বক (A) থাকে। ইহার একপ্রান্তে (N মেরুর সম্মুখে) সরু অন্তরিত তারের বহু পাকের কুণ্ডলী (B) আছে। ইহা একটি কাঠের কাটিমের উপর জড়ানো থাকে। এই যন্ত্রে একটি কাঠের পাটাতনের উপব কালো ইবোনাইটের ফ্রেম C বসানো থাকে। চুম্বক A এই ফ্রেমের মধ্যেই বসানো থাকে। তারকুণ্ডলীর দুইপ্রান্তে ইবোনাইটের মধ্য দিয়া T_1 ও T_2 বন্ধনী স্ক্রুর সহিত সংযুক্ত। এই দুইটি লাইনের যোগ থাকে। এই লাইনের সহিত অপর স্টেশনের গ্রাহক যন্ত্রের বন্ধনী স্ক্রুর সহিত যুক্ত হয়। কুণ্ডলীর সম্মুখে থাকে একখানা ইস্পাতের পাতলা চাকতি D (Diaphragm)। D চাকতির সম্মুখে শক্ত রবারের মুখ থাকে। উহার মাঝখানে গোল ছিদ্র থাকে। ইহাই মুখ-নল (Mouth piece) E। ইহাতে কথা বলা হয়।

ক্রিয়া : স্থায়ী চুম্বক Aএর সম্মুখে D চাকৃতিটি থাকায় উহা আবিষ্ট চুম্বকত্ব লাভ করে।

মুখনল Eতে কথা বলিবার সময় বাতাসে শব্দ-তরঙ্গ সৃষ্টি হয়। সেই শব্দ-তরঙ্গ D চাকৃতিটিকে আঘাত করিয়া তাহাকে চালিত করে। ইহাতে উহা চুম্বকের প্রান্তের নিকটে বা দূরে যায়। একবার নিকটে আগাইয়া আসে এবং একবার দূরে সরিয়া যায়। ইহার ফলে B কুণ্ডলীর ভিতর দিয়া বল-রেখার (Lines of force) সংখ্যা পরিবর্তিত হইবে। A চুম্বকটি স্থির থাকায় D চাকৃতিটি যখন কুণ্ডলী B এর দিকে চুম্বকের N মেরুর নিকট আগাইয়া আসে, তখন কুণ্ডলীর মধ্যে প্রবিষ্ট চৌম্বক বল-রেখার সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। D চাকৃতিটি দূরে সরিয়া গেলে, কুণ্ডলীতে প্রবিষ্ট বল-রেখার সংখ্যা হ্রাস পায়। সুতরাং বল-রেখার সংখ্যার পরিবর্তনের জন্য আবিষ্ট বিদ্যুৎপ্রবাহের নিয়ম অনুযায়ী কুণ্ডলীতে আবিষ্ট প্রবাহের সৃষ্টি হয়। এই আকৃষ্ট তড়িৎ-প্রবাহ T_1 ও T_2 বন্ধনী স্ক্রু দিয়া লাইন তারের মধ্য দিয়া অপর স্টেশনের গ্রাহক যন্ত্রে ঠিক একই প্রকার কুণ্ডলীতে যায়। এই প্রকার গ্রাহক যন্ত্রের চুম্বকের মেরুর আকর্ষণ ক্ষমতার পরিবর্তন ঘটায়—ইহার ফলে ঐ স্থানের ডায়াফ্রাম বেশী বা কম আকৃষ্ট হইবে। সুতরাং উহাও অনুরূপভাবে কাঁপিয়া শব্দ উৎপন্ন করিবে অর্থাৎ প্রেরক যন্ত্রের সম্মুখে কথা বলিলে ঐ ডায়াফ্রাম যে ভাবে কম্পিত হয়, গ্রাহক যন্ত্রের ডায়াফ্রামও ঠিক সেইভাবে কম্পিত হয়। গ্রাহক যন্ত্রের ডায়াফ্রামে এইরূপ কম্পনের ফলে বায়ুতে তরঙ্গের সৃষ্টি হয় এবং ঐ যন্ত্র কোন ব্যক্তির কানের নিকট থাকিলে প্রেরক যন্ত্রে যে কথা বলা হয়, সে তাহা অবিকল শুনিতে পাইবে। টেলিফোনে তড়িৎ-উৎপাদনের জন্য কোনরূপ তড়িৎ-কোষের প্রয়োজন হয় না।

পূর্বে এই অবস্থায় টেলিফোন প্রস্তুত করা হইত। ইহার দ্বারা বেশী দূরে কাহারও সহিত কথা বলা চলিত না বলিয়া ইহার কিছুদিন পরে মাইক্রোফোন ব্যবহার করিয়া টেলিফোন প্রথা প্রচলিত হয়।

প্রশ্নাবলী

1. তড়িতাহিতকরণের অর্থ কি? বিদ্যুৎ কয় প্রকার? স্থির বিদ্যুৎ বলিতে কি বোঝ? ইহা কিরূপে উৎপন্ন হয়?

2. তড়িৎ বিভব-বৈষম্য বলিতে কি বোঝ?

3. সু-পরিবাহী ও কু-পরিবাহী বস্তু বলিতে কি বোঝায়? প্রত্যেক প্রকার বস্তুর উদাহরণ দাও।

4. চিত্রসহ একটি সরল ভোল্টীয় কোষ বর্ণনা কর এবং ইহাতে বৈদ্যুতিক শক্তি কোথা হইতে আসে তাহার উল্লেখ কর। এই কোষের ত্রুটিগুলি কি কি? উহাদিগকে কি উপায়ে দূরীভূত করা যায়?

5. তড়িৎ প্রবাহের সাধারণ প্রভাবগুলি কি কি? ইহাদের বিষয় সংক্ষেপে বল।

6. তড়িৎ-চুম্বক কাহাকে বলে? উহা কেমনভাবে তৈয়ারী করা হয়? উহা কি কি কাজে ব্যবহার করা হয়? বৈদ্যুতিক ঘণ্টার গঠন ও কার্য প্রণালী বর্ণনা কর।

7. 'বিদ্যুতের প্রবাহ-মাত্রা' এবং 'পরিবাহী রোধ' বলিতে কি বোঝ? ইহাদের মধ্যে সম্বন্ধ কি?

8. ফ্লেমিং-এর বাম হস্ত নিয়ম বর্ণনা কর। কি বিষয়ে এই নিয়ম ব্যবহৃত হয়?

9. তড়িৎ-প্রবাহের উপর চুম্বকের ক্রিয়া পরীক্ষার দ্বারা বুঝাইয়া বল।

10. তড়িৎ চুম্বকীয় আবেশের নিয়মগুলি বিবৃত কর। এ বিষয়ে ফ্যারাডের পরীক্ষাটি বর্ণনা কর।

11. বার্লো-চক্রের মূলনীতি কি? উপযুক্ত চিত্রের সাহায্যে বার্লো-চক্রের ব্যাখ্যা কর।

12. নিম্নলিখিত বৈদ্যুতিক সেলগুলি বর্ণনা কর এবং ঐ সব সেলে স্থানীয় ক্রিয়া ও ছদন কিরূপে দূর করা হইয়াছে বল :—

(ক) লেকল্যান্সি সেল, (খ) ড্যানিয়েল সেল ও (গ) নির্জল সেল। লেকল্যান্সি এবং ড্রাই সেলের মধ্যে প্রভেদ কি?

13. ডায়নামো কাহাকে বলে? ডায়নামোর মূলনীতি কি? ইহা কয় প্রকার?

14. বৈদ্যুতিক শক্তিকে যান্ত্রিক শক্তিতে রূপান্তরিত করা হয় যে যন্ত্রে তাহার কার্যপ্রণালী চিত্র সহ বর্ণনা কর।

15. সঞ্চয়ক সেল কাহাকে বলে? ইহার গঠন চিত্রসহ বর্ণনা কর। উহার ব্যবহার বর্ণনা কর।

16. বিদ্যুৎ ও চুম্বকের পরস্পরের উপর ক্রিয়া সম্বন্ধে যাহা জান লিখ।

17. টেলিগ্রাফ পদ্ধতির নীতি কি? চিত্রসহ টেলিগ্রাফ সংযোগ ব্যবস্থা বর্ণনা কর।

18. টেলিফোন কাহাকে বলে? চিত্রসহ উহার কার্যপ্রণালী বর্ণনা কর।

19. শূন্যস্থান পূরণ কর :—

(ক) একটি এবোনাইট দণ্ডকে পশম দিয়া ঘষিলে এবোনাইটে — ও পশমে — বিদ্যুৎ সঞ্চারিত হয়। (খ) সমতড়িতের ভিতর — এবং বিষম তড়িতের ভিতর — হয়। (গ) ঈষৎ অম্লযুক্ত জলের ভিতর দিয়া তড়িৎ প্রবাহ ঘটাইলে জলের অণু — হইয়া পড়ে; ইহাকে — বলে। অক্সিজেন — দ্বারে এবং হাইড্রোজেন — দ্বারে জমে। (ঘ) ডায়নামোর সাহায্যে — শক্তি — শক্তিতে রূপান্তরিত হয়। (ঙ) বৈদ্যুতিক মোটরের মূল নীতি — ঠিক বিপরীত।

20. নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তরে কেবল হাঁ বা না লিখ :—

(ক) ভোল্টা কি প্রথম তাড়িৎ-কোষ আবিষ্কার করেন? (খ) তড়িৎ-চুম্বকীয় আবেশ কি ড্যানিয়েল আবিষ্কার করেন? (গ) বৈদ্যুতিক চুম্বক প্রস্তুত করিতে কাঁচা লোহার পরিবর্তে ইস্পাত ব্যবহার করিলে উহা কি স্থায়ী চুম্বকে পরিণত হয়? (ঘ) ডায়নামোর মূলনীতি কি তড়িৎ-চুম্বকীয় আবেশের উপর প্রতিষ্ঠিত? (ঙ) বৈদ্যুতিক মোটরের এবং ডায়নামোর কার্য-প্রণালী কি একই প্রকার? (চ) বার্লোর যন্ত্রের কাজ হইতে কি ফ্লেমিং-এর বাম-হস্ত নিয়ম প্রমাণিত হয়?

21. নিম্নলিখিত উক্তিগুলির মধ্যে যেগুলি ঠিক তাহাদের পাশে '✓' চিহ্ন দাও :—

(ক) ডায়নামো ও বৈদ্যুতিক মোটরের কার্যপ্রণালী একই প্রকার। (খ) সরল তড়িৎকোষ দ্বারা প্রবাহ চালাইতে হইলে বিদ্যুৎ-চক্র সম্পূর্ণ হওয়া প্রয়োজন। (গ) বার্লো চক্র দ্বারা তড়িৎ-প্রবাহের উপর চুম্বকের ক্রিয়া দেখানো হয়। (ঘ) টেলিফোনে বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য বৈদ্যুতিক সেলের

তৃতীয় অধ্যায়

রসায়ন (Chemistry)

লোহা (Iron)

1. প্রাকৃতিক অবস্থান :—

প্রকৃতিতে লৌহ প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়, তবে প্রায় যৌগরূপে। কেবল মাত্র উল্কাপিণ্ডে ধাতব মৌলিক লৌহ পাওয়া যায়। লৌহের প্রধান খনিজ আকরিক—

(ক) লৌহপাথর বা হিমাটাইট—ইহা লৌহের অক্সাইড। ভারতের নানাস্থানে ইহা পাওয়া যায়, প্রধানতঃ ইহা হইতেই লৌহ নিষ্কাশিত হয়।

(খ) ম্যাগ্‌নেটাইট—ইহা লৌহের মিশ্র অক্সাইড।

(গ) পাইরাইটিস্—ইহা লৌহের সালফাইড।

ইহা ছাড়া প্রাণিদেহের রক্তে লাল কণিকা মধ্যস্থ হিমোগ্লোবিনে ও উদ্ভিদের সবুজ ক্লোরোফিলেও লৌহঘটিত যৌগ আছে।

ধর্ম :—

লৌহে কোন অশুদ্ধি না থাকিলে ইহার রঙ উজ্জ্বল সাদা। ইহা চুম্বক দ্বারা আকৃষ্ট হয়, ইহা জলের অপেক্ষা প্রায় 7·85 গুণ ভারী। শুষ্ক বাতাসের লৌহের উপর কোন ক্রিয়া নাই। কিন্তু আর্দ্রবাতাসে লৌহের উপর বাদামী রঙের মরিচা উৎপন্ন হয়। মরিচার বিশ্লেষণে দেখা যায় উহা লৌহের সোদক অক্সাইড।

লোহিত তপ্ত লৌহের উপর দিয়া জলীয় বাষ্প পরিচালিত করিলে বা অক্সিজেন গ্যাসে লৌহকে লোহিত তপ্ত করিলে উহার অক্সাইড পাওয়া যায়।

লঘু HCl বা H_2SO_4 এর হাইড্রোজেন লৌহদ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়। ঘন নাইট্রিক এ্যাসিড, ক্রোমিক এ্যাসিড লৌহকে "নিষ্ক্রিয় লৌহে" পরিণত করে।

ব্যবহার :—

লৌহে সাধারণতঃ কিছু কার্বন ও অন্যান্য মৌল মিশ্রিত থাকে। লৌহে কার্বনের পরিমাণ যদি খুব কম থাকে (O 25%) তবে উহাকে **পেটা লোহা** বা রট আয়রণ (Wrought iron) বলে। ইহা তার, জাল, তড়িৎ-চুম্বক ইত্যাদি তৈয়ারী করিতে ব্যবহৃত হয়।

কার্বনের পরিমাণ মাঝামাঝি থাকিলে (1%) তাহাকে **ইস্পাত** (steel) বলে। সাধারণতঃ ইহার সহিত অন্য কোন মৌলও মিশ্রিত থাকে। ঘড়ি, যন্ত্রপাতি, যুদ্ধের অস্ত্রশস্ত্র, রেল ইঞ্জিন, মোটরগাড়ী, সেতু হইতে ছুঁচ, আলপিন পর্যন্ত প্রস্তুত করিতে ইস্পাত ব্যবহৃত হয়।

কার্বনের পরিমাণ সর্বাধিক (প্রায় 2-4%) থাকে কাষ্ট-আয়রণ বা ঢালাই লৌহের মধ্যে। ইহা সাধারণতঃ রট্‌-আয়রণ ও ইস্পাত প্রস্তুতিতে ব্যবহৃত হয়। ইহা ছাড়াও লোহার রেলিং, রান্নার জন্য ব্যবহার যোগ্য কড়া, জলের পাইপ ইত্যাদি প্রস্তুত করিতে ইহার ব্যবহার আছে।

তামা (Copper)

-2. প্রাকৃতিক অবস্থান :—

অধিকাংশ তামাই পৃথিবীতে যৌগাবস্থায় পাওয়া যায়। যদিও মৌলাবস্থায় তামা বিরল নয়। ইহার প্রধান আকরিক—

কপার পাইরাইটিস—ইহা লৌহ ও তামার সালফাইড।

ভারতে বিহারের মোসাবনীতে ইহার খনি আছে। ঘাটশীলার মৌ-ভাণ্ডার নামক স্থানে ঐ খনির আকর হইতে তামা প্রস্তুত করা হয়।

ধর্ম :—

তামার একটি নিজস্ব লালচে রং আছে, উহাকে "তামাটে লাল" বলা হয়। ইহা জল অপেক্ষা প্রায় $8\frac{1}{2}$ গুণ ভারী। অন্য অনেক ধাতুর তুলনায় ইহার তাপ ও বিদ্যুৎ পরিবহন করিবার ক্ষমতা অধিক।

শুষ্ক বাতাসে ইহা অপরিবর্তিত থাকে। আর্দ্র বাতাসে তামা দীর্ঘকাল থাকিলে ইহার উপর একটা সূক্ষ্ম আবরণ পড়ে। ইহা প্রধানতঃ অক্সাইডের।

লঘু HCl তামাকে আক্রমণ করিতে পারে না। কিন্তু ঘন HCl বাতাসের সাহায্যে ইহাকে দ্রবীভূত করিতে পারে।

ঘন অ্যামোনিয়াও বাতাসের উপস্থিতিতে তামাকে দ্রবীভূত করিয়া একটি গাঢ়নীল জটিল যৌগ উৎপন্ন করে।

ব্যবহার ঃ—

তড়িৎশিল্পে ইহার ব্যবহার সর্বাধিক। ইহা ছাড়া মুদ্রা প্রস্তুতির জন্য, বাসনপত্র নির্মাণে, সংকর ধাতু যেমন পিতল, কাঁসা, ব্রোঞ্জ প্রস্তুতিতেও ইহার ব্যবহার উল্লেখযোগ্য।

অ্যালুমিনিয়াম (Aluminium)

3. প্রাকৃতিক অবস্থান ঃ—

সমস্ত ধাতুর মধ্যে অ্যালুমিনিয়ামই পৃথিবীতে সর্বাধিক পরিমাণে আছে। মাটির মধ্যে সিলিকেট রূপে উহা প্রধানতঃ অবস্থান করে। উহা মৌলাবস্থায় পাওয়া যায় না। ইহার বিশেষ খনিজের মধ্যে কয়েকটি—

(ক) বক্সাইট—ইহার অক্সাইড। প্রধানতঃ ইহা হইতেই ধাতব অ্যালুমিনিয়াম নিষ্কাশিত হয়।

(খ) কেওলিন—ইহার সিলিকেট।

(গ) ক্রায়োলাইট—ইহার ক্লোরাইড।

ধর্ম ঃ—

ইহার বর্ণ নীলচে সাদা। ইহা অত্যন্ত হাল্‌কা। জলের চেয়ে মাত্র $2\frac{1}{2}$ গুণ ভারী। ইহার বিদ্যুৎ পরিবহনের ক্ষমতাও বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

শুষ্ক বাতাসে ইহার কোন পরিবর্তন হয় না, কিন্তু ভিজা বাতাসে ইহার উপর অক্সাইডের একটি স্তর পড়ে। ইহার অক্সিজেনের প্রতি আসক্তি বিশেষ প্রবল। উত্তপ্ত অবস্থায় ইহা অক্সিজেনের সহিত যুক্ত হয়, সেইজন্য ইহা অন্য ধাতুর অক্সাইড যেমন লৌহ, ক্রোমিয়াম হইতে অক্সিজেনকে বিচ্ছিন্ন করিয়া সেই ধাতুকে মুক্ত করে ও নিজের অক্সাইড প্রস্তুত করে।

লঘু HCl এর সহিত বিক্রিয়ায় ইহা H_2 উৎপন্ন করে কিন্তু লঘু HNO_3 বা H_2SO_4এর সহিত বিক্রিয়ায় করে না।

ঘন কষ্টিক সোডা বা কষ্টিক পটাস ইহাকে দ্রবীভূত করে। বস্তুতঃ সব ক্ষারই ইহাকে দ্রবীভূত করিতে পারে। নিষ্ক্রিয় গ্যাস নাইট্রোজেন ইহার সহিত উত্তপ্ত অবস্থায় যুক্ত হয়।

ব্যবহার :—

নানাক্ষেত্রে লৌহ ও তামার পরিবর্তে অ্যালুমিনিয়াম ব্যবহৃত হইতে পারে। ইহা হালকা ; তাপ ও তড়িতের সু-পরিবাহী। সেইজন্য ইহার ব্যবহারের ক্ষেত্রও ক্রমশঃই বিস্তৃত হইতেছে। ইহা এরোপ্লেন প্রস্তুতিতে, বিদ্যুৎশিল্পে 'তার' হিসাবে ; বাসনপত্র ও অন্যান্য গৃহস্থালীর জিনিসপত্র প্রস্তুতিতে, সেতু, মোটরগাড়ীর কাঠামো ইত্যাদি নির্মাণে ব্যবহৃত হয়। ইহা ছাড়া রং হিসাবে ও বাজীপ্রস্তুতিতে চূর্ণ-অ্যালুমিনিয়াম ব্যবহৃত হয়। থারমাইট জাতীয় বোমা প্রস্তুতিতে ও কয়েকটি বিস্ফোরকে ইহার ব্যবহার আছে।

দস্তা (Zinc)

4. প্রাকৃতিক অবস্থান :—

প্রকৃতিতে দস্তা মৌল অবস্থায় পাওয়া যায় না। দস্তার কয়েকটি প্রধান আকরিকের নাম—

(ক) জিঙ্ক ব্লেণ্ড—ইহা দস্তার সালফাইড, প্রধানতঃ ইহা হইতে দস্তা (জিঙ্ক) নিষ্কাশিত হয়।

(খ) ক্যালামাইন—ইহা কার্বনেট।

(গ) জিঙ্কাইট—ইহা অক্সাইড।

ধর্ম :—

দস্তার রং নীলাভ সাদা। বাতাসে রাখিলেই ইহার উপর অক্সাইডের আবরণ পড়ে। সেইজন্য ইহাকে সচরাচর অনুজ্জ্বল ধাতু বলিয়া মনে হয়।

ইহা জল অপেক্ষা প্রায় 7 গুণ ভারী।

লঘু অ্যাসিডের ক্রিয়ায় দস্তা হাইড্রোজেন উৎপন্ন করে। কষ্টিক সোডা বা পটাসের দ্রবণে ইহা দ্রবীভূত হইয়া যায়। অক্সিজেন ইহাকে অক্সাইডে এবং গন্ধক সালফাইড-এ পরিণত করে।

ব্যবহার :—

মুদ্রাপ্রস্তুতিতে ইহা ব্যবহৃত হয়। সংকর ধাতু প্রস্তুতির জন্য ইহাকে অন্যধাতুর সহিত মিশ্রিত করা হয়। ইহার সংকর ধাতুর মধ্যে পিতল (দস্তা ও তামার মিশ্রণ) উল্লেখযোগ্য।

নানা বৈদ্যুতিক ব্যাটারীতে ইহার বিপুল প্রয়োজন। মরিচা রোধ করার জন্য লোহার দ্রব্যের উপর সাধারণতঃ দস্তার একটি প্রলেপ দেওয়া হয়। ইহাকে **গ্যালভানিজেসন** বলে। বালতি, বাড়ী প্রভৃতির টিন, পেরেক, স্ক্রু, লোহার নল ইত্যাদি নানা বস্তুতে দস্তা লেপন করা হয়।

ইস্পাত (Steel)

5. **প্রাকৃতিক অবস্থান :—**

লোহের সহিত ·25%-1·5% কার্বন মিশাইয়া ইস্পাত প্রস্তুত করা হয়। কাজেই প্রকৃতিতে ইস্পাত মুক্তরূপে অবস্থান করে না। বিশুদ্ধ লোহের সহিত প্রয়োজন মত কার্বন ও অন্যান্য ধাতু মিশ্রিত করিয়া ইস্পাত প্রস্তুত করা হয়। বেসেমার বা সিমেন্স-মার্টিন ওপেন হার্থ পদ্ধতিতে কাষ্ট আয়রণকে ইস্পাতে পরিণত করা হয়।

ধর্ম :—

সাধারণতঃ ইস্পাতের সহিত ম্যাঙ্গানিজ, নিকেল, ভ্যানাডিয়াম, টাংষ্টেন, ক্রোমিয়াম, মলিবডেনাম ও কোবাল্ট প্রভৃতি ধাতু মিশ্রিত থাকে। ইহাকে **ইস্পাত সংকর** বা **এ্যালয় ষ্টীল** (Alloy steel) বলে।

ইস্পাতের ধর্ম, তাহার মধ্যে কার্বনের পরিমাণ, অন্য ধাতুর পরিমাণ ও তাহার "পান" temper এর উপর নির্ভরশীল। সাধারণতঃ কার্বন যত বেশী থাকে ইস্পাত তত কঠিন হয়।

ক্রোমিয়াম মিশ্রিত ইস্পাতে মরিচা পড়ে না। ইহাকে **stainless steel** বলে।

ইস্পাতকে লোহিত তপ্ত করিয়া হঠাৎ ঠাণ্ডা জলে ফেলিলে উহা অত্যন্ত কঠোর ও ভঙ্গুর হইয়া যায়। এখন এই কঠোর ও ভঙ্গুর ইস্পাতকে কোন নির্দিষ্ট উষ্ণতায় উত্তপ্ত করিয়া ধীরে ধীরে শীতল করিলে উহার কঠোরতা ও ভঙ্গুরতা লোপ পায়। উহা আবার নমনীয় হইয়া যায়। সমস্ত পদ্ধতিটিকে অর্থাৎ প্রথমে কঠোর করিয়া পরে নমনীয় করাকে **ইস্পাতের পান দেওয়া** বা **Tempering** বলে।

ইস্পাতকে বিভিন্ন কাজে ব্যবহারের জন্য বিভিন্ন উষ্ণতায় উত্তপ্ত করিয়া পান দেওয়া হয়।

ব্যবহার :

শিল্প ও ব্যবহারিক জীবনে ইস্পাতের বহুল ব্যবহার। কার্বনের পরিমাণ,

অন্ত ধাতুর উপস্থিতি ও পরিমাণ এবং পান দেওয়ার উষ্ণতার উপর ইস্পাতের ধর্ম ও ব্যবহার নির্ভর করে। ক্রোমিয়াম মিশ্রিত ইস্পাত মরিচারোধক দ্রব্যাদি প্রস্তুতিতে ব্যবহৃত হয়। নিকেল ইস্পাত তার, সেতু, পাম্প, ঘড়ি, ওজন যন্ত্র প্রভৃতিতে ব্যবহৃত হয়। টাংষ্টেন মিশ্রিত ইস্পাত দ্রুতগতিশীল যন্ত্রের অংশে ব্যবহার হয়।

ভ্যানাডিয়াম ইস্পাত রেলগাড়ীর চাকা ও গিয়ার প্রস্তুতিতে ব্যবহৃত হয়। ম্যাঙ্গানিজ ইস্পাত অধিকতর শক্ত ও ঘাত সহনশীল, রেললাইন, সুইচ, ইত্যাদি নির্মাণে ইহা ব্যবহৃত হয়।

বস্তুতঃ বর্তমান সভ্যতায় ইস্পাতের ব্যবহারের ক্ষেত্র বহুদূর বিস্তৃত ও এই সভ্যতাকে **ইস্পাত-সভ্যতা** বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

পিতল (Brass)

•6. প্রাকৃতিক অবস্থান :—

ইহারও প্রাকৃতিক অবস্থানের প্রশ্নই উঠে না। ইহা সংকর ধাতু, গলিত তামার সহিত দস্তার মিশ্রণে ইহা প্রস্তুত হয়।

ধর্ম :—

তামা ও দস্তার অনুপাতের উপর পিতলের ধর্ম নির্ভর করে।

সাধারণ পিতল মোটামুটি শক্ত, সুন্দর পীতবর্ণের পদার্থ। যান্ত্রিক উপায়ে ইহাকে যে কোন আকার দেওয়া যাইতে পারে। পিতলে দস্তার পরিমাণ 5-50% হইতে পারে। দস্তার পরিমাণ যত বাড়ে রংও তত হলদে হইতে থাকে।

35% পর্যন্ত দস্তা থাকিলে তাহাকে (α-Brass) **আল্ফা পিতল** বলে। দস্তার পরিমাণের সঙ্গে ইহার প্রসার্যতা (Ductility) বাড়িতে থাকে। সমস্ত পিতলের মধ্যে ইহার ব্যবহার সর্বাধিক।

45-50% পর্যন্ত দস্তা থাকিলে তাহাকে (β-Brass) **বিটা-পিতল** বলে। সাধারণ উষ্ণতায় ইহা খুব ভঙ্গুর হইলেও (600 C এর উপর) অধিক উষ্ণতায় ইহাকে যান্ত্রিক উপায়ে নানা আকার দেওয়া সম্ভব। কিন্তু সাধারণ উষ্ণতায় ইহা ভঙ্গুর বলিয়া শিল্পকার্যে ইহার ব্যবহার খুব কম। আল্ফা ও বিটা-পিতলের মধ্যবর্তী পিতল (দস্তার পরিমাণ 35-45%) এই দুই প্রকার পিতলের গুণসম্পন্ন। সেইজন্য ইহা প্রধানতঃ উচ্চ উষ্ণতায় (600°C এর নীচে) কার্যের জন্য ব্যবহৃত হয়।

পিতলের ক্ষয় ঃ—

দেখা গিয়াছে অনেক পিতলকে লবণাক্ত জলের বা আর্দ্র আবহাওয়ার সংস্পর্শে রাখিলে উহা ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। কিন্তু যদি পিতলে দস্তার পরিমাণ 15% এর কম থাকে তবে উহা ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না।

অন্য কোন তৃতীয় ধাতুর উপস্থিতি পিতলের ধর্মকে অনেকাংশে প্রভাবান্বিত করে। সেইজন্য ঘসা পিতলে অল্প পরিমাণ সীসা, অ্যালুমিনিয়াম, ম্যাঙ্গানিজ, টিন ও নিকেল পিতলের সহিত মিশান হয়।

ব্যবহার ঃ—

নানা প্রকারের বাসনপত্র প্রস্তুতিতে, ঢালাইদ্রব্য নির্মাণে, জলের কলের মুখ প্রস্তুতিতে, নানা মূর্তি ও খেলনা প্রস্তুতিতে পিতল ব্যবহৃত হয়। পিতলের ধর্মের উপর ইহার ব্যবহার নির্ভর করে।

কাঁসা (Bell-Metal)

7. প্রাকৃতিক অবস্থান ঃ—

ইহারও পৃথক অবস্থিতি নাই। মানুষ ইহাকে সংশ্লেষিত করিয়াছে।

ইহা তামা ও টিনের সংকর ধাতু। সাধারণতঃ তামার পরিমাণ শতকরা 80 ভাগ ও টিনের পরিমাণ শতকরা 20 ভাগ।

ধর্ম ও ব্যবহার ঃ—

তামা ও টিনের পরিমাণ পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ইহার ধর্মের পরিবর্তন হয়। অন্য কোন ধাতু বা অধাতুর উপস্থিতিও ইহার ধর্মের পরিবর্তন ঘটায় এবং সঙ্গে সঙ্গে ইহার ব্যবহারের ক্ষেত্রেও পরিবর্তিত হয়।

90% তামা ও 10% টিন এর সংকর ধাতু হইল সাধারণ ব্রোঞ্জ (Bronze)। ইহা বাসনপত্র তৈয়ারী করিতে ব্যবহৃত হয়।

খুব অল্পপরিমাণ 1% ফসফরাস যুক্ত ব্রোঞ্জকে **ফসফর ব্রোঞ্জ** (Phosphor Bronze) বলে। ইহাতে 85% তামা, 10% টিন, 4% সীসা, ও ফসফরাস 1% থাকে। ইহা সাধারণ ব্রোঞ্জ অপেক্ষা বেশী শক্ত ও ক্ষয় নিবারক। ইহা এরিয়ালের তার, ভাল্‌ভ, বিয়ারিং ইত্যাদি প্রস্তুতিতে ব্যবহৃত হয়।

8-10% টিন, 2-5% জিঙ্ক (দস্তা); অল্প পরিমাণ সীসা যুক্ত ব্রোঞ্জের প্রধান গুণ যে ইহা সহজে ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না। সেইজন্য ইহা জলের নল, পাম্পের ভাল্‌ভ (valve) ও পিষ্টনে ব্যবহৃত হয়।

সাধারণ কাঁসা বা বেল-মেটাল, বাসনপত্র, মূর্তি ও ঘণ্টা নির্মাণে ব্যবহৃত হয়। ঘণ্টা নির্মাণে এই সংকর ধাতুর উপযোগিতার ফলেই ইহার নাম হইয়াছে **Bell Metal.**

1% দস্তা, 5% টিন ও 94% তামার সংকর ধাতু প্রধানতঃ মুদ্রা প্রস্তুতিতে ব্যবহৃত হয়।

প্রশ্নাবলী

1. নিম্নলিখিত ধাতুগুলির প্রাকৃতিক অবস্থান, ধর্ম ও ব্যবহার উল্লেখ কর :— (ক) লোহা, (খ) তামা, (গ) অ্যালুমিনিয়াম ও (ঘ) দস্তা।

2. পিতল, কাঁসা ও ইস্পাতের সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা কর।

3. কোন্‌গুলি ধাতু ও কোন্‌গুলি সংকর ধাতু (alloy) তাহা দেখাও :—
(ক) ইস্পাত, (খ) তামা, (গ) অ্যালুমিনিয়াম, (ঘ) পিতল, (ঙ) দস্তা ও (চ) কাঁসা।

4. নিম্নলিখিত আকরিকগুলি কোন্ কোন্ ধাতুর তাহা উল্লেখ কর :—
(ক) হিমাটাইট, (খ) কেওলিন, (গ) পাইরাইটিস, (ঘ) ম্যাগ্‌নেটাইট, (ঙ) বক্সাইট, (চ) ক্রায়োলাইট।

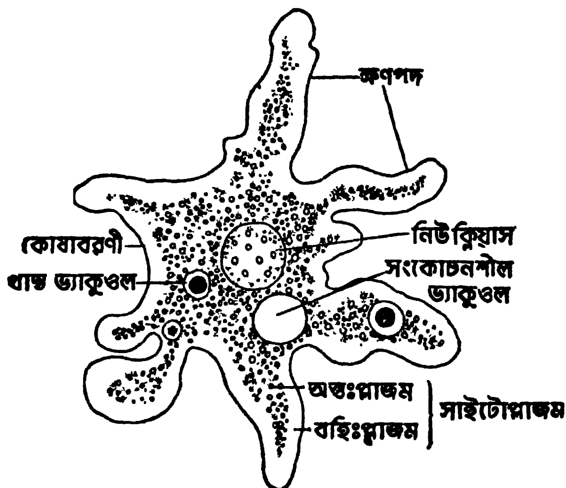
জীববিদ্যা (Biology)

চতুর্থ অধ্যায়

অ্যামিবা, স্পাইরোগাইরা, ইষ্ট ও ফার্ণ

1. **অ্যামিবা (Amœba)** :—প্রাণিজগৎকে পর্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে কতকগুলি প্রাণী অতীব ক্ষুদ্র ও এককোষী আবার কতকগুলি বহুকোষী। এককোষী প্রাণিগণ তাহাদের একটি কোষের দ্বারাই জীবনের যাবতীয় কার্য সম্পাদন করে। অ্যামিবা এইরূপ একটি এককোষী প্রাণী। ইহারা জীবজগতের প্রথম পর্ব, **প্রোটোজোয়া** বা **আদ্যপ্রাণীর** (protozoa) অন্তর্গত **সারকোডিনা** (sarcodina) শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। বিভিন্ন প্রকার অ্যামিবা বিভিন্ন পরিবেশে বাস করে। ইহাদের কেহ কেহ স্বাধীন ভাবে স্থলে ও জলে বাস করে। আবার কেহ কেহ অন্য প্রাণি-দেহের ভিতরে পরভোজী (parasites) রূপে পরাধীন জীবন যাপন করে।

আমাদের দেশে পুষ্করিণী, নালা ইত্যাদিতে জলজ উদ্ভিদের গায়ে বা কর্দমের মধ্যে অ্যামিবা প্রচুর পরিমাণে দেখা যায়। ইহারা আকারে অত্যন্ত ক্ষুদ্র। প্রায় এক ইঞ্চির শতাংশের একাংশ। সেইজন্য ইহাদিগকে অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে দেখিতে হয়। আকারে বড় অ্যামিবাগুলি খালি চোখে ছোট সাদা বিন্দুর ন্যায় দেখায়। ইহারা সর্বদা নড়াচড়া করে এবং সেইজন্য ইহাদের কোন নির্দিষ্ট আকার নাই। অনবরত ইহারা আকার পরিবর্তন করে বলিয়া ইহাদের নাম **অ্যামিবা প্রোটিয়াস** (Amoeba proteus)। গ্রীসদেশের পৌরাণিক কাহিনীতে প্রোটিয়াস (Proteus) নামে এক দেবতার উল্লেখ আছে যিনি সর্বদা নিজের ইচ্ছামত রূপের পরিবর্তন করিতে পারিতেন। তদনুযায়ী এই নামকরণ হইয়াছে।

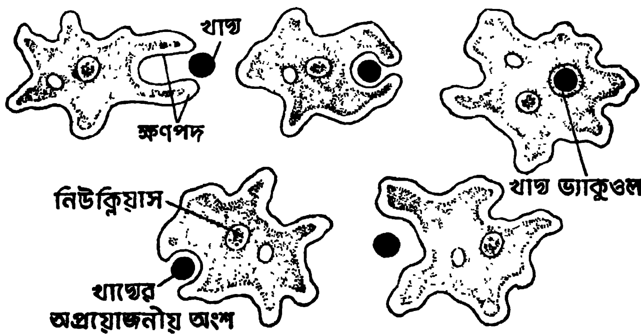


চিত্র 1
অ্যামিবা

অ্যামিবার দেহ একটিমাত্র কোষ লইয়া গঠিত (চিত্র 1)। কোষের মধ্যে এক প্রকার অর্ধতরল পদার্থ আছে। উহাকে **জীবপঙ্ক** বা **প্রোটোপ্লাজম** (protoplasm) বলে। কোষমধ্যস্থ প্রোটোপ্লাজম উদ্ভিদ কোষের ন্যায় একটি নির্দিষ্ট প্রাচীর দ্বারা আচ্ছাদিত নহে। প্রোটোপ্লাজমের বাহিরের দিক কিছু পরিমাণে শক্ত হইয়া একটি সূক্ষ্ম **কোষাবরণী** (Plasmalemma) সৃষ্টি করে। কোষের মধ্যে একটি **নিউক্লিয়াস** (nucleus) থাকে। ইহা প্রোটোপ্লাজমেরই ঘনতর অংশবিশেষ এবং উপরে ও নীচে সামান্য অবতল। নিউক্লিয়াসটি অ্যামিবার দেহকোষের যাবতীয় কার্য নিয়ন্ত্রণ করে। নিউক্লিয়াস ব্যতীত প্রোটোপ্লাজমের অবশিষ্ট অংশকে **সাইটোপ্লাজম**

(cytoplasm) বলে। সাইটোপ্লাজমের অপেক্ষাকৃত স্বচ্ছ ও কঠিন বাহিরের দিকের সংকীর্ণ অংশকে **বহিঃপ্লাজম** (ectoplasm) ও তরল দানাদার ভিতরের দিকের অংশকে **অন্তঃপ্লাজম** (endoplasm) বলা হয়। অন্তঃপ্লাজমের মধ্যে ছোটবড় বুদ্বুদের ন্যায় কতকগুলি **ভ্যাকুওল** (vacuole) দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের মধ্যে কতকগুলিকে **খাদ্য ভ্যাকুওল** (food vacuole) এবং অপেক্ষাকৃত বড় ও স্বচ্ছ ভ্যাকুওলটিকে **সংকোচনশীল ভ্যাকুওল** (contractile vacuole) বলা হয়। অ্যামিবার দেহের বিভিন্ন দিকে কতকগুলি ছোট ছোট অঙ্গুলির ন্যায় প্রোটোপ্লাজমের প্রসারিত অংশ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদিগকে **ক্ষণপদ** (pseudopodium) বলে।

অ্যামিবা ক্ষণপদগুলির সাহায্যে একস্থান হইতে অন্যস্থানে চলাফেরা করে। কোন নির্দিষ্ট দিকে চলিতে হইলে সেইদিকে কোষমধ্যস্থ প্রোটোপ্লাজম ধীরে ধীরে প্রবাহিত হইয়া কতকগুলি নূতন ক্ষণপদ সৃষ্টি করে এবং বিপরীত দিকে ক্ষণপদগুলি দেহেরমধ্যে লুপ্ত হয়। একস্থান হইতে অনেকগুলি ক্ষণপদ সৃষ্টি হইতে পারে। কিন্তু ইহাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বৃহত্তম ক্ষণপদটিই কার্যকরী হয়, অন্যগুলি ক্রমশঃ



চিত্র 2
অ্যামিবার খাদ্যগ্রহণ প্রণালী

ছোট হইয়া দেহের প্রোটোপ্লাজমের সহিত মিশিয়া যায়। পুরাতন ক্ষণপদের গোড়া হইতে নূতন ক্ষণপদ সৃষ্টি হইলে পুরাতন ক্ষণপদ দেহকোষে লুপ্ত হয়। প্রয়োজন হইলে বিপরীত দিকে নূতন ক্ষণপদ তৈয়ারী করিয়া অ্যামিবা গতিপথের পরিবর্তন ঘটায়। বৃহত্তম ক্ষণপদের অগ্রভাগে একপ্রকার আঠালো রস নিঃসৃত হয়। তাহার ফলে এই ক্ষণপদ কোন বস্তুর সংস্পর্শে আসিলে উহাতে আটকাইয়া

যায়। ইহার পরে অ্যামিবা উহার সমস্ত দেহকে সেইদিকে টানিয়া আগাইয়া আনে।

অ্যামিবা ছোট ছোট শৈবাল, জলজ উদ্ভিদের অংশ বা অন্য কোন এককোষী প্রাণীকে খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করে। সম্মুখে খাদ্য আছে অনুভব করতে পারিলে সেইদিকে ইহারা দুইটি ক্ষণপদ সৃষ্টি করে (চিত্র 2)। ক্রমে এক বিন্দু জল সমেত খাদ্যকে দুইটি ক্ষণপদের সাহায্যে সম্পূর্ণরূপে ঘিরিয়া নিজ শরীরের মধ্যে গ্রহণ করে। দেহকোষের মধ্যে খাদ্য ও জলসমেত এই গোলাকার অংশগুলিকে **খাদ্য ভ্যাকুওল** বলে। এই খাদ্য ভ্যাকুওলের মধ্যে জারক রসের সাহায্যে অ্যামিবা খাদ্য বস্তুকে পরিপাক করে এবং পরিপাকান্তে প্রয়োজনীয় অংশ সাইটোপ্লাজমে শোষণ করিয়া লয়। ইহার পর খাদ্যের অপ্রয়োজনীয় অবশিষ্ট অংশ সমেত খাদ্য ভ্যাকুওলটি, স্থান ত্যাগ করিবার সময় দেহের যে কোন স্থান ভেদ করিয়া অপসারিত হয়।

অ্যামিবার দেহকোষের অন্তঃপ্লাজমে অপেক্ষাকৃত বড়, স্বচ্ছ ও গোলাকার ভ্যাকুওলটিকে **সংকোচনশীল ভ্যাকুওল** (contractile vacuole) বলে (চিত্র 1)। ইহার মধ্যে জল থাকে। ইহা প্রথমে আকারে খুব ছোট থাকে, পরে ক্রমশঃ বড় হইতে হইতে ফাটিয়া যায়। ঐস্থানে তৎক্ষণাৎ অপর একটি সংকোচনশীল ভ্যাকুওল তৈয়ারী হয়। সেইজন্য মনে হয় যে সংকোচনশীল ভ্যাকুওলটি ক্রমান্বয়ে

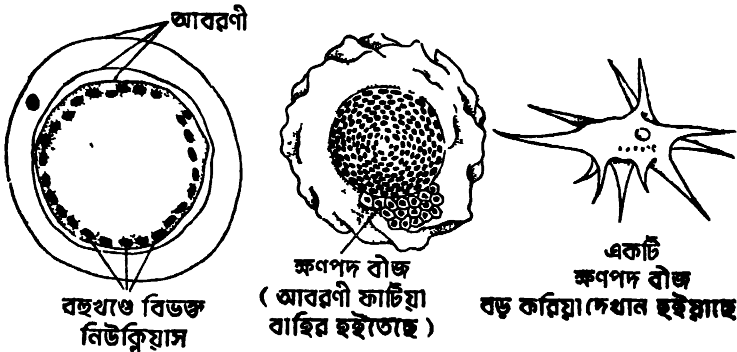


চিত্র 3
অ্যামিবার যুগ্ম বিভাজন

সংকুচিত ও প্রসারিত হইতেছে। অ্যামিবা জলে বাস করে সেইজন্য চারিপার্শ্বস্থ কিছু পরিমাণ জল ইহার কোষাবরণীর মধ্য দিয়া **অভিস্রবণ** (osmosis) প্রক্রিয়ায় কোষস্থ প্রোটোপ্লাজমের মধ্যে প্রবেশ করে। সংকোচনশীল ভ্যাকুওলটি

মাঝে মাঝে ফাটিয়া গিয়া কিছু পরিমাণ অতিরিক্ত জল নিষ্কাশিত করিয়া প্রোটোপ্লাজমের জলের সমতা রক্ষা করে। দেহ বিপাকের (metabolism) ফলে অপ্রয়োজনীয় এবং ক্ষতিকারক জলীয় বর্জ্য পদার্থগুলি সংকোচনশীল ভ্যাকুওল মধ্যস্থ জলের সহিত বাহিরে পরিত্যক্ত হয়। অ্যামিবার কোন শ্বাসযন্ত্র নাই। ইহারা সমস্ত দেহ দিয়া জলমধ্যস্থ দ্রবীভূত অক্সিজেন গ্যাস গ্রহণ করে ও জলেই অঙ্গারায় গ্যাস পরিত্যাগ করে। কিছু পরিমাণ অঙ্গারায় গ্যাস সংকোচনশীল ভ্যাকুওল মধ্যস্থ জলে দ্রবীভূত অবস্থায় থাকিয়া বাহিরে নিক্ষিপ্ত হয়।

অ্যামিবা দ্রুত বংশবৃদ্ধি করিতে পারে। স্বচ্ছল অবস্থায় অর্থাৎ খাদ্যের অভাব না ঘটিলে ইহারা **যুগ্ম বিভাজনের** (bianary fission) দ্বারা সংখ্যায় বৃদ্ধি লাভ করে (চিত্র 3)। এই প্রক্রিয়ায় অ্যামিবার কোষমধ্যস্থ নিউক্লিয়াসটির মধ্যস্থল সঙ্কীর্ণ হইয়া একটি ডমরুর আকার ধারণ করে। ইতিমধ্যে দেহকোষের মধ্যভাগও অনুরূপ ভাবে সংকুচিত হয়। পরে নিউক্লিয়াসটি দুইভাগে বিভক্ত হইয়া কোষের দুইদিকে চলিয়া যায় এবং কোষটির মধ্যস্থল সম্পূর্ণভাবে সংকুচিত হইয়া বিচ্ছিন্ন হয়। ইহার ফলে একটি অ্যামিবা হইতে দুইটি অপত্য অ্যামিবার সৃষ্টি হয়।

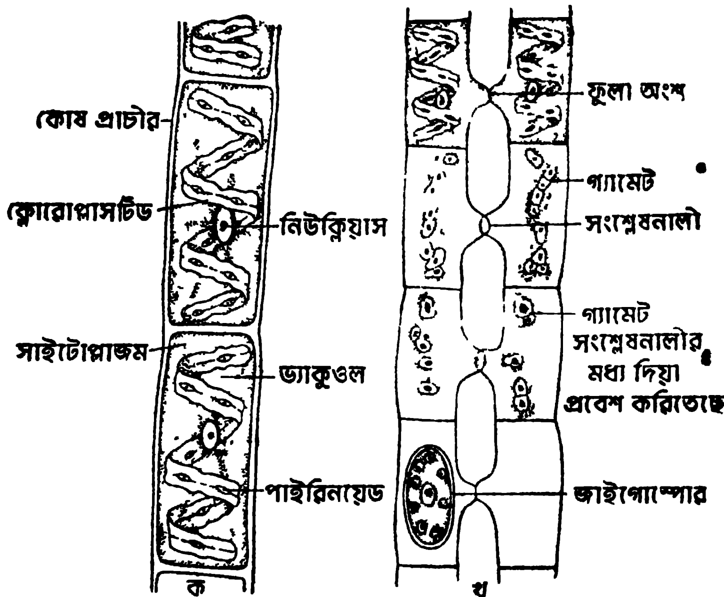


চিত্র 4
অ্যামিবার বহুবিভাজন

অস্বচ্ছল অবস্থায় অর্থাৎ খাদ্যের অভাব ঘটিলে ইহা **বহু বিভাজন** (multiple fission) প্রক্রিয়ায় বংশ বৃদ্ধি করে এবং জীবনের দুর্দিনগুলি কাটাইয়া উঠে (চিত্র 4)। এই প্রক্রিয়ায় প্রথমে অ্যামিবা সমস্ত ক্ষণপদ দেহমধ্যে বিলুপ্ত করিয়া গোলাকার ধারণ করে। পরে দেহনিঃসৃত রসের দ্বারা তিনটি আবরণী গঠন করিয়া দেহকে ঘিরিয়া ফেলে। এই অবস্থায় নিউক্লিয়াসটি অনেকগুলি নিউক্লিয়াসে

ভাঙিয়া যায়। প্রতিটি নিউক্লিয়াস-খণ্ড কিছু পরিমাণ সাইটোপ্লাজম দ্বারা আবরিত হইয়া এক একটি ক্ষণপদ বীজ (pseudopodiospore) নির্মাণ করে। প্রাকৃতিক অবস্থা অনুকূল হইলে আবরণী ফাটিয়া ক্ষণপদ-বীজগুলি বাহিরে আসে ও অসংখ্য পূর্ণাঙ্গ অ্যামিবায় রূপান্তরিত হয়।

2. **স্পাইরোগাইরা (Spirogyra)** :—স্পাইরোগাইরা এক প্রকার শৈবাল (Algæ)। খালি চোখে ইহাদের সবুজ বর্ণের সরু সূতার ন্যায় দেখায়। পুষ্করিণী ডোবা প্রভৃতি স্থির জল বিশিষ্ট জলাশয়ে ইহাদিগকে একত্র জট পাকাইয়া ভাসিতে দেখা যায়।



চিত্র 5

ক—স্পাইরোগাইরার দুটি কোষ,
খ—স্পাইরোগাইরার [illegible] (দুটি কোষ লম্বালম্বি পাশাপাশি মিলিত হইয়াছে)

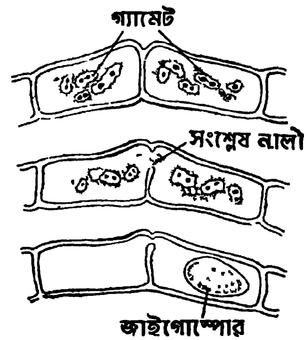
অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে পরীক্ষা করিলে দেখা যায় ইহাদের সূতার ন্যায় দেহ প্রকৃতপক্ষে কতকগুলি নলাকার (cylindrical) লম্বা কোষ পরপর সংযুক্ত হইয়া গঠিত হইয়াছে (চিত্র 5)। ইহাদের দেহ শাখা প্রশাখা বিহীন এবং পিচ্ছিল। দেহকোষ সেলুলোজ ও পেকটোজ নির্মিত একটি প্রাচীর দ্বারা আবরিত। কোষ মধ্যে দানাযুক্ত **সাইটোপ্লাজম** (cytoplasm), একটি স্পষ্ট **নিউক্লিয়াস** (nucleus)

এবং কতকগুলি **ভ্যাকুওল** (vacuole) আছে। ইহা ব্যতীত সাইটোপ্লাজমে একটি সবুজ বর্ণের ফিতার ন্যায় **ক্লোরোপ্লাস্টিড** (chloroplastid) স্প্রিং এর মত জড়ানো অবস্থায় আছে। ক্লোরোপ্লাস্টিড ফিতার মধ্যে **পাইরিনয়েড** (pyrenoid) নামক কতকগুলি উজ্জ্বল দানা দেখিতে পাওয়া যায়।

স্পাইরোগাইরার দেহ, কোষ বিভাজনের দ্বারা বৃদ্ধি লাভ করে। দ্রুত বংশবৃদ্ধি কালে ইহাদের দেহসূত্র অনেকগুলি ছোট ছোট অংশে বিভক্ত হয় এবং প্রতিটি অংশ কোষ বিভাজনের দ্বারা বৃদ্ধি লাভ করিয়া এক একটি পূর্ণাঙ্গ স্পাইরোগাইরায় পরিণত হয়। এইরূপ বংশবৃদ্ধি করাকে **অঙ্গজ জনন** (vegetative reproduction) বলা হয়।

কখনও কখনও স্পাইরোগাইরা **যৌন প্রক্রিয়ায়** (sexual reproduction) বংশবৃদ্ধি করিয়া থাকে। এই প্রক্রিয়ায় দুইটি স্পাইরোগাইরা সূত্র পাশাপাশি সংলগ্ন হয় (চিত্র 5খ)। পরে ইহারা বিকর্ষিত হইয়া কিছুটা পাশে সরিয়া যায়। সরিয়া যাওয়ার ফলে প্রত্যেকটির দেহকোষ হইতে কিছু অংশ ফুলিয়া বাহির হইয়া আসে। এই ফুলা অংশগুলিকে **সংশ্লেষ নালী** (conjugation tube) বলে। সুতরাং পাশাপাশি অবস্থিত একটি স্পাইরোগাইরার প্রতিটি কোষ হইতে বহির্গত সংশ্লেষ নালী, পার্শ্বস্থ অপর স্পাইরোগাইরার প্রতিটি কোষের সংশ্লেষ নালীর প্রান্তে সংলগ্ন হয়। পরে দুইটি সংশ্লেষ নালার মধ্যবর্তী প্রাচীর বিনষ্ট হওয়ায় একটি সাধারণ নালী গঠিত হয়। এই নালী দুইটি ভিন্ন ভিন্ন স্পাইরোগাইরার দেহকোষকে সংযুক্ত করে।

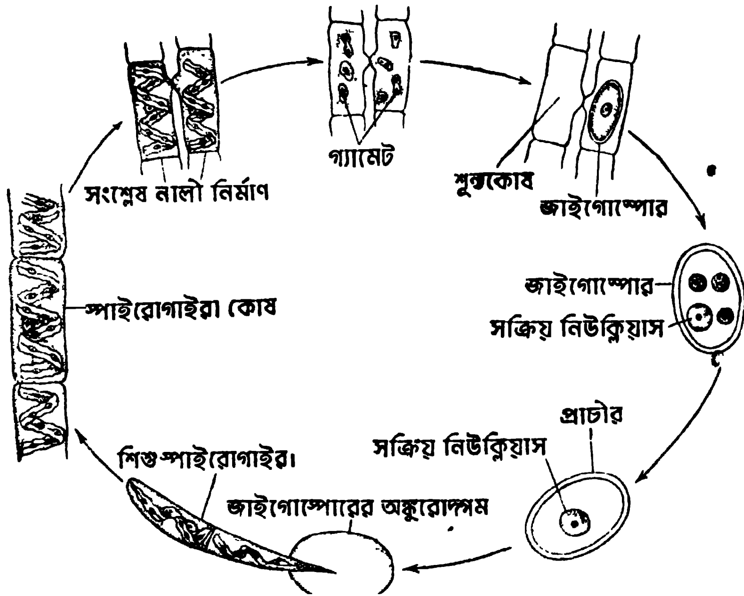
ইতিমধ্যে প্রত্যেক কোষ মধ্যস্থ প্রোটোপ্লাজম সংকুচিত হইয়া এক একটি **গ্যামেটে** (gamete) পরিবর্তিত হয়। গ্যামেটগুলি একই প্রকারের দেখিতে হয়। ইহার পর একটি স্পাইরোগাইরার সমস্ত কোষগুলি খালি করিয়া গ্যামেটগুলি সংশ্লেষ নালীর মধ্য দিয়া পার্শ্বস্থিত স্পাইরোগাইরার কোষগুলির মধ্যে প্রবেশ করে (চিত্র 5খ) ও তথাকার গ্যামেটগুলির সহিত মিলিত হয়। একই প্রকার গ্যামেটদের মিলনের এই প্রক্রিয়াকে **সংশ্লেষ** (conjugation) বলে। দুইটি ভিন্ন ভিন্ন স্পাইরোগাইরা হইতে আগত গ্যামেট দুইটি মিলিত হইয়া **জাইগোট** (zygote) নির্মাণ করে। পরে এই জাইগোট একটি কঠিন প্রাচীর দ্বারা আবরিত



চিত্র 6
স্পাইরোগাইরা শৈবালসূত্রে, পাশাপাশি দুইটি কোষের মধ্যে সংশ্লেষ

হইয়া **জাইগোস্পোরে** (zygospore) রূপান্তরিত হয়। কখনও কখনও এইরূপ মিলন একই স্পাইরোগাইরার পাশাপাশি দুইটি কোষের মধ্যে ঘটিতে দেখা যায় (চিত্র 6)। ফলে যে কোষে জাইগোস্পোর গঠিত হয় তাহার পরের কোষটি শূন্য থাকিয়া যায়।

কঠিন প্রাচীর দ্বারা আবরিত জাইগোস্পোর, দেহকোষ ফাটিয়া বাহির হইয়া জলের তলায় চলিয়া যায়। তথায় কিছুদিন বিশ্রাম করিবার পর উহা অঙ্কুরিত হয়। স্পোর প্রাচীর ভেদ করিয়া নূতন স্পাইরোগাইরা বাহির হইয়া আসে ও কোষ বিভাজনের ফলে ক্রমশঃ বৃদ্ধি লাভ করে (চিত্র 7)। অঙ্কুরিত হইবার



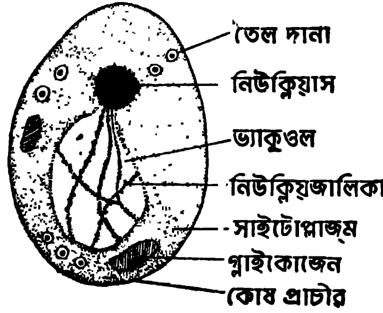
স্পাইরোগাইরার জীবন-চক্র

পূর্বে জাইগোস্পোরের নিউক্লিয়াসটি বিভক্ত হইয়া চারিটি নিউক্লিয়াস গঠন করে। ইহাদের মধ্যে একটি মাত্র নিউক্লিয়াস সক্রিয় থাকে ও বাকী তিনটি বিনষ্ট হয়।

কখনও কখনও সংশ্লেষ না হইলে কোষ মধ্যস্থ গ্যামেট, জাইগোস্পোরের ন্যায় কাজ করে। এই গ্যামেট একটি কঠিন প্রাচীর দ্বারা আবরিত হয়। কিছুকাল বিশ্রাম করার পর অঙ্কুরিত হইয়া ইহা নূতন স্পাইরোগাইরা সৃষ্টি করে। এই প্রক্রিয়াকে **পার্থেনোজেনেসিস** (parthenogenesis) বলে।

3. **ইষ্ট (Yeast) :** ইষ্ট একটি ছত্রাক (Fungus) জাতীয় উদ্ভিদ। খেজুরের রস, তালের রস, চিনির জল, আঙ্গুরের রস প্রভৃতি দ্রব্যে প্রচুর পরিমাণে ইষ্ট ছত্রাক জন্মে। ইষ্ট ছত্রাক শর্করা জাতীয় পদার্থকে কোহল্ (alcohol) এ পরিবর্তিত করিতে পারে। সেইজন্য মদ্য প্রস্তুত করিতে ইষ্ট প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। ইহা ব্যতীত বেকিং পাউডার (baking powder) হিসাবে ইহা পাউরুটি, কেক ইত্যাদি তৈয়ারীর কাজেও ব্যবহৃত হইয়া থাকে। প্রচুর পরিমাণে খাদ্যপ্রাণ বি-কমপ্লেক্স আছে বলিয়া ইষ্ট, খাদ্য এবং ঔষধ হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

ইষ্ট এক প্রকার এককোষী উদ্ভিদ্। ইহার প্রতিটি কোষ, দেখিতে ডিম্বাকার ও কাইটিন (chitin) নির্মিত কোষপ্রাচীর বিশিষ্ট। কোষের মধ্যে **সাইটোপ্লাজম,**



চিত্র 8
একটি পূর্ণাঙ্গ ইষ্টকোষ

একটি **নিউক্লিয়াস** ও কয়েকটি **ভ্যাকুওল** আছে (চিত্র 8)। ইহাদের নিউক্লিয়াসের মধ্যেও একটি বড় ভ্যাকুওল আছে। এই ভ্যাকুওলের মধ্যে **নিউক্লিয় জালিকা** থাকে। সাইটোপ্লাজমে খাদ্যবস্তুরূপে গ্লাইকোজেন, তৈল ও প্রোটিনের দানা বর্তমান থাকে।

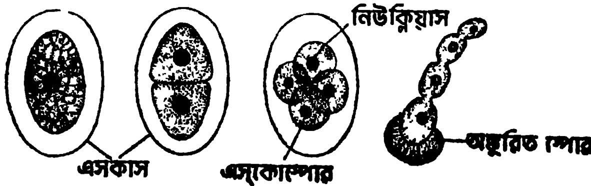


চিত্র 9
ইষ্টের অঙ্গজ জনন প্রক্রিয়া

সাধারণ অবস্থায় ইষ্ট যখন চিনির দ্রবণের মধ্যে থাকে তখন ইহারা **অঙ্গজ জনন** (vegetative reproduction) প্রক্রিয়ায় বংশ বৃদ্ধি করে। এই প্রক্রিয়ায়

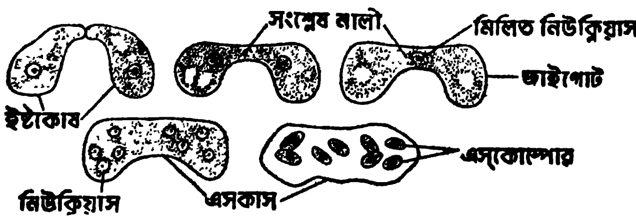
প্রত্যেকটি কোষ হইতে এক বা একাধিক ছোট **মুকুল** (bud) বাহির হইয়া (চিত্র 9) ক্রমশঃ বড় হইতে থাকে। ইতিমধ্যে কোষ মধ্যস্থ নিউক্লিয়াসটি বিভক্ত হয় এবং ইহার একাংশ মুকুলের মধ্যে প্রবেশ করে। পরে নিউক্লিয়াস সমেত মুকুলটি মাতৃ ইষ্ট কোষ হইতে বিচ্ছিন্ন হয়। কখনও কখনও বিচ্ছিন্ন না হইয়া পরিণত মুকুলটি আবার একটি মুকুল নির্মাণ করে। এইভাবে বিভক্ত হওয়ার ফলে অনেকগুলি ইষ্ট-কোষকে মালার ন্যায় একত্রে লাগিয়া থাকিতে দেখা যায়। পরে এই কোষগুলি বিচ্ছিন্ন হয় এবং এক একটি কোষ পরিণত হইয়া এক একটি পূর্ণাঙ্গ ইষ্ট-কোষ গঠন করে।

খাদ্যদ্রব্যের অভাব হইলে ইষ্ট **অযৌন** (asexual) প্রক্রিয়ায় বংশ বৃদ্ধি করে (চিত্র 10)। এই প্রক্রিয়ায় ইষ্ট-কোষ ক্রমশঃ বৃদ্ধি লাভ করিয়া **এসকাসে**



চিত্র 10
ইষ্টের অযৌন জনন প্রক্রিয়া

(ascus) পরিণত হয়। এসকাস-এর নিউক্লিয়াস চারিখণ্ডে বিভক্ত হয়। প্রতি খণ্ডের চারিপার্শ্বে কিছু সাইটোপ্লাজম্ সঞ্চিত হইয়া চারিটি প্রায় গোলাকার **এসকোস্পোর** (ascospore) নির্মাণ করে। পরে এসকাস বিদীর্ণ হইয়া এসকোস্পোরগুলি বাহিরে আসে ও বাতাসে উড়িয়া যায়। এই এসকোস্পোর খেজুরের রস বা চিনির রসে পড়িলে অঙ্কুরিত হয় ও অঙ্গজ-জনন প্রক্রিয়ায় বৃদ্ধি লাভ করে।



চিত্র 11
ইষ্টের যৌন জনন প্রক্রিয়া

কোন কোন ইষ্টকে **যৌন** (sexual) প্রক্রিয়ায়ও বংশবৃদ্ধি করিতে দেখা যায় (চিত্র 11)। এই প্রক্রিয়ায় দুইটি ইষ্টকোষ কাছাকাছি আসে। কোষ দুইটি

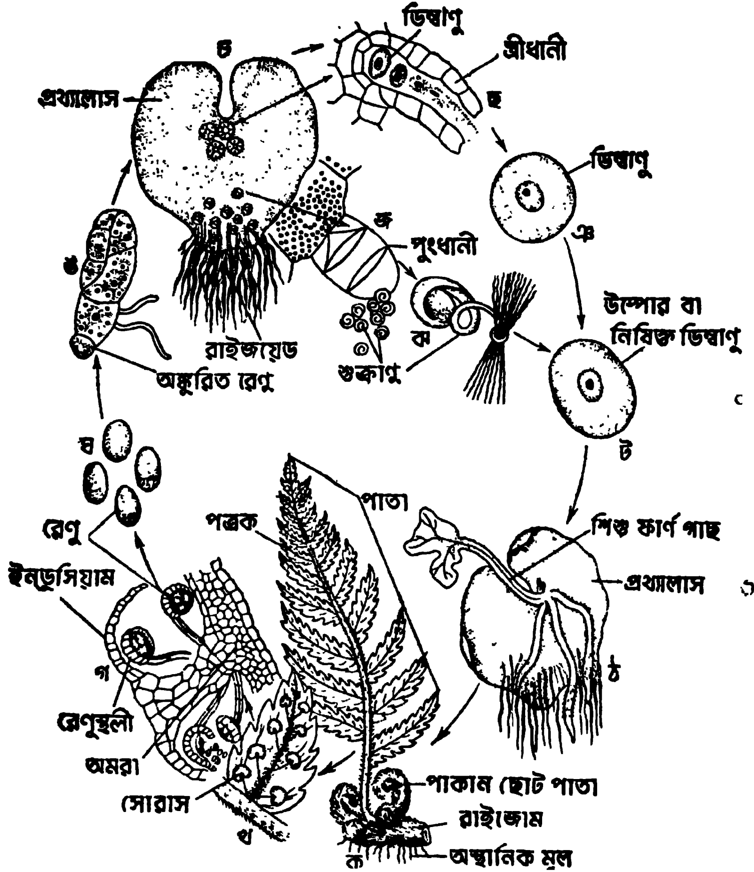
একটি **সংশ্লেষ নালীর** (conjugating tube) সাহায্যে যুক্ত হয়। পরে কোষ দুইটির নিউক্লিয়াসদ্বয় সংশ্লেষ নালীর মধ্যে আসিয়া মিলিত হয়। মিলিত কোষ দুইটিকে **জাইগোট** (zygote) অথবা **এসকাস্** (ascus) বলে। জাইগোট নিউক্লিয়াস বিভক্ত হইয়া আটটি নিউক্লিয়াস নির্মাণ করে। প্রতিটি নিউক্লিয়াস কিছু পরিমাণে সাইটোপ্লাজম্ বেষ্টিত হইয়া **এসকোস্পোরে** পরিণত হয়। পরে এসকাস্ ফাটিয়া এসকোস্পোর বাহিরে আসে ও অনুকূল অবস্থায় অঙ্কুরিত হয়।

4. **ফার্ণ (Fern)ঃ** আমাদের দেশে নানাপ্রকার ফার্ণ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারা উদ্ভিদ জগতে, ফার্ণ বর্গের (Pteridophyta) অন্তর্ভুক্ত একপ্রকার অপুষ্পক উদ্ভিদ। ফার্ণ গাছ সমতল ক্ষেত্রে ও পর্বত্য অঞ্চলে সাধারণতঃ ঠাণ্ডা ছায়াচ্ছন্ন ও স্যাতসেতে জায়গায়, প্রাচীর গাত্রে জন্মিয়া থাকে। ইহাদের কাণ্ড সাধারণতঃ মৃদ্গত **রাইজোম** (rhizome) প্রকৃতির হয় ও রোমে আবৃত থাকে (চিত্র 12ক)। কাণ্ড হইতে অসংখ্য **অস্থানিক মূল** (adventitious root) ও পাতা বাহির হয়। মূলগুলি মাটি হইতে রস শোষণ করে। পাতাগুলি পক্ষল যৌগিক (pinnately compound) প্রকৃতির ও সবুজ রঙের (চিত্র 12ক)। পাতার বৃন্তও রোমে আবৃত থাকে। পাতাগুলি তরুণ অবস্থায় পাকানো থাকে।

পরিণত অবস্থায় ফার্ণ পত্রকগুলির নীচের দিকে কতকগুলি বৃক্কাকৃতি (kidney shaped) অংশ দেখা যায়। এই গুলিকে **সোরাই** (sori) বলে (চিত্র 12খ)। প্রথম অবস্থায় এইগুলি সবুজ বর্ণের থাকে, পরে গাঢ় বাদামী বর্ণ ধারণ করে। একটি সোরাস (sorus) সমেত পত্রকের প্রস্থচ্ছেদ করিলে ইহার মধ্যে বৃন্ত যুক্ত ঈষৎ ডিম্বাকৃতি কতকগুলি **রেণুস্থলী** (sporangium) দেখা যায় (চিত্র 12গ)। রেণুস্থলীগুলির বৃন্ত, পত্রকের নিম্নে **অমরা** (placenta) নামক কলার সহিত সংযুক্ত। অমরা হইতে বহির্গত দুইটি **ইনডুসিয়াম** (indusium) রেণুস্থলী গুলিকে ঢাকিয়া রাখিয়াছে) এই রেণুস্থলীর মধ্যে অনেকগুলি **রেণু মাতৃকোষ** (spore mother cell) নির্মিত হয়। এক একটি রেণু মাতৃকোষ মায়োসিস্ প্রক্রিয়ায় বিভক্ত হইয়া চারিটি করিয়া **রেণু** (spore) গঠন করে (চিত্র 12ঘ)। সুতরাং একটি রেণুস্থলীর মধ্যে অনেকগুলি করিয়া রেণু থাকে। পূর্ণাঙ্গ রেণুস্থলী একটি নির্দিষ্ট স্থানে বিদারিত হয় ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রেণুগুলি বাহিরে নিক্ষিপ্ত হয় (চিত্র 12গ)। রেণুগুলি অত্যন্ত ক্ষুদ্র হওয়ায় বাতাসে কিছুটা উড়িয়াও যাইতে পারে।

অনুকূল অবস্থায় উপযুক্ত উত্তাপ ও জল পাইলে রেণুগুলি মাটিতে অঙ্কুরিত হয়। প্রথমে ইহা হইতে কতকগুলি কোষ বিশিষ্ট সূত্রাকার একটি দেহ গঠিত হয়

(চিত্র 12ঙ)। ইহার কোষগুলি বারংবার বিভক্ত হইয়া একটি হৃরতনাকৃতি **প্রথ্যালাস** (prothallus) গঠন করে (চিত্র 12চ) প্রথ্যালাস খুব পাতলা, সবুজ বর্ণের, চ্যাপ্টা ও প্রায় $\frac{1}{8}$ ইঞ্চি চওড়া। প্রথ্যালাস পরিণত হইলে উহার যে



চিত্র 12
ফার্ণ গাছের জীবনচক্র

দিকে খাঁজ আছে সেই দিকে খাঁজের পাশে পাশে কতকগুলি **স্ত্রীধানী** (archegonia) ও খাঁজের বিপরীত দিকে কতকগুলি **পুংধানী** (antheridia) নির্মিত হয়। প্রথ্যালাসের যেদিকে পুংধানী থাকে সেই দিক হইতে কতকগুলি এককোষী **রাইজয়েড** (rhizoid) বাহির হয়। এইগুলি মূলের ন্যায় মাটি হইতে রস শোষণ করে। সুতরাং দেখা যাইতেছে ফার্ণ এর প্রথ্যালাস একটি সম্পূর্ণ পৃথক

উদ্ভিদ বিশেষ। ইহা সবুজকণা ও মাটি হইতে শোষিত জলের সাহায্যে নিজের খাদ্য প্রস্তুত করিতে পারে।

প্রথ্যালাসস্থিত **স্ত্রীধানী** বা স্ত্রীজননাঙ্গ একটি কলসীর ন্যায় দেখিতে (চিত্র 12ছ)। ইহার মধ্যে একটি মাত্র **ডিম্বাণু** (ovum) ও ইহার উপরে পর পর সজ্জিত কতকগুলি কোষ থাকে। এই কোষগুলি পরে বিনষ্ট হইয়া স্ত্রীধানীর মুখ হইতে ডিম্বাণু পর্যন্ত একটি নালী গঠন করে। **পুংধানী** বা পুংজননাঙ্গ দেখিতে গোলাকার (চিত্র 12জ)। ইহাদের মধ্যে অনেকগুলি **শুক্রাণু** (sperms) থাকে (চিত্র 12ঝ)। প্রতিটি শুক্রাণুর একদিকে অনেকগুলি সূতার ন্যায় বস্তু (cilia) সংলগ্ন থাকে।

পুংধানী পরিণতি লাভ করিলে বিদারিত হয় এবং শুক্রাণুগুলি বাহির হইয়া আসে। ইহারা প্রথ্যালাসের উপরিস্থিত জলে সাঁতার কাটিয়া স্ত্রীধানীর মুখের নিকট আসিয়া ইহার মধ্যে প্রবেশ করে। অবশেষে একটি মাত্র শুক্রাণু, ডিম্বাণুর নিকট পৌছায় ও উহার সহিত মিলিত হইয়া ডিম্বাণুকে **নিষিক্ত** (fertilize) করে। অন্য শুক্রাণুগুলি বিনষ্ট হয়। নিষিক্ত ডিম্বাণু একটি প্রাচীরে নিজেকে আবরিত করিয়া **উস্পোরে** (oospore) পরিণত হয় (চিত্র 12ট)। এই উস্পোর কোষ পরে বিভক্ত হইয়া একটি বহুকোষী শিশু ফার্ণ গাছে পরিণত হয়। ইহা হইতে মূল বাহির হইয়া মাটির মধ্যে প্রবেশ করে এবং ইহার কাণ্ডে নূতন পাতা নির্গত হয়। ছোট অবস্থায় ফার্ণ গাছ প্রথ্যালাসের সহিত সংলগ্ন থাকে ও ইহা হইতে খাদ্য গ্রহণ করে (চিত্র 12ঠ)। পরে প্রথ্যালাস বিনষ্ট হইলে ফার্ণ গাছ স্বাধীন জীবন যাপন করে।

ফার্ণের জীবনচক্রে জনুঃক্রম (Alternation of generations :— ফার্ণগাছের জীবনচক্র দুইটি পর্যায়ে বিভক্ত। উস্পোর হইতে পূর্ণাঙ্গ ফার্ণগাছ গঠন এবং উহার পাতায় সোরাস্ মধ্যস্থ রেণুমাতৃকোষের উৎপত্তি, প্রথম পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত। এই পর্যায়ে কোন যৌনজনন প্রক্রিয়া না থাকায় ইহাকে **রেণুধর জনু** (sporophyte) বলে। মায়োসিস্ প্রক্রিয়ায় রেণুমাতৃকোষ হইতে রেণুর উৎপত্তি, রেণু হইতে পুংধানী ও স্ত্রীধানী সম্বলিত প্রথ্যালাস গঠন এবং ডিম্বাণু শুক্রাণুর মিলনে উস্পোর গঠনের পূর্বাবস্থা, ফার্ণের জীবনচক্রের দ্বিতীয় পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত। এই পর্যায়ে যৌন জননপ্রক্রিয়া থাকায় ইহাকে **লিঙ্গধর জনু** (gameotophyte) বলে। অতএব পূর্ণাঙ্গ ফার্ণগাছ রেণুধরজনু ও পূর্ণাঙ্গ প্রথ্যালাস লিঙ্গধর জনুর অন্তর্ভুক্ত। ফার্ণের জীবনচক্রে এই দুইটি জনু পর্যায়ক্রমে আবর্তিত হইতে থাকে। ইহা

উল্লেখযোগ্য যে দুইটি জন্মুর মধ্যে রেণুধর জন্মুটি মুখ্য ও দীর্ঘস্থায়ী এবং লিঙ্গধর জন্মুটি গৌণ ও ক্ষণস্থায়ী। দুইটি জন্মুর উদ্ভিদই স্বাবলম্বী।

প্রশ্নাবলী

1. অ্যামিবা সম্বন্ধে যাহা জান লিখ। স্কু. ফা.—'66

2. একটি শৈবালের দেহকোষের গঠন ও বংশবৃদ্ধির প্রক্রিয়াগুলি বর্ণনা কর।

3. ইষ্ট ছত্রাকের কোষগঠন বর্ণনা কর। ইহাদের বংশবৃদ্ধির বিভিন্ন উপায়গুলি সম্বন্ধে যাহা জান লিখ। ইষ্ট ছত্রাক মানুষের কি উপকারে লাগে?

4. ফার্ণ উদ্ভিদের জীবন ইতিহাস সম্বন্ধে যাহা জান লিখ।

5. টীকা লিখ: সংশ্লেষ, পার্থেনোজেনেসিস, জাইগোস্পোর, ক্ষণপদ, সংকোচনশীল ভ্যাকুওল, যুগ্মবিভাজন, এসকাস, প্রথ্যালাস, সোরাস।

6. শূন্যস্থান পূর্ণ কর :—

(a) স্পাইরোগাইরার দেহকোষ সেলুলোজ ও পেকটোজ নির্মিত একটি— দ্বারা আবরিত। কোষ মধ্যে দানাদার—একটি স্পষ্ট—এবং কতকগুলি—থাকে। ইহা ব্যতীত সাইটোপ্লাজমে একটি সবুজ বর্ণের ফিতার ন্যায়—আছে। ইহাতে— নামক কতকগুলি উজ্জ্বল দানা দেখিতে পাওয়া যায়।

(b) ফার্ণ গাছে একটি—সমেত পত্রকের অংশ কাটিয়া দেখিলে ইহার মধ্যে বৃন্তযুক্ত, ঈষৎ ডিম্বাকৃতি কতকগুলি—দেখা যায়। ইহাদের বৃন্ত, পত্রকের নিম্নে —নামক কলার সহিত সংযুক্ত। এই কলা হইতে বহির্গত দুইটি—রেণুস্থলী গুলিকে ঢাকিয়া রাখিয়াছে। রেণুস্থলীর মধ্যে অসংখ্য—নির্মিত হয়।

7. শুদ্ধ (✓) অথবা ভুল (×) চিহ্নদ্বারা পার্শ্বে চিহ্নিত কর।

(a) স্পাইরোগাইরা একপ্রকার ছত্রাক।

(b) অ্যামিবা ক্ষণপদের সাহায্যে একস্থান হইতে অন্যস্থানে যায়।

(c) ইষ্টকোষের মধ্যে একটি ফিতাকৃতি ক্লোরোপ্লাসটিড থাকে।

(d) ফার্ণ প্রথ্যালাসের উপরে স্ত্রীধানী ও পুংধানী থাকে।

(e) ইষ্টের নিউক্লিয়াসে একটি ভ্যাকুওল আছে।

(f) স্পাইরোগাইরা যুগ্মবিভাজন প্রক্রিয়ায় বংশবৃদ্ধি করে।

পঞ্চম অধ্যায়

অভিব্যক্তি, বংশগতি ও অভিযোজন

1. অভিব্যক্তি (Evolution) ঃ

আমাদের এই পৃথিবীতে বিভিন্ন প্রকার প্রাণী ও উদ্ভিদের অবস্থিতি। স্বভাবতঃই আমাদের মনে এই প্রশ্নের উদয় হইতে পারে যে এই পৃথিবীতে নানা প্রকার প্রাণী ও উদ্ভিদ আসিল কি ভাবে? ইহারা কি একই সাথে পৃথিবীর বুকে সৃষ্ট হইয়াছে অথবা সরলতম কোন প্রকার জীব হইতে ক্রমান্বয়ে অপরাপর জীব সৃষ্ট হইয়াছে? বহু শতাব্দী ধরিয়া বৈজ্ঞানিকগণ এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর সন্ধান করিয়াছেন।

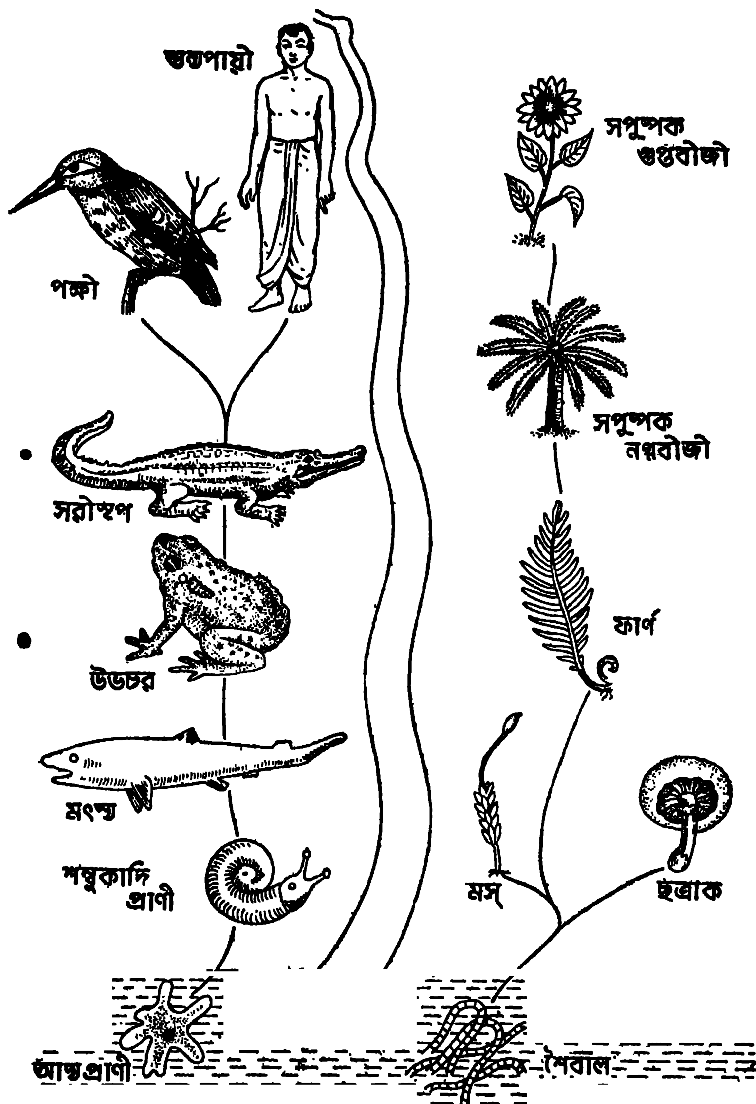
পুরাকালে মানুষের ধারণা ছিল সর্বশক্তিমান সৃষ্টিকর্তা কোন বিশেষ কারণে জীব-জগতের সৃষ্টি করিয়াছেন। সৃষ্টির আদিকাল হইতে বিভিন্ন শ্রেণীর উদ্ভিদ ও প্রাণী অপরিবর্তিত অবস্থায় বর্তমান যুগেও বসবাস করিতেছে। এই মতবাদ **স্বতন্ত্র সৃষ্টির মতবাদ** (Theory of special creation) নামে পরিচিত ছিল এবং ইহা প্রায় উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত অপ্রতিহত ছিল। বর্তমান যুগে বৈজ্ঞানিকগণ এই মতবাদ ভ্রান্ত বলিয়া প্রমাণ করিয়াছেন। ইহারা বৈজ্ঞানিক তথ্য ও যুক্তির উপর ভিত্তি করিয়া দেখাইয়াছেন যে জলজ সরলতম কোন এক প্রকার জীব হইতে কোটি কোটি বৎসর ধরিয়া ধীরে পৃথিবীর পরিবর্তনের সাথে সাথে জীবজগতের ক্রমবিকাশ ঘটিয়াছে। বৈজ্ঞানিকগণ মনে করেন যে আজ হইতে প্রায় 350 কোটি বৎসর পূর্বে সূর্যের নিকট দিয়া একটি বিশাল গ্রহ চলিয়া যাইবার কালে উহার আকর্ষণের ফলে সূর্যের কিয়দংশ সূর্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া কতকগুলি অংশে বিভক্ত হইয়াছিল। এই বিভক্ত অংশগুলির একটি আমাদের পৃথিবী। প্রথমে পৃথিবী ছিল একটি গ্যাসীয় পিণ্ড। জীবনের অস্তিত্ব তখন পৃথিবীর বুকে ছিল না। ক্রমে গ্যাসীয় পৃথিবী শীতল হইয়া তরল ও পরে কঠিন পৃথিবীতে পরিণত হইল। ইহার উপরিভাগ কুঞ্চিত হইয়া উঁচু, নীচু হইল। ইহার পরে পৃথিবীর চারিদিকে বায়ুমণ্ডল সৃষ্টি হইল ও উহা হইতে বৃষ্টিপাতের ফলে নীচু স্থানগুলি জলপূর্ণ হইয়া মহাসমুদ্র ও উঁচু স্থান মহাদেশে রূপান্তরিত হইল। এই বিস্তীর্ণ জলরাশির মধ্যে আজ হইতে প্রায় 50—110 কোটি বৎসর পূর্বে প্রথম সৃষ্ট হইল আদি জীব। কি ভাবে এই জীবন্ত প্রাণী সৃষ্টি

হইয়াছিল তাহা আজিও বৈজ্ঞানিকগণের অজ্ঞাত। এই প্রাণী ছিল অত্যন্ত সরল। ইহাদের দেহ জেলীর মত থল্‌থলে কিছুটা **জীবপঙ্ক** (protoplasm) দ্বারা গঠিত ছিল। এই জীবপঙ্কের মধ্যেই ঘটিয়াছিল প্রাণের বিকাশ। কিন্তু কি প্রকারে এই প্রাণের আবির্ভাব তাহার উত্তর আজিও অজ্ঞাত। প্রাণ বা জীবন কি ভাবে সৃষ্টি হইয়াছে ইহা অনুসন্ধান করিতে গিয়া বৈজ্ঞানিকগণ উদ্ভিদ ও প্রাণিকোষ মধ্যস্থ জীবপঙ্ক বিশ্লেষণ করিয়া দেখিয়াছেন। কিন্তু বিশ্লেষণ করিতে চেষ্টা করিলেই জীবপঙ্কের মৃত্যু ঘটে। মৃত জীবপঙ্ক ও জীবন্ত জীবপঙ্কের গঠন এক নয়। মৃত জীবপঙ্ক বিশ্লেষণ করিয়া যে সকল মৌলিক পদার্থ পাওয়া যায়, সেইগুলি ঠিক সেই অনুপাতে পুনরায় মিশ্রিত করিলে জীবন সৃষ্ট হয় না। সেইজন্য জীবপঙ্কে জীবনের বিকাশের রহস্য বৈজ্ঞানিকগণের নিকট আজিও অজ্ঞাত।

সৃষ্টির আদিতে উদ্ভিদ ও প্রাণীর পৃথক কোন সত্তা ছিল না। এই সরলতম আদিজীব কোটি কোটি বৎসর ধরিয়া পৃথিবীর পরিবর্তনের সাথে সাথে পরিবর্তিত হইয়াছে এবং ইহা হইতে উদ্ভিদ ও প্রাণিকুলের উৎপত্তি ঘটিয়াছে। এই উদ্ভিদ ও প্রাণীরা প্রথমে অতি সরল ছিল। ইহারা জলে বাস করিত ও ইহাদের দেহ একটি মাত্র কোষ দ্বারা গঠিত ছিল। পৃথিবীর পরিবর্তনের সাথে সাথে পারিপার্শ্বিক অবস্থার সহিত সঙ্গতি রাখিয়া এই সরলতম উদ্ভিদ ও প্রাণিদেহ পরিবর্তিত হইয়াছে ও বিভিন্ন প্রকারের উদ্ভিদ ও প্রাণীর উদ্ভব হইয়াছে। ক্রমে এই সকল জলজ উদ্ভিদ ও প্রাণী দৈহিক পরিবর্তন সাধন করিয়া স্থলে বাস করিবার উপযোগী হইয়াছে ও স্থলে উঠিয়া আসিয়াছে। পৃথিবীর অবস্থার পরিবর্তনের সাথে সাথে ইহাদের দেহ ক্রমশঃ জটিলতর হইয়াছে। যে সকল উদ্ভিদ ও প্রাণী নিজেদের পারিপার্শ্বিক অবস্থার সহিত খাপ খাওয়াইতে পারে নাই তাহারা পৃথিবীর বুক হইতে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। অধুনালুপ্ত উদ্ভিদ ও প্রাণী প্রস্তরীভূত হইয়া পৃথিবীর বিভিন্ন শিলাস্তরে **জীবাশ্ম** (fossils) রূপে আজিও অতীতের সাক্ষ্যরূপে বিরাজ করিতেছে। এইরূপে বিভিন্ন প্রকার উদ্ভিদ ও প্রাণীর উৎপত্তি হইয়াছে। আজিও পৃথিবী পরিবর্তিত হইতেছে সুতরাং জীবজগৎও পরিবর্তিত হইতেছে ও তাহাদের ক্রমবিকাশ ঘটিতেছে। এই মতবাদই **জৈব অভিব্যক্তি** (organic evolution) নামে পরিচিত।

উদ্ভিদ জগতে আদি জীব হইতে প্রথমে সৃষ্ট হইয়াছে **শৈবাল** (algae) (চিত্র 13)। ইহা হইতে একদিকে **ছত্রাক** (fungi) এবং অপরদিকে **মসবর্গ** (bryophyta) ও **ফার্ণবর্গ** (pteridophyta) উৎপন্ন হইয়াছে। ইহারা ক্রমে জল হইতে স্থলবাসী হইয়াছে। ফার্ণবর্গ হইতে ক্রমে সপুষ্পক **নগ্নবীজী** উদ্ভিদ

(gymnosperm) ও ইহা হইতে সপুষ্পক গুপ্তবীজী (angiosperm) উদ্ভিদ সৃষ্ট হইয়াছে।



চিত্র 13

উদ্ভিদ ও প্রাণীর ক্রমবিকাশ

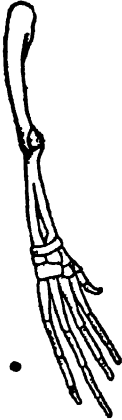
প্রাণিজগতেও আদি জীব হইতে প্রথমে সৃষ্ট হয় অ্যামিবা প্রভৃতি এককোষী **প্রাণী** (protoza)। এই আদ্যপ্রাণী হইতে ক্রমে অপরাপর বহুকোষী **অমেরুদণ্ডী** প্রাণী ও তাহা হইতে ক্রমে **মৎস্য** (pisces) প্রভৃতি জলজ মেরুদণ্ডী প্রাণী সৃষ্টি হয়। ইহারা অনুষ্ণশোণিত, ডিম পাড়িত ও ফুল্‌কার সাহায্যে শ্বাসকার্য নির্বাহ করিত। জল হইতে ক্রমে মেরুদণ্ডী প্রাণীরা স্থলের দিকে অভিযান করার ফলে মৎস্য প্রভৃতি হইতে **উভচর** (amphibia) শ্রেণীর প্রাণীর উদ্ভব হয়। ইহারা অনুষ্ণশোণিত, ডিম পাড়িত, জীবনের কিছুটা জলে ও কিছুটা স্থলে অতিবাহিত করিত, প্রথমে ফুল্‌কার সাহায্যে পরে ফুসফুসের সাহায্যে শ্বাসকার্য নির্বাহ করিত। উভচর প্রাণী হইতে সৃষ্ট হয় **সরীসৃপ** (reptile) জাতীয় প্রাণী। ইহারাও অনুষ্ণশোণিত, ডিম পাড়িত ও ফুস্‌ফুসের সাহায্যে শ্বাসকার্য নির্বাহ করিত এবং ইহাদের দেহ আঁশদ্বারা আবৃত ছিল। প্রায় 20 কোটি বৎসর পূর্বে পৃথিবীতে অনুষ্ণশোণিত অতিকায় সরীসৃপদিগের প্রাধান্য ছিল। এই সময়ে প্রাকৃতিক দুর্যোগে পৃথিবীর উপরিভাগ তুষারে আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছিল বলিয়া ভূতত্ত্ববিদ্‌গণ মনে করেন। অধিকাংশ অতিকায় সরীসৃপ এই সময়ে অত্যধিক শৈত্যে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল। ইহাদের প্রস্তরীভূত বহু জীবাশ্ম (fossils, চিত্র 16) ভূগর্ভ হইতে আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই আবহাওয়ার সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া যে সকল সরীসৃপ জীবিত রহিল তাহারাই আধুনিক সরীসৃপকুলের পূর্বপুরুষ। কিছু কিছু সরীসৃপ, দেহের আকৃতি ও প্রকৃতি পরিবর্তিত করিয়া উষ্ণশোণিত **পক্ষী** ও **স্তন্যপায়ী** প্রাণীতে রূপান্তরিত হইল। পক্ষীরা তাহাদের দেহ পালকে ও স্তন্যপায়ীরা তাহাদের দেহ রোমে আবৃত করিল। এই স্তন্যপায়ী প্রাণী হইতে বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে প্রায় 10 লক্ষ বৎসর পূর্বে আবির্ভূত হইল আদি মানুষ। জীবজগতের এই ক্রমবিকাশ, অবশ্যই অতি ধীরে ধীরে কোটি কোটি বৎসর ধরিয়া ঘটিয়াছে।

অভিব্যক্তির প্রমাণ (Evidences of evolution) :

আধুনিক যুগে অভিব্যক্তি বা ক্রমবিকাশ (evolution) বৈজ্ঞানিক অনুমান মাত্র নহে, ইহা সর্ববাদী সম্মত বৈজ্ঞানিক সত্য। বৈজ্ঞানিকগণ অভিব্যক্তির যে সকল প্রমাণ দেখাইয়াছেন তাহাদের কিছু কিছু নিম্নে আলোচিত হইল।

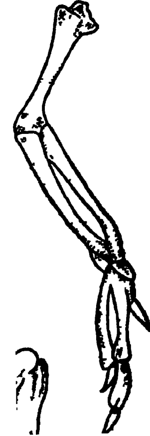
(ক) অঙ্গসংস্থান সম্পর্কিত প্রমাণ (Morphological evidences) : পৃথিবীর উপরিস্থ সমস্ত উদ্ভিদ ও প্রাণীকে উহাদের আকৃতি ও প্রকৃতিগত কোন সাদৃশ্যের উপর নির্ভর করিয়া বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছে। সমস্ত মৎস্যের

মধ্যে কতকগুলি বিশেষ গুণাবলী আছে। সমস্ত অপুষ্পক উদ্ভিদও সেইরূপ কতকগুলি বিশেষ বিশেষ গুণের অধিকারী। সমস্ত মৎস্যই মেরুদণ্ডী, অনুষ্ণশোণিত, ডিম পাড়ে এবং ফুলকার সাহায্যে শ্বাসকার্য চালায়। সুতরাং বলা যাইতে পারে সমস্ত মৎস্যের

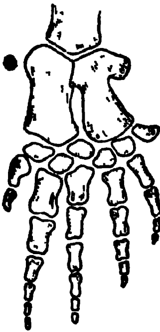


ব্যাঙের অগ্রপদ

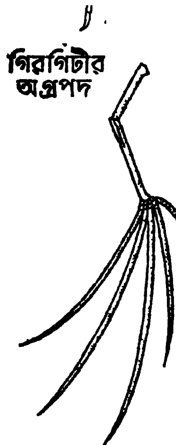
গিরগিটীর অগ্রপদ



পক্ষীর ডানা



তিমি মাছের পাখনা



বাদুরের ডানা

মানুষের হাত

চিত্র 14

বিভিন্ন প্রকার জীবের অগ্রপদের অস্থিসংস্থান

উৎপত্তি একটি আদিম মৎস্য হইতে। আবার সমস্ত মেরুদণ্ডী প্রাণী যথা মৎস্য, উভচর, সরীসৃপ, পক্ষী ও স্তন্যপায়ী প্রাণীদের মধ্যে কতকগুলি সাদৃশ্য আছে। ইহাদের মেরুদণ্ড কতকগুলি কশেরুকার সমষ্টি, চক্ষুর গঠন এক কিন্তু ইহারা বিভিন্ন পরিবেশে বসবাস করে। ব্যাঙ ও গিরগিটির অগ্রপদ, পক্ষী ও বাদুরের ডানা, তিমির পাখনা,

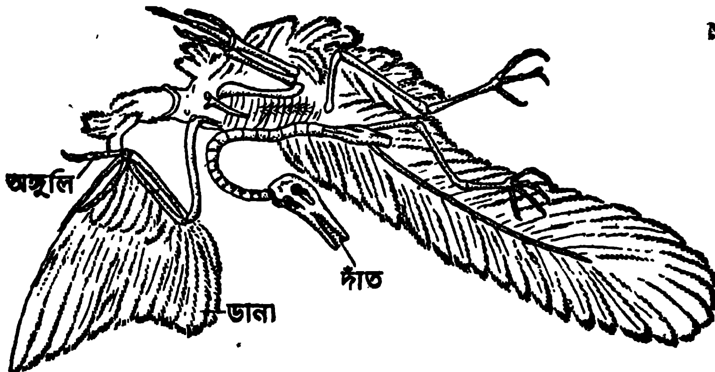
মানুষের হাতের অস্থি-সংস্থান এক প্রকারের (চিত্র 14)। সুতরাং বলা যায় যে, সমস্ত মেরুদণ্ডী প্রাণী একটি আদিম মেরুদণ্ডী প্রাণী হইতে সৃষ্ট হইয়াছে এবং ইহাদের আকৃতি ও প্রকৃতি পরিবেশ অনুযায়ী অভিব্যক্তির সাথে সাথে পরিবর্তিত হইয়াছে।

(খ) দুই শ্রেণীর বৈশিষ্ট্যধারক প্রাণীর অস্তিত্ব (Connecting links) এক শ্রেণীর প্রাণী হইতে যে আর এক শ্রেণীর প্রাণীর উৎপত্তি হইয়াছে



চিত্র 15
প্লাটিপাস বা হংসচঞ্চু প্রাণী

তাহার প্রমাণস্বরূপ কয়েকটি মধ্যবর্তী (intermediate) প্রাণীর কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। অষ্ট্রেলিয়ায় **প্লাটিপাস** বা **হংসচঞ্চুপ্রাণী** (Platypus) (চিত্র 15)



চিত্র 16
আরকিওপটেরিক্সের জীবাশ্ম

নামে এক প্রকার স্তন্যপায়ী প্রাণী আছে যাহা সরীসৃপের ন্যায় ডিম পাড়ে কিন্তু স্তন্যপায়ী প্রাণীর ন্যায় সন্তানকে স্তন্য পান করায়। সুতরাং বলা যায় যে, সরীসৃপ জাতীয় প্রাণী হইতে এই আদিম স্তন্যপায়ী প্রাণী অভিব্যক্তির সাথে সাথে সৃষ্ট হইয়াছে। উদাহরণস্বরূপ আরও একটি অধুনালুপ্ত প্রাণীর কথা উল্লেখ করা যায়। প্রায় 15 কোটি

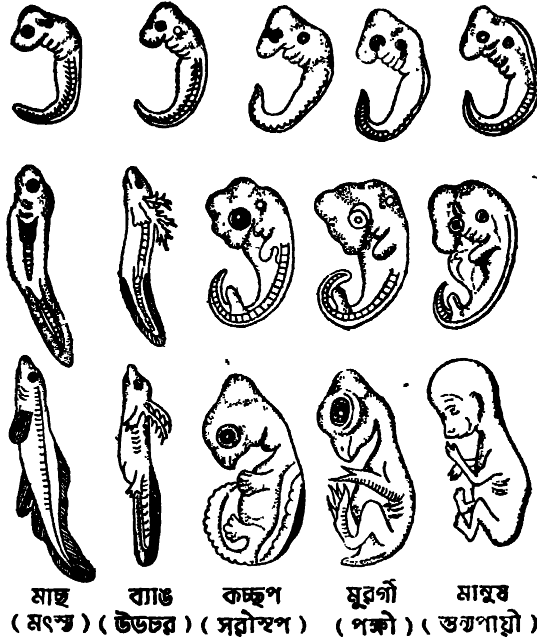
বৎসর পূর্বে **আরকিওপটেরিক্স** (Archaeopterix) (চিত্র 16) নামক একটি প্রাণীর অস্তিত্ব ছিল। বর্তমানে ইহার জীবাশ্ম (fossil) পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে সরীসৃপদের ন্যায় ইহার দন্তবিশিষ্ট দুইটি চোয়াল ছিল। পক্ষীর ন্যায় পালক-বিশিষ্ট দুইটি ডানা এবং ডানায় নখর বিশিষ্ট অঙ্গুলী সংযুক্ত ছিল। এই প্রাণীকে সরীসৃপ ও পক্ষীর সংযোগ প্রাণী বলা যায় এবং মনে করা যায় যে, সরীসৃপ জাতীয় প্রাণী হইতে পক্ষী জাতীয় প্রাণীর উদ্ভব হইয়াছে।

(গ) অকেজো অঙ্গ (Vestigial organs) : প্রাণী বা উদ্ভিদ দেহে কখনও কখনও কতকগুলি প্রায়লুপ্ত বা অকেজো অঙ্গ দেখা যায়। ইহাদের এই অঙ্গগুলি, যে সমস্ত প্রাণী বা উদ্ভিদ হইতে ইহাদের উৎপত্তি হইয়াছে তাহাদের দেহে উন্নত ও প্রয়োজনীয় ছিল। অভিব্যক্তির সাথে সাথে পারিপার্শ্বিক অবস্থার সহিত সঙ্গতি রাখিবার জন্য এই অঙ্গগুলি এখন ক্রমে লুপ্ত বা অকেজো হইয়া যাইতেছে বলিয়া মনে করা যায়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে মানুষের চোখের কোণের মাংসপিণ্ড ইহাদের পূর্বপুরুষ সরীসৃপ জাতীয় প্রাণীর চক্ষুর তৃতীয় পর্দারূপে বর্তমান ছিল। মানুষের কানের অকেজো পেশী ইহাদের পূর্ববর্তী নিম্নস্তরের স্তন্যপায়ী প্রাণীতে কান নাড়িবার জন্য প্রয়োজনীয় ছিল। মানুষের মেরুদণ্ডের শেষ প্রান্তের অস্থি, ইহাদের পূর্বপুরুষ, লেজ বিশিষ্ট প্রাণীর লেজের অস্তিত্বের প্রমাণ। **কিউই** (kiwi) পাখীর ডানা এখন ইহার অকেজো দেহযন্ত্র মাত্র কিন্তু যে সকল পক্ষী হইতে ইহারা উদ্ভূত তাহাদের উড়িবার কাজে ডানার প্রয়োজন ছিল।

(ঘ) ভ্রূণ সম্পর্কিত প্রমাণ (Embryological evidences) : ডিম্ব বা মাতৃগর্ভস্থিত জীবকে **ভ্রূণ** (embryo) বলা হয়। বিভিন্ন প্রকার মেরুদণ্ডী প্রাণীর অল্প কয়েকদিন বয়সের ভ্রূণ পরীক্ষা করিলে ইহাদের মধ্যে কতকগুলি সাদৃশ্য দেখা যায় (চিত্র 17)। ইহাদের প্রত্যেকেরই লেজ ও ফুলকা ছিদ্র থাকে। পরে এই ভ্রূণগুলি পরিবর্তিত হইয়া পিতামাতার আকৃতি বিশিষ্ট হয়। সুতরাং বলা যায় যে উচ্চস্তরের মেরুদণ্ডী প্রাণীগুলি অভিব্যক্তির সাথে সাথে নিম্নস্তরের মেরুদণ্ডী প্রাণী হইতে পরিবর্তিত হইয়া সৃষ্টি হইয়াছে। আবার পক্ষী বা স্তন্যপায়ী প্রাণীর ন্যায় যে কোন একটি উচ্চ স্তরের মেরুদণ্ডী প্রাণীর ভ্রূণের পরিণতি পরীক্ষা করিলে দেখা যায় যে প্রথম অবস্থায় এই ভ্রূণের সহিত পরিণত মৎস্যের অনেক সাদৃশ্য আছে। সুতরাং বলা যাইতে পারে যে মৎস্য জাতীয় জীব হইতে উচ্চ স্তরের মেরুদণ্ডী প্রাণীর উদ্ভব হইয়াছে।

প্রতিটি উচ্চ স্তরের মেরুদণ্ডী প্রাণী উহার পরিণতিকালে ভ্রূণাবস্থায় তাহার ক্রম

বিবর্তনের ধাপগুলি সংক্ষেপে অতিক্রম করিয়া যায়, অর্থাৎ নিজের পরিণতির ইতিহাসের মধ্যে সমস্ত জাতির পরিণতির ইতিহাস সংক্ষেপে পুনরাবৃত্তি করে। বৈজ্ঞানিক



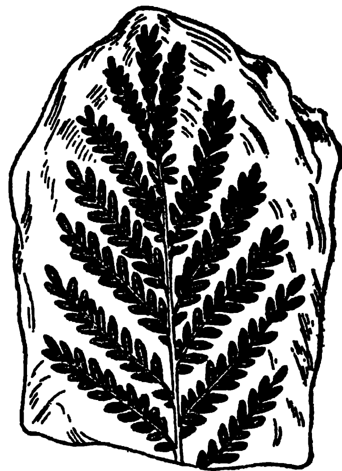
চিত্র 17

বিভিন্ন প্রকার মেরুদণ্ডী প্রাণীর ভ্রূণের সাদৃশ্য

হেকেল (Haeckel) ইহাকে **পুনরাবৃত্তির ধারা** (law of recapitulation) বলিয়াছেন। সুতরাং জীবের পরিণতির ইতিহাস অভিব্যক্তির পরিচায়ক।

(ঙ) জীবাশ্ম সম্পর্কিত প্রমাণ (Palaeontological and Palaeobotanical evidences) : ভূত্বকের বিভিন্ন স্তরে প্রাণী বা উদ্ভিদের দেহকে **জীবাশ্ম** (fossil) বলে (চিত্র 16, 18)। জীবাশ্ম অভিব্যক্তির স্বপক্ষে এক বিরাট সাক্ষ্য। পৃথিবী সৃষ্টি হইবার পর উহার উপর কোটি কোটি বৎসর ধরিয়া, শিলা স্তরে স্তরে জমা হইয়াছে। এই স্তরের মধ্যে প্রস্তরীভূত জীবদেহও জমা হইয়া আছে। ভূতত্ত্ববিদগণ পৃথিবীর বিভিন্ন স্তরের বয়স নির্ণয় করিয়াছেন। ভূপৃষ্ঠে সকলের উপরের স্তর সর্বাপেক্ষা আধুনিক এবং ভিতরের স্তরগুলি ক্রমশঃ প্রাচীন। বিভিন্ন যুগের শিলাস্তরস্থিত জীবাশ্ম হইতে বৈজ্ঞানিকগণ প্রাচীন যুগের জীবকুলের আনুমানিক

বয়স নির্ণয় করিয়াছেন এবং কি ভাবে প্রাচীন জীবকুল হইতে আধুনিক জীবকুলের ক্রমবিকাশ ঘটিয়াছে তাহা জানিতে পারিয়াছেন। অভিব্যক্তিবাদের প্রমাণ হিসাবে **আরকিওপটেরিক্সের** জীবাশ্মের (চিত্র 16) কথা পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। বিভিন্ন যুগে প্রাপ্ত হাতী ও ঘোড়ার জীবাশ্মগুলি পর পর সাজাইলে ইহাদের ক্রম-বিকাশের একটি সম্পূর্ণ চিত্র গঠন করা যায়। জানিতে পারা যায় কি করিয়া আধুনিক ঘোড়া **ইকুয়াস্** (Equus) ইহার পূর্বপুরুষ ক্ষুদ্রকায় **ইয়োহিপ্পাস্** (Eohippus) হইতে এবং আধুনিক হাতী **এলিফাস্** (Elephas) ইহার পূর্বপুরুষ শুঁড় ও দন্তবিহীন **ময়িরিথেরিয়াম** (Moeritherium) হইতে কোটি কোটি বৎসর ধরিয়া অভিব্যক্তির ফলে সৃষ্ট হইয়াছে।



চিত্র 18
পত্রের ছাপ সম্বলিত একটি জীবাশ্ম

অভিব্যক্তিবাদ (Theories of organic evolution)—

পূর্ববর্ণিত প্রমাণ হইতে স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, আমাদের এই পৃথিবীর উপর বিভিন্ন প্রকার জীবের উৎপত্তি অভিব্যক্তির ফলেই হইয়াছে। এই অভিব্যক্তি বা ক্রমবিকাশ কিভাবে ঘটিয়াছে তাহার প্রকৃত কারণ অনুসন্ধান করিতে যাইয়া যে সকল বৈজ্ঞানিক ভিন্ন ভিন্ন মতবাদ গঠন করিয়াছেন তাহাদের মধ্যে **ল্যামার্ক** (Jean Baptise Lamarck), **ডারউইন** (Charles Darwin) ও **ডি ভ্রীস** (Hugo de Vries) এর নাম উল্লেখযোগ্য।

ল্যামার্ক (1744-1829) মনে করিতেন যে, কোন জীবের দৈহিক গঠন পারিপার্শ্বিক অবস্থার পরিবর্তনের সাথে সাথে পরিবর্তিত হয়। জীবেরা যে সকল অঙ্গ বেশী ব্যবহার করে তাহা অভিব্যক্তির সাথে সাথে বেশী উন্নত হয় ও যে সকল অঙ্গ বেশী ব্যবহার করে না সেগুলি ক্রমে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। উদাহরণ স্বরূপ, বর্তমান সাপের পা নাই কারণ ইহারা বুকে হাঁটিয়া চলে। কিন্তু গিরগিটীর ন্যায় যে সকল জন্তু হইতে সাপেরা উদ্ভূত তাহাদের পা ছিল। এইরূপে কোন জীবের দৈহিক পরিবর্তন ঘটে। এই পরিবর্তন পিতামাতা হইতে সন্তানে বর্তায়। ফলে যে জীব সৃষ্ট হয় তাহারা ইহাদের পিতামাতা হইতে ভিন্ন। এইভাবে বিভিন্ন প্রজাতির (species) জীবের

আবির্ভাব ঘটে। কিন্তু এই মতবাদে কি করিয়া দৈহিক গঠনের পরিবর্তন, দেহকোষ হইতে জনন কোষের মাধ্যমে সন্তান সন্ততিতে বর্তায় তাহা ব্যাখ্যা করা হয় নাই।

ডারুইন (চিত্র 19) (1809-1882) তাঁহার **প্রাকৃতিক নির্বাচন** (Natural selection) মতবাদে অভিব্যক্তির ফলে কি করিয়া বিভিন্ন প্রজাতির জীবের আবির্ভাব ঘটিয়াছে, তাহার একটি যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা করেন। ডারুইনের মতবাদকে নিম্নলিখিত কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করা যায়। (1) **অত্যধিক বংশবৃদ্ধির হার** (prodigality of production), (2) **জীবন সংগ্রাম** (struggle for



চিত্র 19

চার্লস ডারুইন

existence), (3) **প্রকারণ বা ব্যত্যয়** (variation), (4) **যোগ্যতমের জয়** (survival of the fittest) (5) **বংশগতি** (heredity)।

ডারুইন দেখাইয়াছেন যে হারে সন্তান সন্ততি জন্মগ্রহণ করে (prodigality of production) তাহাদের সকলে বাঁচিয়া থাকিতে পারে না। কারণ সকলে বাঁচিয়া থাকিলে তাহাদের পরস্পরের মধ্যে এবং নিজেদের ও অন্য প্রজাতির জীবের মধ্যে খাদ্য ও স্থানের জন্য সংগ্রাম (struggle for existence) বাধে। প্রাকৃতিক পারিপার্শ্বিক অবস্থাও অনেক সময় ইহাদের বাঁচিয়া থাকিবার পক্ষে প্রতিকূল হয়। এই সংগ্রামে কাহাদের বাঁচিয়া থাকিবার অধিকার আছে তাহা প্রকৃতি কর্তৃক

নির্বাচিত হয়। যাহারা বাঁচিয়া থাকিবে তাহারা প্রাকৃতিক অবস্থার সহিত সঙ্গতি রাখিয়া **প্রকারণ বা ব্যত্যয়** (variation) প্রক্রিয়ায় তাহাদের আকৃতি ও প্রকৃতির পরিবর্তন ঘটায়। যাহারা এই পরিবর্তন ঘটাইতে সক্ষম হয় তাহারাই যোগ্যতম এবং তাহাদেরই জীবন সংগ্রামে জয় হয় (survival of the fittest)। বাঁচিয়া থাকিবার পক্ষে অনুকূল এই পরিবর্তনগুলি উহারা **বংশগতি** (heredity) প্রক্রিয়ায় সন্তান সন্ততির আকৃতি ও প্রকৃতিতে সঞ্চারিত করে যাহাতে তাহারা পারিপার্শ্বিক অবস্থার সহিত সঙ্গতি রাখিয়া বাঁচিয়া থাকিতে পারে। এই পরিবর্তিত সন্তান সন্ততি তাহাদের পিতামাতা হইতে কিছুটা পৃথক হইয়া নূতন প্রজাতি (species) সৃষ্টি করে। যে সকল জীব জীবন সংগ্রামে নিজেদের উপযুক্ত করিয়া তুলিতে পারে না তাহারা প্রাকৃতিক নির্বাচনে পৃথিবীর বুক হইতে লুপ্ত হয়। এখানে একথা মনে রাখিতে হইবে যে প্রকারণ (variation) প্রক্রিয়ায় জীবের যে পরিবর্তন ঘটে বংশগতি প্রক্রিয়ায় তাহা সন্তান সন্ততিতে সঞ্চারিত না হইলে নূতন প্রজাতির উৎপত্তি ঘটে না।

ডারুইন-বাদ ক্ষুদ্র পরিবর্তন বা **প্রকারণ** (variations) ও **বংশগতি** (heredity) এই দুই মূল ভিত্তির উপর গঠিত। কিন্তু প্রকারণগুলি কেন হয় তিনি তাহার কোন সঙ্গত ব্যাখ্যা করিতে পারেন নাই এবং বংশগতি সম্বন্ধে তাঁহার কোন ধারণা না থাকায় কি করিয়া প্রকারণগুলি সন্তান সন্ততিতে বর্তায় তাহারও কোন কারণ দর্শাইতে পারেন নাই। এ বিষয়ে তিনি ল্যামার্কের জীবের উপর পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রভাব ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ব্যবহার ও অব্যবহার মতবাদ মানিয়া লইয়াছেন।

ডারুইন তাঁহার মতবাদ গঠন কালে কেবলমাত্র জীবের আকৃতি ও প্রকৃতির ক্ষুদ্র পরিবর্তন (variations) গুলি গ্রহণ করিয়াছিলেন কিন্তু বৃহৎ পরিবর্তনগুলি অগ্রাহ্য করিয়াছিলেন। তাঁহার পরবর্তী কালে **ডি-ভ্রীস্** (De Vries) এই বৃহৎ পরিবর্তন (mutation) গুলিকে ক্ষুদ্র পরিবর্তন (variation) হইতে স্বতন্ত্র বলিয়া মনে করেন এবং এইগুলিকেই নূতন প্রজাতি সৃষ্টির দ্যোতক বলিয়া ধারণা করেন। ডি-ভ্রীসের মতে এই বৃহৎ পরিবর্তনগুলি জীবজগতে আকস্মিক ভাবে ঘটে এবং এই পরিবর্তন বংশপরম্পরায় সন্তান সন্ততিতে বর্তায়। পারিপার্শ্বিক অবস্থার পরিবর্তনের জন্য ইহা জীবদেহে ঘটে না। ইহারা জীবের দেহমধ্যস্থ অবস্থার পরিবর্তনের জন্য ঘটে এবং পরে জননকোষের অবস্থারও পরিবর্তন ঘটায়। এই পরিবর্তনগুলি পারিপার্শ্বিক অবস্থার সহিত সঙ্গতি রাখিয়া চলিবার উপযুক্ত হইলে আকস্মিকভাবে নূতন প্রকার প্রজাতির সৃষ্টি হয়।

2. বংশগতি (Heredity) :—

সন্তান জন্মগ্রহণ করিলে উহা পিতা কিম্বা মাতা কাহার মত দেখিতে হইয়াছে তাহা আমরা আলোচনা করিয়া থাকি। অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায় যে পিতা ও মাতা উভয়ের আকৃতি, দেহের রং, চোখের তারা ও চুলের রং ইত্যাদি গুণাবলী সন্তানের মধ্যে মিলিত অবস্থায় প্রকাশিত হয়। যে প্রক্রিয়া দ্বারা পিতামাতার বৈশিষ্ট্যগুলি সন্তানের মধ্যে সঞ্চারিত হয় তাহাকে **বংশগতি** (heredity) বলে। এখন প্রশ্ন হইতে পারে কি করিয়া পিতামাতার বৈশিষ্ট্যগুলি সন্তানের মধ্যে সঞ্চারিত হয়? এই প্রশ্ন দুইশত বৎসর পূর্বেও বিভিন্ন

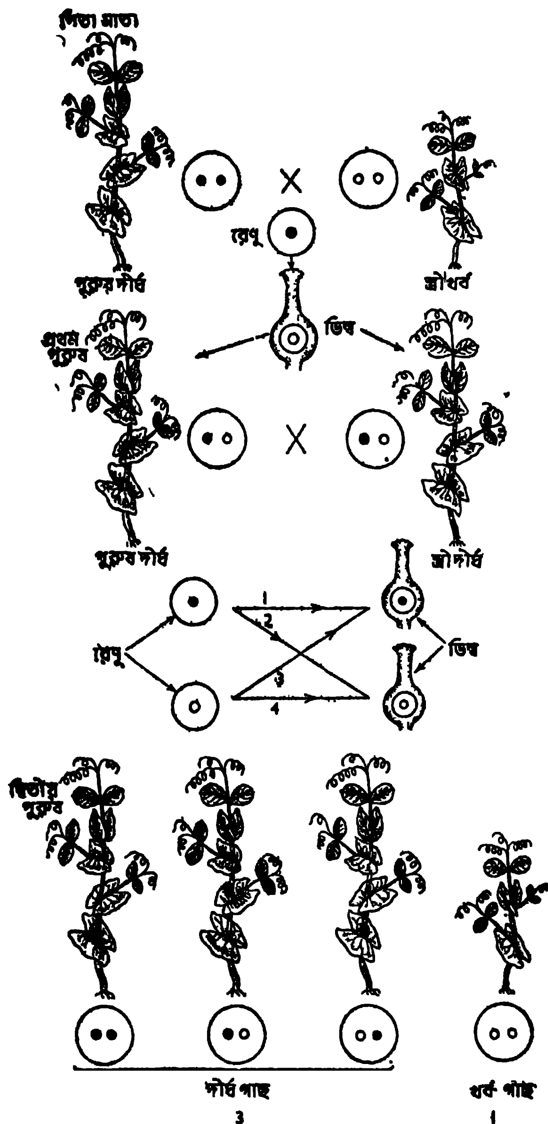


চিত্র 20
গ্রীগর জোহান মেণ্ডেল

দেশের বৈজ্ঞানিকদিগের মনে উদিত হইয়াছিল। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বংশগতির সর্বপ্রথম বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা করেন **গ্রীগর জোহান মেণ্ডেল** (Gregor Johan Mendel, চিত্র-20)। এইজন্য মেণ্ডেলকে Father of genetics আখ্যা দেওয়া হয়।

মেণ্ডেল (1828-1884) অস্ট্রিয়ার অন্তর্গত ব্রুণ (বর্তমানে চেকোশ্লোভাকিয়ার ব্রণো) নামক এক শহরতলীর একজন মঠাধ্যক্ষ ছিলেন। দীর্ঘ আট বৎসর ধরিয়া মটর গাছের উপর গবেষণার পর 1866 খ্রীষ্টাব্দে তিনি বংশগতি সম্বন্ধে একটি অমূল্য

নিবন্ধ রচনা করেন। কিন্তু সে সময়ে তাঁহার আবিষ্কৃত তথ্য বৈজ্ঞানিক সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারে নাই। তাঁহার পরলোক গমন করিবার পর প্রায় 16 বৎসর



চিত্র 21

মটর গাছের উপরে মেণ্ডেলের পরীক্ষার ফল

পরে 1900 খ্রীষ্টাব্দে **ডি-ভ্রীস** (De Vries) তাঁহার গবেষণা পত্রাদি হইতে বংশগতি সম্বন্ধীয় অমূল্য তথ্যটি উদ্ধার করিয়া প্রকাশ করেন। মেণ্ডেলের আবিষ্কৃত তথ্য বর্তমানে **মেণ্ডেলবাদ** (Mendelism) নামে পরিচিত। উদ্ভিদ জগতের ন্যায় প্রাণী জগতেও যে মেণ্ডেলবাদ সমভাবে প্রযোজ্য তাহা বৈজ্ঞানিক **বেটসন** (Bateson) পরবর্তীকালে প্রমাণ করিয়াছেন।

মেণ্ডেলের পরীক্ষার বিষয় ছিল মটরগাছ (Pisum sativum)। তিনি মটরগাছের সাতজোড়া বিপরীতমুখী গুণাবলী (allelomorphic pairs) পরীক্ষার জন্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহারা যথাক্রমে (1) বীজের আকৃতি—গোল বা কুঞ্চিত, (2) বীজপত্রের বর্ণ—হলুদ বা সবুজ, (3) বীজত্বকের ও ফুলের বর্ণ—রঙীন বা সাদা, (4) ফলের আকৃতি—মসৃণ বা খাঁজকাটা, (5) অপক্ব ফলের বর্ণ—সবুজ বা হলুদ, (6) পুষ্প সংস্থান—কাক্ষিক বা প্রান্তিক, (7) কাণ্ডের দৈর্ঘ্য—দীর্ঘ বা খর্ব। সর্বপ্রথম তিনি একজোড়া করিয়া গুণাবলী লইয়া পরীক্ষা আরম্ভ করেন। তিনি একটি **দীর্ঘ** মটরগাছের পরাগরেণু খর্ব গাছের গর্ভমুণ্ডে সংযোগ করিয়া যে বীজ পাইলেন তাহা রোপণ করিয়া দেখিলেন যে **প্রথম পুরুষে** (first filial generation) সকল গাছগুলিই দীর্ঘ হইয়াছে (চিত্র 21)। এই নিরীক্ষা হইতে মেণ্ডেল মন্তব্য করিলেন যে, পিতামাতা হইতে সঞ্চারিত গুণের কতকগুলি সন্তান-দেহে প্রাধান্য লাভ করে ও কতকগুলি সুপ্ত অবস্থায় থাকে। যে গুণগুলি প্রাধান্য লাভ করে তাহাদিগকে **ডমিন্যাণ্ট** (dominant) ও যে গুণগুলি সুপ্ত অবস্থায় থাকে তাহাদিগকে **রিসেসিভ** (recessive) গুণ বলে। এস্থলে **দীর্ঘ** এই গুণটি ডমিন্যাণ্ট ও **খর্ব**টি রিসেসিভ। অর্থাৎ দীর্ঘ ও খর্ব এই দুই গুণাবলী পিতামাতা হইতে সন্তানে সঞ্চারিত হইলে, সন্তান দীর্ঘ হইবে ও খর্ব গুণটি সন্তানের মধ্যে সুপ্ত অবস্থায় থাকিবে। মেণ্ডেল ইহাকে "Law of Dominance" আখ্যা দান করেন। দেখা গিয়াছে উপরোক্ত সাতটি গুণযুগলের প্রত্যেকটির প্রথমটি ডমিন্যাণ্ট।

ইহার পর মেণ্ডেল প্রথম পুরুষে প্রাপ্ত সকল দীর্ঘ গাছগুলির মধ্যে স্বপরাগ যোগ (self pollination) করিলেন। প্রাপ্ত বীজগুলি রোপণ করিয়া দেখিলেন **দ্বিতীয় পুরুষে** (second filial generation) সমস্ত গাছগুলির মধ্যে তিনভাগ দীর্ঘ ও একভাগ খর্ব হইয়াছে (চিত্র 21)। অর্থাৎ ডমিন্যাণ্ট ও রিসেসিভ্ গুণবিশিষ্ট গাছগুলির অনুপাত 3 : 1 হইয়াছে এবং দ্বিতীয় পুরুষে গাছগুলি পুনরায় পিতামাতার প্রাথমিক গুণাবলী প্রাপ্ত হইয়াছে। অতঃপর মেণ্ডেল দ্বিতীয় পুরুষে প্রাপ্ত

গাছগুলির প্রত্যেকটি বীজ স্বতন্ত্রভাবে রোপণ করিয়া ও ইহাদের মধ্যে স্বপরাগ যোগ ঘটাইয়া দেখিলেন যে, **তৃতীয় পুরুষে** (third filial generation), দ্বিতীয় পুরুষে প্রাপ্ত তিনভাগ দীর্ঘ গাছগুলির একভাগ হইতে পুনরায় দীর্ঘ গাছ হইতেছে। অপর দুইভাগ হইতে তিনভাগ দীর্ঘ ও একভাগ খর্ব গাছ হইতেছে। অবশিষ্ট একভাগ খর্ব গাছ হইতে পুনরায় খর্ব গাছ উৎপন্ন হইতেছে। সুতরাং দ্বিতীয় পুরুষে প্রাপ্ত গাছগুলির মধ্যে ডমিন্যাণ্ট ও রিসেসিভ গুণাবলী বিশিষ্ট গাছগুলির অনুপাত 3 : 1 না বলিয়া প্রকৃতপক্ষে শুদ্ধ দীর্ঘ, মিশ্র দীর্ঘ ও শুদ্ধ খর্বের অনুপাত 1 : 2 : 1 বলা উচিত (চিত্র-21)।

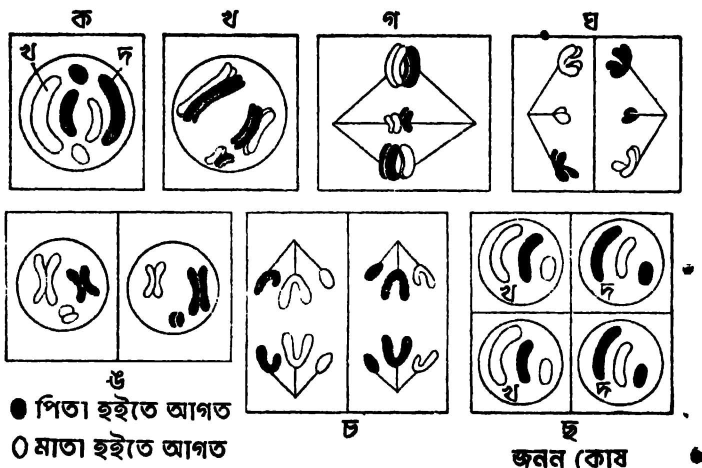
এখন প্রশ্ন হইতে পারে যে, এই ডমিন্যাণ্ট ও রিসেসিভ গুণযুগলের (allelomorphs) অবস্থিতি কোথায় ও কি প্রকারে ইহারা পিতামাতা হইতে সন্তানের মধ্যে সঞ্চারিত হইতেছে? এসম্বন্ধে সঠিক ধারণা করিতে হইলে ক্রোমোজোম (chromosome) ও জীবের কোষ বিভাজন সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা আবশ্যক।

জীবদেহ কতকগুলি কোষ (somatic cell) দ্বারা গঠিত। প্রতিটি কোষ অর্ধতরল **জীবপঙ্ক** (protoplasm) দ্বারা পূর্ণ। প্রত্যেক কোষের মধ্যে অপেক্ষাকৃত বেশীঘন জীবপঙ্ক নির্মিত একটি **নিউক্লিয়াস** (nucleus) থাকে। নিউক্লিয়াসের মধ্যে কতকগুলি সূত্রাকার অংশ থাকে ইহাদিগকে **ক্রোমোজোম** (chromosome) বলা হয়। প্রত্যেক ক্রোমোজোম কতকগুলি **জীনের** (gene) সমষ্টি এবং এক একটি জীন এক একটি গুণের ধারক।

প্রতি প্রজাতির (species) ক্রোমোজোম সংখ্যা সর্বদা সমান। যথা মানুষের দেহকোষে ক্রোমোজোম সংখ্যা সর্বদা 48, ধানগাছে এই সংখ্যা 24 এবং মটর গাছে 14 ইত্যাদি। সাধারণতঃ দেহকোষ মধ্যস্থ ক্রোমোজোমের অর্ধেকগুলি অপর অর্ধেকগুলির **সদৃশ** (homologous)। কোষস্থ ক্রোমোজোমের অর্ধেকগুলি ডমিন্যাণ্ট জীনের এবং ইহার সদৃশ অপর অর্ধেকগুলি রিসেসিভ জীনের বাহক। কোষ বিভাজন কালে কোষমধ্যস্থ প্রতিটি ক্রোমোজোম লম্বালম্বি ভাবে বিভক্ত হইয়া অপর কোষে যায়। ফলে বিভাজনের পর নূতন কোষের ক্রোমোজোম সংখ্যা ও গুণাবলী সমান থাকে। এই প্রকার কোষ বিভাজনকে **মাইটসিস** (mitosis) বলে। এই প্রক্রিয়ায় দেহকোষগুলি বিভক্ত হইয়া জীবদেহের বৃদ্ধি সাধন করে।

কিন্তু জীবের প্রজনন তন্ত্রের পুং অথবা স্ত্রী মাতৃকোষে কোষ বিভাজন অন্য প্রকার (চিত্র 22)। এস্থলে কোষস্থ ক্রোমোক্রোমগুলির মধ্যে ডমিন্যাণ্ট জীনবাহী অর্ধেকগুলি ক্রোমোজোম ইহাদের সদৃশ রিসেসিভ জীনবাহী অপর অর্ধেকগুলি ক্রোমো-

জোমের সহিত লম্বালম্বিভাবে লিপ্ত হয়। ইহাদের মধ্যে কিছু অংশ বিনিময়ের পর ইহারা দুইদিকে সরিয়া যায় ও পরে মাতৃকোষের অর্ধেক ক্রোমোজোম সম্বলিত দুইটি কোষ গঠন করে। এই দুইটি কোষের গুণাবলী ভিন্ন। কারণ ইহাদের একটিতে ডমিন্যান্ট জীনবাহী ক্রমোজোম ও অপরটিতে রিসেসিভ জীনবাহী ক্রোমোজোম থাকে। পরে এই কোষ দুইটি পূর্ব বর্ণিত মাইটসিস প্রক্রিয়ায় বিভক্ত হইয়া মোট চারিটি জননকোষ (gametes) গঠন করে। এই চারিটি কোষের



(চিত্র 22)

চুয়টি ক্রোমোজোম সম্বলিত প্রজননতন্ত্রের একটি কোষের মায়োসিস কোষ বিভাজন ;
দ—ডমিন্যান্ট (দীর্ঘ) ও খ—রিসেসিভ (খর্ব) জীনবাহী ক্রোমোজোম

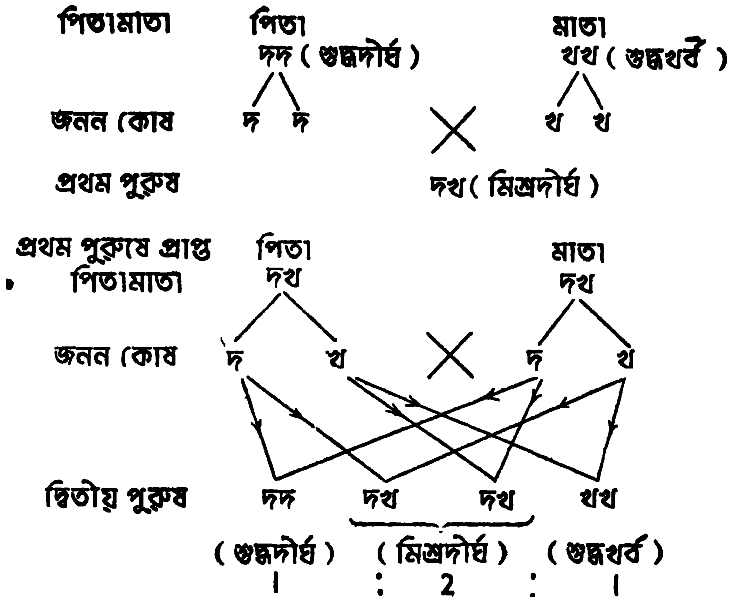
প্রত্যেকটির ক্রোমোজোম সংখ্যা দেহকোষ অথবা জননমাতৃকোষের ক্রোমোজোম সংখ্যার অর্ধেক এবং ইহাদের দুইটিতে ডমিন্যান্ট ও দুইটিতে রিসেসিভ গুণ সম্বলিত ক্রোমোজোম থাকে (চিত্র 22ছ)। এই প্রকার কোষ বিভাজনকে **মায়োসিস** (meiosis) বলে। সুতরাং মায়োসিস প্রক্রিয়ায় একটি পুং অথবা স্ত্রী জননমাতৃকোষের অর্ধেক ক্রোমোজোম সম্বলিত চারিটি করিয়া পুং-জনন কোষ অথবা ডিম্ব কোষ নির্মিত হয়।

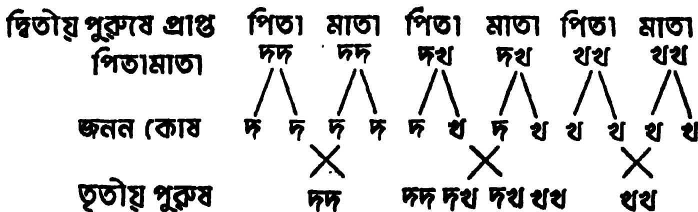
নিষেক (fertilisation) অর্থাৎ স্ত্রী ও পুং জননকোষের মিলনের ফলে সন্তান-সন্ততিতে পুনরায় দেহকোষের ক্রোমোজোম সংখ্যা ফিরিয়া আসে। এই উপায়ে প্রতিটি প্রজাতির ক্রোমোজোম সংখ্যা সর্বদা নির্দিষ্ট থাকে ও পিতামাতার গুণাবলী ক্রোমোজোম মাধ্যমে সন্তান সন্ততিতে সঞ্চারিত হয়।

ইহা উল্লেখযোগ্য যে, গবেষণাকালে মেণ্ডেলের ক্রোমোজোম সম্বন্ধে কোন

ধারণা ছিল না। ক্রোমোজোমগুলিই যে বংশগতির গুণাবলীর ধারক তাহা পরবর্তীকালে মর্গান (Morgan) প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকগণ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন।

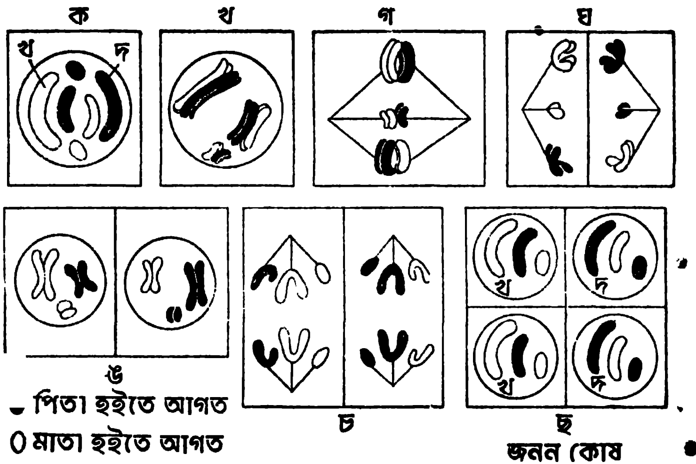
মেণ্ডেল তাঁহার পরীক্ষায় **প্রথম পুরুষে** সমস্ত গাছগুলি লম্বা হইতে দেখিয়াছিলেন কারণ লম্বা মটর গাছগুলির পুংজনন কোষের ক্রোমোজোমে **দীর্ঘ** এই গুণের জীন এবং ছোট গাছগুলির ডিম্বকোষের ক্রোমোজোমে **খর্ব** গুণের জীন





বর্তমান ছিল। নিষেকের পর প্রাপ্ত বীজগুলিতে **দীর্ঘ** ও **খর্ব** এই দুই গুণই বর্তমান ছিল। কিন্তু প্রথম পুরুষে এই বীজগুলি হইতে প্রাপ্ত সমস্ত গাছগুলি লম্বা হইয়াছিল কারণ **দীর্ঘ** এই গুণটি ডমিন্যান্ট। **খর্ব** এই গুণটি ইহার মধ্যে সুপ্ত অবস্থায় ছিল। এখন এই দীর্ঘগুণকে যদি **দ** ও খর্বগুণকে যদি **খ** আখ্যা দেওয়া

জোমের সহিত লম্বালম্বিভাবে লিপ্ত হয়। ইহাদের মধ্যে কিছু অংশ বিনিময়ের পর ইহারা দুইদিকে সরিয়া যায় ও পরে মাতৃকোষের অর্ধেক ক্রোমোজোম সম্বলিত দুইটি কোষ গঠন করে। এই দুইটি কোষের গুণাবলী ভিন্ন। কারণ ইহাদের একটিতে ডমিন্যাণ্ট জীনবাহী ক্রমোজোম ও অপরটিতে রিসেসিভ জীনবাহী ক্রোমোজোম থাকে। পরে এই কোষ দুইটি পূর্ব বর্ণিত মাইটসিস প্রক্রিয়ায় বিভক্ত হইয়া মোট চারিটি জননকোষ (gametes) গঠন করে। এই চারিটি কোষের



(চিত্র 22)

ছয়টি ক্রোমোজোম সম্বলিত প্রজননতন্ত্রের একটি কোষের মায়োসিস কোষ বিভাজন ;
দ—ডমিন্যাণ্ট (দীর্ঘ) ও খ—রিসেসিভ (খর্ব) জীনবাহী ক্রোমোজোম

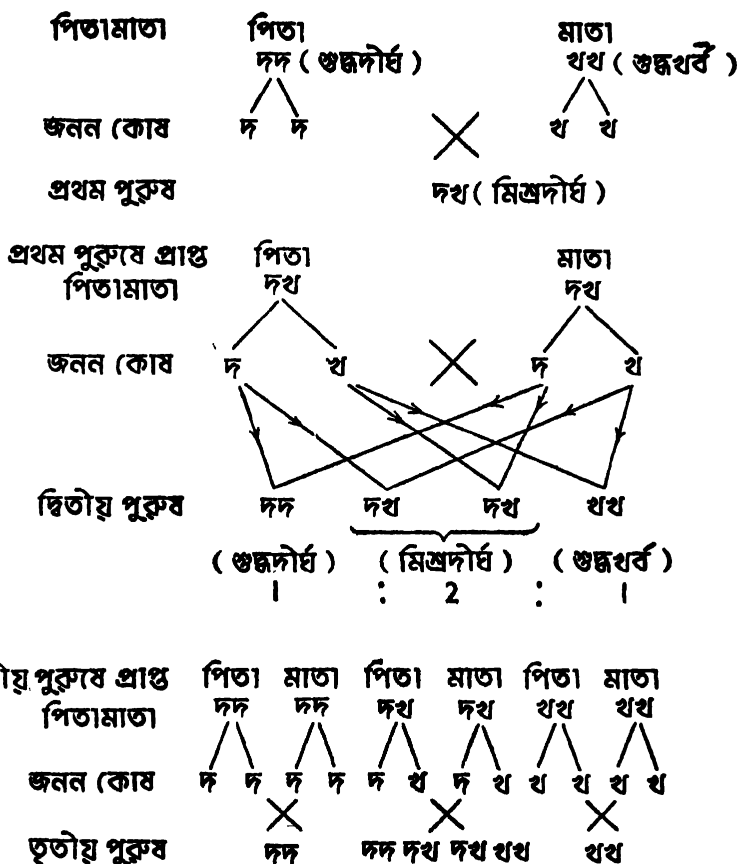
প্রত্যেকটির ক্রোমোজোম সংখ্যা দেহকোষ অথবা জননমাতৃকোষের ক্রোমোজোম সংখ্যার অর্ধেক এবং ইহাদের দুইটিতে ডমিন্যাণ্ট ও দুইটিতে রিসেসিভ গুণ সম্বলিত ক্রোমোজোম থাকে (চিত্র 22ছ)। এই প্রকার কোষ বিভাজনকে **মায়োসিস** (meiosis) বলে। সুতরাং মায়োসিস প্রক্রিয়ায় একটি পুং অথবা স্ত্রী জননমাতৃকোষের অর্ধেক ক্রোমোজোম সম্বলিত চারিটি করিয়া পুং-জনন কোষ অথবা ডিম্ব কোষ নির্মিত হয়।

নিষেক (fertilisation) অর্থাৎ স্ত্রী ও পুং জননকোষের মিলনের ফলে সন্তান-সন্ততিতে পুনরায় দেহকোষের ক্রোমোজোম সংখ্যা ফিরিয়া আসে। এই উপায়ে প্রতিটি প্রজাতির ক্রোমোজোম সংখ্যা সর্বদা নির্দিষ্ট থাকে ও পিতামাতার গুণাবলী ক্রোমোজোম মাধ্যমে সন্তান সন্ততিতে সঞ্চারিত হয়।

ইহা উল্লেখযোগ্য যে, গবেষণাকালে মেণ্ডেলের ক্রোমোজোম সম্বন্ধে কোন

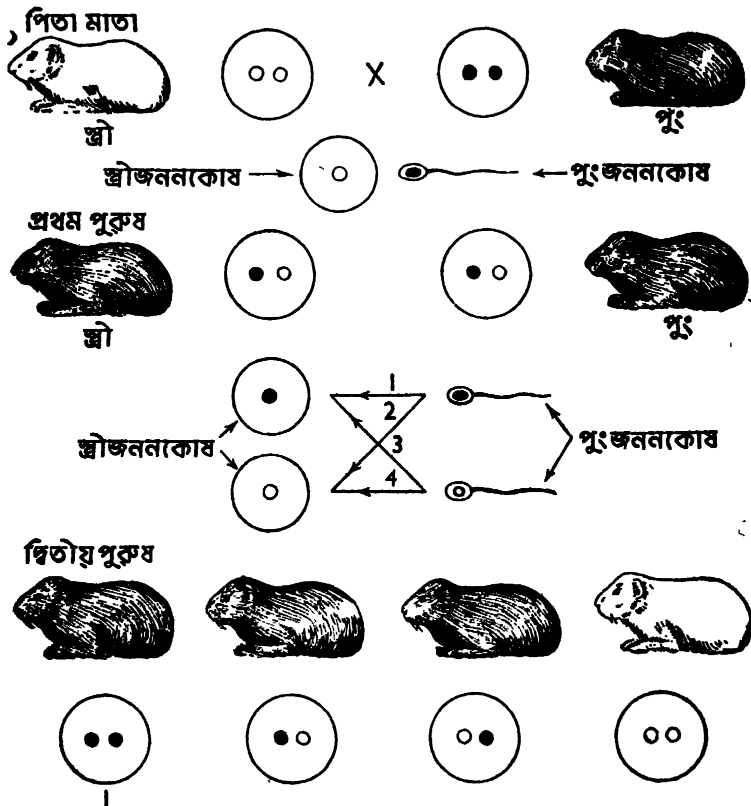
ধারণা ছিল না। ক্রোমোজোমগুলিই যে বংশগতির গুণাবলীর ধারক তাহা পরবর্তীকালে মর্গান (Morgan) প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকগণ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন।

মেণ্ডেল তাঁহার পরীক্ষায় **প্রথম পুরুষে** সমস্ত গাছগুলি লম্বা হইতে দেখিয়াছিলেন কারণ লম্বা মটর গাছগুলির পুংজনন কোষের ক্রোমোজোমে **দীর্ঘ** এই গুণের জীন এবং ছোট গাছগুলির ডিম্বকোষের ক্রোমোজোমে **খর্ব** গুণের জীন



বর্তমান ছিল। নিষেকের পর প্রাপ্ত বীজগুলিতে দীর্ঘ ও খর্ব এই দুই গুণই বর্তমান ছিল। কিন্তু প্রথম পুরুষে এই বীজগুলি হইতে প্রাপ্ত সমস্ত গাছগুলি লম্বা হইয়াছিল কারণ দীর্ঘ এই গুণটি ডমিন্যান্ট। খর্ব এই গুণটি ইহার মধ্যে সুপ্ত অবস্থায় ছিল। এখন এই দীর্ঘগুণকে যদি দ ও খর্বগুণকে যদি খ আখ্যা দেওয়া

যায় তাহা হইলে প্রথম পুরুষের দীর্ঘ গাছগুলিতে দখ গুণ বর্তমান থাকিবে। এই মিশ্রিত গাছগুলি হইতে মায়োসিস প্রক্রিয়ায় যে চারিটি করিয়া পুং ও স্ত্রী জননকোষ পাওয়া যাইবে তাহাদের দুইটিতে দ ও দুইটিতে খ গুণ থাকিবে। এখন ইহাদের মধ্যে স্বপরাগ যোগ ঘটিলে বীজ উৎপাদনের চারিটি সম্ভাবনা দেখা যাইবে, যথা



(চিত্র 23)

প্রাণীর ক্ষেত্রে মেণ্ডেলবাদ

দদ, দখ, দখ ও খখ অর্থাৎ একটি শুদ্ধ দীর্ঘ, দুইটি মিশ্রিত দীর্ঘ ও একটি শুদ্ধ খর্ব। দ্বিতীয় পুরুষে এই বীজগুলি হইতে উৎপন্ন গাছের তিনভাগ দীর্ঘ ও একভাগ খর্ব হইবে, কারণ ইহাদের তিনভাগে দ গুণটি বর্তমান। কিন্তু তিন ভাগ দীর্ঘ এই গাছ-গুলির মধ্যে প্রকৃতপক্ষে একভাগ শুদ্ধ দীর্ঘ অর্থাৎ ইহার মধ্যে খ গুণটি বর্তমান নাই এবং অবশিষ্ট দুইভাগ মিশ্রিত দীর্ঘ অর্থাৎ ইহার মধ্যে দখ দুইটি গুণই বর্তমান।

কিন্তু মিশ্রিত গাছগুলি দীর্ঘ হইবে কারণ দ গুণটি ডমিন্যান্ট। চারিভাগের মধ্যে একভাগ শুদ্ধ খর্ব হইবে কারণ ইহার মধ্যে কেবল মাত্র খ রিসেসিভ্ গুণটি বর্তমান। তৃতীয় পুরুষে শুদ্ধ দীর্ঘ ও শুদ্ধ খর্ব গাছগুলি হইতে পুনরায় দীর্ঘ ও খর্ব গাছ জন্মাইবে এবং মিশ্রিত দীর্ঘ গাছগুলি হইতে পূর্ব প্রক্রিয়ায় পুনরায় তিন ভাগ দীর্ঘ ও একভাগ খর্ব গাছ জন্মাইবে।

253 পৃষ্ঠার ছক্ হইতে উপরোক্ত তথ্যটি বোধগম্য হইবে।

পূর্বে বলা হইয়াছে যে মেণ্ডেলের এই তথ্য প্রাণিজগতেও সমভাবে প্রযোজ্য। একটি সাদা গিনিপিগের সহিত একটি কালো গিনিপিগ মিলিত করিলে প্রথম পুরুষে গিনিপিগগুলি কালো হইবে (চিত্র 23)। কারণ কালো এই গুণটি ডমিন্যান্ট। দ্বিতীয় পুরুষে এই গিনিপিগগুলি হইতে উৎপন্ন গিনিপিগগুলির মধ্যে তিনভাগ কালো ও একভাগ সাদা হইবে।

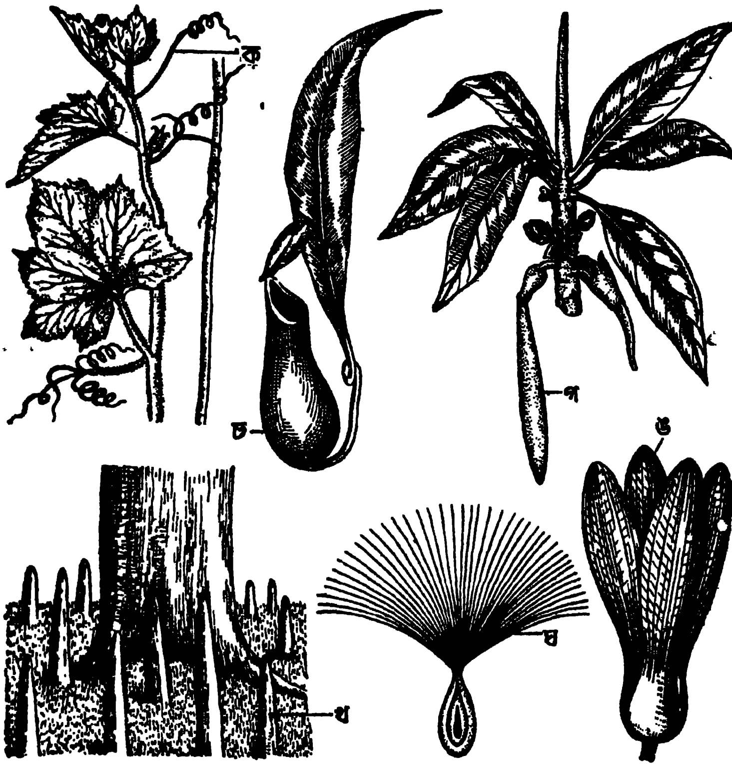
জীববিজ্ঞানীদের নিকট মেণ্ডেলের এই তথ্যটি অত্যন্ত মূল্যবান। মেণ্ডেলবাদ দ্বারা আধুনিক যুগে অভিব্যক্তির প্রকৃত ব্যাখ্যা সম্ভব হইয়াছে। মেণ্ডেলের মতবাদ অনুসরণ করিয়া বর্তমান যুগে ভিন্ন ভিন্ন গুণাবলী বিশিষ্ট উদ্ভিদ ও প্রাণীদিগকে মিলিত করিয়া উন্নততর গুণাবলী বিশিষ্ট উদ্ভিদ ও প্রাণী উৎপাদন করা সম্ভব হইতেছে।

3. অভিযোজন (Adaptation):

জীবের পারিপার্শ্বিক অবস্থার সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া চলাকে **অভিযোজন** (adaptation) বলে। পূর্বে আমরা দেখিয়াছি যে, পৃথিবীর পারিপার্শ্বিক অবস্থা নিয়ত পরিবর্তিত হইতেছে। এই পারিপার্শ্বিক অবস্থার সহিত সংগ্রামে যাহাতে জীবের অস্তিত্ব লুপ্ত না হইয়া যায় সেইজন্য অভিযোজন ক্ষমতা দ্বারা জীবসমূহ নিজ নিজ দেহের অল্পবিস্তর পরিবর্তন সাধন করিয়া থাকে। উদ্ভিদ ও প্রাণী উভয় প্রকার জীবের মধ্যেই অভিযোজন ক্ষমতা বর্তমান আছে।

(ক) উদ্ভিদের অভিযোজন (adaptation of plants): বিভিন্ন প্রকার প্রাকৃতিক বিপত্তি হইতে নিজেকে রক্ষা করিবার জন্য উদ্ভিদের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার অভিযোজন দেখা যায়। তৃণভোজী প্রাণী হইতে **আত্মরক্ষা করিবার জন্য** বাবলা, গোলাপ, ফণীমনসা প্রভৃতি উদ্ভিদের গায়ে কাঁটা জন্মে। বিছুটি, আলকুসী প্রভৃতি গাছের বিষযুক্ত রোম প্রাণিদেহে প্রবেশ করিলে দেহের সেই স্থান চুলকাইতে থাকে। উচ্ছে ফল, নিমপাতা প্রভৃতির তিক্ত স্বাদ; গাঁধাল, ঘেঁটু

প্রভৃতি গাছের পাতার দুর্গন্ধ; করবী, ধুতুরা প্রভৃতি ফলের বিষ এই সকল গাছকে আত্মরক্ষায় সাহায্য করে। কখনও কখনও গাছের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বিষাক্ত কোনও প্রাণীর আকার ধারণ করিয়া ইহাকে আত্মরক্ষায় সাহায্য করে। যথা কচু জাতীয় সর্পবৃক্ষের ফুল দেখিতে ঠিক সাপের ফণার ন্যায়।



চিত্র 24

উদ্ভিদের অভিযোজন

(ক) কুমড়া গাছের আকর্ষি; (খ) নাসিকা মূল; (গ) জরায়ুজ অঙ্কুরোদ্গমে নিম্নমুখী পত্রাবকাণ্ড; (ঘ) আকন্দের বীজে তুলা; (ঙ) শাল ফলের ডানা

উপযুক্ত পরিমাণ আলো ও বাতাস পাইবার জন্য উদ্ভিদের বিভিন্ন প্রকার অভিযোজন দেখা যায়। কাণ্ডের উপর গাছের পত্রগুলিকে এমনভাবে সজ্জিত থাকিতে দেখা যায় যে প্রত্যেক পত্রের উপর সূর্যের আলো ঠিকমত পড়ে। ঘন বনাঞ্চলে উপযুক্ত আলো পাইবার জন্য গাছগুলি দীর্ঘ হয়। কুমড়া, আঙ্গুর প্রভৃতি

গাছের কাণ্ড এবং মটর, উলটচণ্ডাল প্রভৃতি গাছের পত্র রূপান্তরিত হইয়া আকর্ষিতে পরিণত হয় ও এই সকল দুর্বল কাণ্ড বিশিষ্ট গাছকে উপরে উঠিতে সাহায্য করে (চিত্র 24ক)।

বিভিন্ন পরিবেশে বাস করিবার জন্য উদ্ভিদ-দেহে নানাপ্রকার অভিযোজন দেখা যায়। পাতাশেওলা, ঝাঁঝি প্রভৃতি যে সমস্ত গাছ জলমধ্যে বাস করে, জলস্রোতে ছিন্ন হইবার হাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য ইহাদের দেহ সরু ও নরম হয়। ইহাদের পাতা পাতলা, ফিতার আকৃতি ও অধিক কর্তিত হয়। পদ্ম, শালুক, কচুরীপানা প্রভৃতি ভাসমান উদ্ভিদকে ভাসাইয়া রাখিবার জন্য ইহাদের দেহমধ্যে প্রচুর বাতাবকাশ (air spaces) থাকে। ভাসমান উদ্ভিদে ঠিকমত শ্বাসকার্য চালাইবার জন্য পত্ররন্ধ্রগুলি পাতার নীচের ত্বকে না জন্মিয়া উপরের ত্বকে জন্মে। ক্যাকট্যাস, ফণীমনসা প্রভৃতি যে সকল উদ্ভিদ মরুভূমি অঞ্চলে জন্মায় তাহাদের দেহমধ্যে জল সঞ্চয় করিয়া রাখিবার জন্য ইহাদের কাণ্ড শাঁসালো হয়। অধিক বাষ্পমোচন হইতে রক্ষা পাইবার জন্য অনেক সময় ইহাদের পত্র কণ্টকে রূপান্তরিত হয় বা পত্রস্থিত পত্ররন্ধ্রগুলি রোম দ্বারা আবৃত থাকে। মরুভূমি অঞ্চলে মাটির অনেক নীচ হইতে জল শোষণ করিতে হয় বলিয়া ইহাদের মূল খুব দীর্ঘ হয়। সুন্দরবন অঞ্চলে বিশেষতঃ নোনাজলের ধারে গড়ান, সুন্দরী, গেঁয়ো প্রভৃতি ম্যানগ্রোভ (mangrove) জাতীয় যে সকল গাছ জন্মায় তাহাদের দেহে বিশেষ ধরনের অভিযোজন দেখা যায়। এই সকল গাছের শ্বাসকার্য সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করিবার জন্য ইহাদের ভূনিম্নস্থ মূল হইতে একপ্রকার মূল মাটির উপরে উঠিয়া আসে। ইহাদিগকে **নাসিকামূল** (breathing roots) বলে (চিত্র 24খ)। এই সকল গাছের বীজ, গাছ হইতে নীচে কর্দমাক্ত মাটিতে পড়িলে বিনষ্ট হইয়া যাইতে পারে। সেইজন্য ইহাদের বীজ, গাছে ফলসংলগ্ন থাকাকালে, ফলের মধ্যেই অঙ্কুরিত হয়। এইরূপ অঙ্কুরোদ্গমকে **জরায়ুজ অঙ্কুরোদ্গম** (viviparous germination, চিত্র 24গ) বলে। অঙ্কুরোদ্গমকালে, ইহাদের বীজপত্রাবকাণ্ডটি (hypocotyl) ফলভেদ করিয়া নীচের দিকে নামিয়া আসে। ইহা খুব শক্ত ও ইহার অগ্রভাগ সূচাল হয়। পরে ফল গাছ হইতে বিচ্ছিন্ন হইলে দৃঢ় পত্রাবকাণ্ডটি কর্দমের মধ্যে এমনভাবে প্রোথিত হইয়া যায় যে ফলটি কর্দমের উপরে থাকে ও বিনষ্ট হয় না।

পরাগ-সংযোগ, বীজ ও ফলের বিস্তারের জন্য উদ্ভিদ-দেহে নানাপ্রকার অভিযোজন ঘটে। গোলাপ, সর্বজয়া, শিমুল-পলাশ প্রভৃতি যে সকল ফুল বিবাজমান

ফোটে তাহারা উজ্জ্বল বর্ণের সাহায্যে এবং বেল, জুঁই, রজনীগন্ধা শুভ্রবর্ণের ফুল যাহারা রাত্রে ফোটে তাহারা সুগন্ধের সাহায্যে কীট-পতঙ্গকে পরাগ-সংযোগের জন্য আকর্ষণ করে। গাছের ফল বা বীজ একস্থানে পড়িলে স্থান ও খাদ্যের জন্য প্রতিযোগিতা হইতে পারে বলিয়া, একস্থান হইতে অন্যস্থানে বিস্তারের জন্য ইহাদের দেহে নানারূপ অভিযোজন দেখা যায়। কার্পাস তুলা, আকন্দ (চিত্র 24ঘ) প্রভৃতির বীজে রোম জন্মে। ইহার সাহায্যে বীজগুলি উড়িয়া অন্যস্থানে যাইতে পারে। শাল (চিত্র 24ঙ), মাধবীলতা প্রভৃতির ফলে উড়িয়া যাইবার জন্য ডানা জন্মাইতে দেখা যায়। বাঘনখ, বনওখরা, চোরকাঁটা প্রভৃতি গাছের ফলে কাঁটা জন্মে। এই কাঁটাদ্বারা ইহারা জন্তুর গায়ে বা মানুষের পোষাক পরিচ্ছদে আটকাইয়া যায় ও ইহাদের দ্বারা একস্থান হইতে অন্যস্থানে বিস্তার লাভ করে। আম, জাম, লিচু, বেদানা প্রভৃতি কতকগুলি ফল সুস্বাদু হওয়ায় মানুষ ইহাদের একস্থান হইতে অন্যস্থানে লইয়া যায় ও খাইয়া বীজটি তথায় ফেলিয়া দিলে বীজের বিস্তার ঘটে। নারিকেল প্রভৃতি ফলের ছোবড়া ইহাকে জলে ভাসিতে সাহায্য করে। সেইজন্য নারিকেল ফল জলের সাহায্যে একস্থান হইতে অন্যস্থানে নীত হয়।

খাদ্য সংগ্রহ ও সঞ্চয় করিবার জন্য উদ্ভিদ-দেহে নানারূপ পরিবর্তন দেখা যায়। আসাম অঞ্চলে কলস উদ্ভিদ নামে একপ্রকার পতঙ্গভুক গাছ জন্মে (চিত্র 245)। ইহারা ইহাদের পাতা কলসীতে রূপান্তরিত করে ও ঐ কলসীর সাহায্যে কীটপতঙ্গাদি ধরিয়া উহার দেহ হইতে আমিষ জাতীয় খাদ্য সংগ্রহ করে। অর্কিড গাছ পরাশ্রয়ী। অন্য গাছের উপর জন্মে বলিয়া ইহারা খাদ্য প্রস্তুত করিবার জন্য মূলের সাহায্যে মাটি হইতে জল সংগ্রহ করিতে পারে না। ইহাদের কাণ্ড হইতে বায়বীয় মূল নামক অন্য একপ্রকার মূল বাহির হয়, এই মূল বাতাস হইতে জল শোষণ করিতে পারে। খাদ্য সঞ্চয় করিয়া রাখিবার জন্য আলু, ওল, আদা প্রভৃতি মৃদ্গত কাণ্ড; মূলা, রাঙা আলু, শতমূলী প্রভৃতি মৃদ্গত মূল স্ফীত হয়।

(খ) প্রাণীর অভিযোজন (adaptation in animals) :—উদ্ভিদের ন্যায় প্রাণী-মধ্যেও নানারূপ অভিযোজন দেখিতে পাওয়া যায়। প্রাণীরা **আত্মরক্ষা ও আত্মগোপনের** জন্য নানা ভাবে দৈহিক আকৃতি ও প্রকৃতির পরিবর্তন করিয়া থাকে। কুকুর, বিড়াল, বাঘ, ভল্লুক প্রভৃতি নখর ও দন্তের সাহায্যে, বোলতা, মৌমাছি, ভীমরুল প্রভৃতি হুল এবং ক্ষুদ্রাকার অনেক পোকা দুর্গন্ধের সাহায্যে আত্মরক্ষা করিয়া থাকে। ঘোড়া, জিরাফ প্রভৃতি দৌড়াইয়া আত্মরক্ষা করে।

দৌড়াইবার জন্য ইহাদের পা দীর্ঘ হওয়ার প্রয়োজন। সেইজন্য ইহারা ক্ষুর বিশিষ্ট একটি মাত্র দীর্ঘ অঙ্গুলীর উপর ভর করিয়া দৌড়ায়। অনেক সময় প্রাণীর আত্মরক্ষা করিবার জন্য আত্মগোপনের প্রয়োজন হয়। মেরু অঞ্চলে ভল্লুকের লোমের রঙ সাদা, সেইজন্য ইহারা তুষারের সহিত মিশিয়া থাকিতে পারে। সেইরূপ সিংহ, উট প্রভৃতি প্রাণী মরু অঞ্চলে বাস করে বলিয়া ইহাদের গায়ের রঙ বালুকারাশির ন্যায় ধূসর। বাঘ ঘাস পাতার আলোছায়ার মধ্যে থাকে বলিয়া ইহাদের গাত্র ডোরাকাটা হয়।



চিত্র 25

প্রাণীর অভিযোজন

(ক) চলন্ত পত্র প্রজাপতি; (খ) পত্র প্রজাপতি; (গ) সন্তরণের উপযুক্ত হাঁসের পা; (ঘ) উড়িবার উপযুক্ত পাখীর ডানা

লাউডগা সাপ, টিয়াপাখী প্রভৃতি প্রাণীর রঙ সবুজ। সেইজন্য ইহারা সবুজ গাছ-পাতার মধ্যে আত্মগোপন করিতে পারে। কতকগুলি প্রজাপতি সবুজ পাতা বা শুষ্ক পাতার আকৃতি ও বর্ণ ধারণ করিয়া সবুজ বা শুষ্ক পাতার সহিত মিশিয়া থাকিয়া পতঙ্গভুক্ পক্ষী হইতে আত্মরক্ষা করে (চিত্র 25ক, খ)।

বিভিন্ন পরিবেশে বসবাস করিবার জন্য প্রাণিদেহে বিভিন্ন প্রকার

অভিযোজন দেখা যায়। মাছ জলে বাস করে। জলের বাধা দূর করিয়া ইহাকে চলাফেরা করিতে হয় বলিয়া ইহাদের দেহ দুই পাশ হইতে চাপা এবং মুখের দিকটি সরু। তিমি মাছ একটি স্তন্যপায়ী জন্তু কিন্তু জলে বাস করে বলিয়া সাঁতার কাটিবার জন্য ইহাদের অগ্রপদ দুইটি ডানায় রূপান্তরিত হয়। তিমি, সীল প্রভৃতি মৎস্যের দেহত্বকের নিম্নে পুরু চর্বির আস্তরণ থাকে। ইহার ফলে এই সকল প্রাণী শীতল জলে বসবাস কালেও দেহের উত্তাপ যথাযথ সংরক্ষণ করিতে পারে। কুমীর, জলহস্তী প্রভৃতি প্রাণী ফুসফুসের সাহায্যে শ্বাসকার্য চালায় অথচ জলে বাস করে। সেইজন্য ইহাদের নাসারন্ধ্র মস্তকের উপরের দিকে থাকে ও সন্তরণকালে জলে ডুবিয়া যায় না। হাঁস, ব্যাঙ প্রভৃতি জন্তুকে জলে সাঁতার কাটিতে হয় বলিয়া ইহাদের পায়ের অঙ্গুলিগুলি পাতলা চামড়া দিয়া জোড়া থাকে (চিত্র 25গ)। উটেরা মরুভূমি অঞ্চলে বাস করে সেইজন্য ইহাদের পাকস্থলীতে প্রচুর পরিমাণে জল জমাইয়া রাখিবার ব্যবস্থা থাকে। ইহাদের পায়ের পাতা চ্যাটাল হওয়ায় বালুকার মধ্য দিয়া চলিবার কালে পা বালুমধ্যে প্রোথিত হয় না। পক্ষীদের আকাশে উড়িতে হয় সেইজন্য ইহাদের অগ্রপদ দুইটি পালক আবৃত ডানায় পরিবর্তিত হয় (চিত্র 25ঘ)। দেহ হাল্কা করিবার জন্য ইহাদের অস্থিগুলি ফাঁপা হয়। দেহমধ্যস্থ ফুসফুস প্রভৃতি অনেক অঙ্গ, দুইটির স্থলে একটি করিয়া থাকে ও ভারসাম্য রক্ষা করিবার জন্য এইগুলি দেহের মধ্যস্থলে বর্তমান থাকে। বাদুর একটি স্তন্যপায়ী জীব, কিন্তু ইহাদের আকাশে উড়িতে হয় বলিয়া অগ্রপদ দুইটি পাতলা চর্ম-নির্মিত ডানায় রূপান্তরিত হয়। বাঁদর, শিম্পাঞ্জী প্রভৃতি জন্তুদের গাছের উপরে থাকিতে হয় বলিয়া ইহাদের হাত ও পায়ের অঙ্গুলিগুলি এমন ভাবে গঠিত যে ইহারা অনায়াসে গাছের ডালকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকিতে পারে। সুতরাং দেখা যাইতেছে অভিযোজনের সাহায্যে প্রাণিকুল, দেহের বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গের পরিবর্তন সাধন করিয়া বিভিন্ন প্রাকৃতিক অবস্থার সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া নিজ নিজ অস্তিত্ব রক্ষা করে।

প্রশ্নাবলী

1. জৈব অভিব্যক্তিবাদ বলিতে কি বুঝ? অভিব্যক্তির সমর্থনে উপস্থাপিত প্রমাণগুলি সংক্ষেপে আলোচনা কর।

2. অভিব্যক্তি সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন মতবাদগুলি আলোচনা কর।

3. বংশগতি সম্বন্ধে মেণ্ডেলের তথ্যটি সংক্ষেপে আলোচনা কর।

4. ক্রোমোজোম মাধ্যমে কি করিয়া পিতামাতার গুণাবলী সন্তান-দেহে সঞ্চারিত হয় তাহা একটি ছকের সাহায্যে আলোচনা কর।

5. উদ্ভিদ বা প্রাণীর অভিযোজন সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ রচনা কর।

6. শূন্যস্থান পূর্ণ কর :—

(a) জীবদেহ কতকগুলি — দ্বারা গঠিত। প্রতিটি কোষ অর্ধতরল — দ্বারা পূর্ণ। প্রত্যেক কোষের মধ্যে একটি — থাকে। ইহার মধ্যে কতকগুলি সূত্রাকার — থাকে। প্রতিটি ক্রোমোজোম কতকগুলি — সমষ্টি এবং এক একটি জীন এক একটি — ধারক।

(b) প্রতিটি মেরুদণ্ডী প্রাণী উহাব পরিণতিকালে — অবস্থায় তাহার — ধাপগুলি সংক্ষেপে — করিয়া যায়। অর্থাৎ—পরিণতির ইতিহাসের মধ্যে সমস্ত — পরিণতির ইতিহাস সংক্ষেপে — করে। বিজ্ঞানী — ইহাকে — ধারা বলিয়াছেন।

7. শুদ্ধ (✓) অথবা ভুল (×) চিহ্ন দ্বারা পার্শ্বে চিহ্নিত কব :—

(a) সৃষ্টির আদিকাল হইতে বিভিন্ন প্রকার উদ্ভিদ ও প্রাণী অপরিবর্তিত অবস্থায় বর্তমান যুগেও বসবাস করিতেছে।

(b) আদিজীব জলের মধ্যে প্রথম সৃষ্টি হইয়াছিল।

(c) প্লাটিপাসকে সরীসৃপ ও স্তন্যপায়ী প্রাণীর সংযোজক প্রাণী বলা যায়।

(d) জীবাশ্ম, অভিব্যক্তির স্বপক্ষে কোন সাক্ষ্য প্রদান করে না।

(e) ডারুইনবাদ, প্রকারণ ও বংশগতি এই দুই মূল ভিত্তির উপর গঠিত।

(f) প্রকারণ প্রক্রিয়ায় ঘটিত জীবদেহের পরিবর্তন বংশগতি প্রক্রিয়ায় সন্তান সন্ততিতে সঞ্চারিত না হইলে প্রজাতি সৃষ্ট হয় না।

(g) অভিব্যক্তি ও বংশগতি পরস্পর সম্পর্কিত নহে।

(h) পারিপার্শ্বিক অবস্থার সহিত সঙ্গতি রাখিয়া চলিবার জন্য জীবের অভিযোজনের কোন প্রয়োজন নাই।

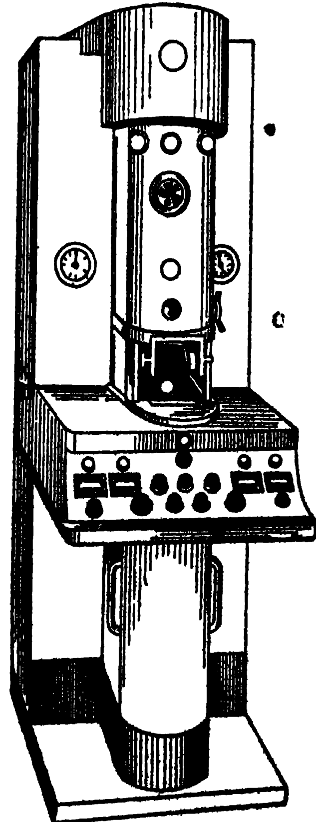
কতিপয় সাধারণ রোগ ও মহামারী

(ক) কয়েকটি বায়ুবাহিত রোগ (Some air borne diseases) :—

1. সাধারণ সর্দি (Common cold) :—ইহা একটি অতি সাধারণ রোগ। ইহাকে প্রতিশ্যায়, কোরাইজা (Coriza) ইত্যাদিও বলা হয়। ডাঃ ক্রস্টার (1916) পরীক্ষার দ্বারা প্রমাণ করেন যে সাধারণ সর্দি একটি সংক্রামক রোগ এবং ব্যাপকভাবে দেখা দিতে পারে।

লক্ষণ : সর্দি দ্বারা আক্রান্ত হইলে প্রাথমিক অবস্থায় মাথা ধরে, গলা ভার হয়, গায়ে হাতে বিশেষতঃ গ্রন্থিতে ব্যথা হয়, নাক বন্ধ হইয়া আসে, চোখ মুখ লাল হয় ও ফুলিয়া উঠে এবং খাদ্যদ্রব্য বিস্বাদ লাগে। পরবর্তী অবস্থায় নাক ও চোখ দিয়া জল ঝরিতে থাকে, হাঁচি ও কাশি হয়। কখন কখন গায়ে আমবাত বাহির হইয়া যায়। গলা খুস্‌খুস্ করে ও শ্বাস লইতে কষ্ট হয়। কয়েক দিন পরে নাক ও চোখ দিয়া জলপড়া বন্ধ হয়। শুষ্ক কাশির সহিত মুখ ও নাক দিয়া হরিদ্রা বর্ণের শ্লেষ্মা বাহির হইতে থাকে। মাথায় অসহ্য যন্ত্রণা হয়। সর্দির ফলে জ্বরও হইতে পারে।

কারণ :—সর্দির নির্দিষ্ট কোন জীবাণু আছে কিনা জানা যায় না। এই রোগ সাধারণতঃ অনেকগুলি জীবাণুর আক্রমণে দেখা দেয়। কোন কোন বৈজ্ঞানিক মনে করেন সর্দি, **ভাইরাস্** (Virus) দ্বারা সংঘটিত হয়। ভাইরাসগুলি অতি ক্ষুদ্র জীবাণু। ইহাদিগকে ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্রের (চিত্র 26) সাহায্যে দেখিতে হয়। ঋতু পরিবর্তনকালে বিশেষতঃ



চিত্র 26
ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্র

শীত পড়ার সময় বা অন্য কোন কারণে ঠাণ্ডা লাগিলে দেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমিয়া যায়। ফলে বায়ুবাহিত ও দেহমধ্যস্থ জীবাণুর দল আক্রমণের সুযোগ পায় ও সর্দি হয়। সর্দি হইয়াছে এমন কোন ব্যক্তির হাঁচি বা কাশি হইতে এই রোগ অন্যের দেহে সংক্রামিত হইতে পারে।

চিকিৎসা :—ডাঃ গ্রেসনের মতে সর্দি লাগিবার সঙ্গে সঙ্গে প্রচুর ঘাম ঝরে এরূপ কোন পরিশ্রম-সাধ্য কার্য করিলে সর্দির চিকিৎসার প্রয়োজন হয় না। আধ চামচা সোডিবাইকার্ব 3-4 চামচ গরম জলের সঙ্গে প্রতি আধ ঘণ্টা অন্তর 3-4 বার পান করিলে সর্দি নিবারণ করিতে পারা যায়। ফুটবাথ লইলে, নাকে কপালে ও ঘাড়ে গরম সরিষার তৈল, ভিক্স প্রভৃতি মালিস করিলে উপকার পাওয়া যায়। ক্লোরিটোন ইনহালেন্ট, এনড্রাইন অথবা থাইমল, কর্পূর, মেন্থল ও দারুচিনি তৈল প্রতিটি চারভাগ ও একভাগ লিকুইড প্যারাফিন মিশাইয়া, গলায় স্প্রে করিলে স্থায়ী ফল পাওয়া যায়। ভিক্স, কর্পূর, ইউক্যালিপটাস্ তৈলের ঘ্রাণ লইলেও উপকার হয়। কাশি থাকিলে লবণ জলে কুলি ও পেনিসিলিন লজেন্স, পেপস্ ইত্যাদি ব্যবহার করা যায়। চিকিৎসকের পরামর্শ মত সালফা ঔষধও ব্যবহার করিতে পারা যায়।

রোগ নিবারণ :—রোগীকে আলো বাতাসযুক্ত ঘরে পৃথকভাবে রাখিলে এবং রোগাক্রান্ত ব্যক্তির সংস্পর্শে না আসিলে এই রোগ নিবারণ করা যায়। ঋতু পরিবর্তনকালে সাবধানে থাকিয়া ও সর্দির প্রতিষেধক টীকা লইয়া শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াইলে সর্দি সংযত করিতে পারা যায়।

2. **ইনফ্লুয়েঞ্জা (Influenza)** :—যে সকল রোগ বৃহৎ ক্ষেত্র জুড়িয়া ব্যাপকভাবে দেখা দেয় তাহাকে মহামারী (pandemic) বলে। ইনফ্লুয়েঞ্জা বা ফ্লু একটি সংক্রামক ও মহামারী পর্যায়ভুক্ত রোগ। ইহা এক সাথে লক্ষ লক্ষ লোকের মৃত্যু ঘটাইতে পারে।

লক্ষণ :—ইনফ্লুয়েঞ্জার উপ্তিকাল (incubation period) অর্থাৎ রোগ-জীবাণু শরীরে প্রবেশ করিবার পর লক্ষণ প্রকাশ পাইবার কাল 1 হইতে 4 দিন। সমগ্র দেহে বিশেষতঃ মাংসপেশী ও সন্ধিস্থলে ব্যথা, মাথায় যন্ত্রণা, সর্দি, কোষ্ঠকাঠিন্য, একটানা কাশি ও অল্প শীত করিয়া জ্বর আসা এই ব্যাধির প্রাথমিক লক্ষণ। পরবর্তীকালে শ্বাসগ্রহণে কষ্ট হয়, বুক ধড়ফড় করে। হৃৎপিণ্ড ও শরীর দুর্বল হইয়া পড়ে। কখনও কখনও থুথুতে রক্ত থাকে ও নাক দিয়া রক্ত পড়ে। সাধারণতঃ 3-4 দিন পর হইতে রোগী সুস্থ হইতে থাকে।

কারণ ঃ—পূর্বে ফেইফার (Pfeiffer, 1889-1892) মনে করিতেন **হিমোফিলাস্ ইনফ্লুয়েঞ্জী (Haemophilus influenzae)** নামক একপ্রকার জীবাণু এই রোগের কারণ। কিন্তু বর্তমানে দেখা গিয়াছে ইনফ্লুয়েঞ্জা একটি **ভাইরাস্** (virus) ঘটিত রোগ। তবে পূর্বোক্ত জীবাণু ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাস্‌কে রোগ আক্রমণে সাহায্য করিয়া থাকে। অন্ধকার স্যাঁতসেঁতে ঘরে বাস ও স্বাস্থ্যহীনতাও এই রোগে আক্রান্ত হইবার কারণ। সাধারণতঃ হাঁচিলে বা কাশিলে রোগাক্রান্ত ব্যক্তির গলা ও নাক হইতে বহির্গত থুথু বা শ্লেষাকণা সুস্থ ব্যক্তির নাকে ও গলায় প্রবেশ করিয়া উহাকে আক্রান্ত করে।

চিকিৎসা ঃ—ইনফ্লুয়েঞ্জার ঠিক কোন চিকিৎসা নাই। তবে ইহার নানা-প্রকার উপসর্গের চিকিৎসার জন্য নানাপ্রকার ঔষধ প্রয়োজন হয়। প্রাথমিক অবস্থায় ইনফ্লুয়েঞ্জা ট্যাবলেট খাইলে এবং গলা ও নাকের ভিতর লবণ জল, পটাস্ পার-ম্যাঙ্গানেট দ্রবণ প্রভৃতি দ্বারা ধুইয়া ফেলিলে উপকার হয়। এই রোগে কোষ্ঠ পরিষ্কার রাখা বিশেষ প্রয়োজন। সেইজন্য বাইকোলেট, ক্রুকলাক্স ইত্যাদি ঔষধ ব্যবহার করা হয়। গায়ের ও মাথার ব্যথা দূর করিবার জন্য এসপ্রিন্, কোডোপাইরিন, এনাসিন প্রভৃতি ব্যবহার করা যায়। কিন্তু এইগুলি অধিক মাত্রায় ব্যবহার করিলে ঘাম হইয়া ঠাণ্ডা লাগিয়া যাইতে পারে। ঠাণ্ডা লাগা হইতে রক্ষা পাওয়া ও সম্পূর্ণ বিশ্রাম করা এই রোগে বিশেষ প্রয়োজন। চিকিৎসকগণ এই রোগে স্যালিসিলেট মিক্সচার, জেলসিনিয়াম মিক্সচার, ভাইটামিন বি, সি, এলকোসিন প্রভৃতি ব্যবহার করেন।

রোগ নিবারণ ঃ—নিম্নলিখিত সাবধানতাগুলি অবলম্বন করিলে এই রোগ নিবারণ করা যায়। যে সকল জনবহুল স্থান হইতে এই রোগ সংক্রামিত হইতে পারে তথায় যাওয়া উচিত নহে। আক্রান্ত রোগীর নিকট হইতে দূরে থাকা কর্তব্য। হাঁচিবার ও কাশিবার সময় মুখে কাপড় দিয়া হাঁচা বা কাশা উচিত। আলো বাতাস পূর্ণ ঘরে বাস করা এবং রোগীকে ও রোগীর ব্যবহৃত দ্রব্যাদি পৃথক ঘরে রাখা উচিত।

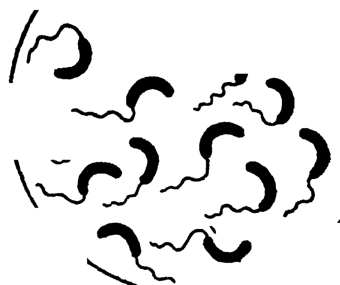
(খ) কয়েকটি জলবাহিত রোগ (Some water borne diseases)।

1. কলেরা (Cholera) ঃ—কলেরা রোগ মারাত্মক সংক্রামক ব্যাধি। ইহা ব্যাপকভাবে মহামারীরূপে দেখা দিয়া একত্রে বহু লোকের প্রাণহানি ঘটায়। ভারতবর্ষে গঙ্গার বদ্বীপ অঞ্চল ও আসামে কলেরার প্রথম জন্মস্থান বলিয়া

অনেকে মনে করেন। মালয়, জাভা, চীনদেশ, ফিলিপাইনস্ প্রভৃতি অঞ্চলেও কলেরার প্রাদুর্ভাবের কথা জানা গিয়াছে। প্রধানতঃ জলই এই রোগের বাহক।

লক্ষণ ঃ—এই রোগের উপ্তিকাল 1 হইতে 6 দিন। কলেরা রোগে আক্রান্ত হইলে গা বমি বমি করিয়া অনবরতঃ বমি হইতে থাকে ও পেট ব্যথা করে। পাতলা চাল ধোয়া জলের ন্যায় দাস্ত হইতে থাকে ও ক্রমে দেহ জল শূন্য হইয়া দুর্বল হইয়া পড়ে। হাতে ও পায়ে খিল ধরে। প্রস্রাব বন্ধ হইয়া যায় ও দ্রুত নিঃশ্বাস পড়িতে থাকে। পিপাসা বৃদ্ধি হয়, চক্ষু বসিয়া যায়, ঘাম হইতে থাকে ও শরীরের উত্তাপ কমিয়া যায়। ক্রমে রোগী অজ্ঞান হইয়া যায় ও 2 হইতে 30 ঘণ্টার মধ্যে মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

কারণ ঃ—এই রোগের কারণ **ভিব্রিও কলেরি** (Vibrio cholerae) (চিত্র 27) নামক একপ্রকার জীবাণু। ইহাদিগকে অনুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে অনেকটা "কমার" (,) মত দেখায় বলিয়া উহাদিগকে কমা ব্যাসিলাস্ (comma bacillus) ও বলে। জীবাণুবিদ্ **রবার্ট কক** (Robert Koch) 1883 খ্রীষ্টাব্দে মিশরে এবং 1884 খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় এই ব্যাসিলাস্ প্রথম আবিষ্কার করেন। এই জীবাণু মিশ্রিত জল ও দুধ পান বা খাদ্যদ্রব্য ভক্ষণ, কলেরার একমাত্র কারণ। কলেরা রোগীর মল ও বমিতে অসংখ্য জীবাণু থাকে। মল ইত্যাদি হইতে মাছি, মশা, ধূলিকণা প্রভৃতির মাধ্যমে রোগজীবাণু খাদ্য বা পানীয় জলকে দূষিত করে। পুষ্করিণীর জলে রোগাক্রান্ত ব্যক্তির কাপড় জামা কাচিলে ঐ জল দূষিত হয়। দূষিত জলের মাধ্যমে রোগজীবাণু সুস্থ ব্যক্তির শরীরে প্রবেশ করিলে রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটে। কলেরা জীবাণু শরীরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া ক্ষুদ্রান্ত্রের মধ্যে আশ্রয় লয় এবং একটি বিষাক্ত পদার্থের সাহায্যে ক্রমশঃ রক্তের জলীয় অংশ শোষণ করিয়া অন্ত্র মধ্যে লইয়া আসে।



চিত্র 27
কলেরা রোগের জীবাণু × 1500

চিকিৎসা ঃ—কলেরা অত্যন্ত মারাত্মক রোগ। সেইজন্য ইহার কোন লক্ষণ প্রকাশ পাইলে তৎক্ষণাৎ সুযোগ্য চিকিৎসকের পরামর্শ লওয়া উচিত বা রোগীকে

হাসপাতালে পাঠান উচিত। এই রোগে রক্তের জলীয় অংশ কমিয়া যায় বলিয়া চিকিৎসাকালে শিরা মধ্যে বা পেশীমধ্যে এক প্রকার লবণ জল (Roger's Alkaline saline solution) প্রবেশ করাইয়া রক্তের গতি, তারল্য ও প্রতিষেধক ক্ষমতা অব্যাহত রাখা হয়। আধুনিক কালে চিকিৎসকগণ ব্যাকটেরিও ফাজ্ (bacterio phage) ও সালফোনামাইড্‌স্, ষ্ট্রেপটোমাইসিন্, ক্লোরাম ফেনিকল ইত্যাদি ঔষধ ব্যবহার করেন।

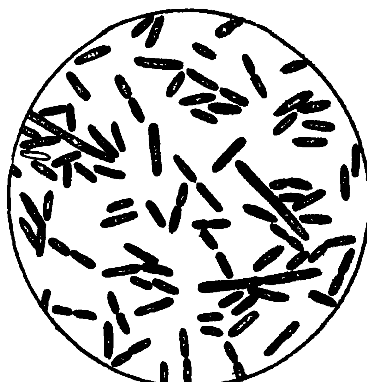
রোগ নিবারণ:—যে সকল দ্রব্য হইতে কলেরা শরীরে সংক্রামিত হয় সেইগুলিকে জীবাণুমুক্ত করিতে পারিলে বহুলাংশে রোগ নিবারণ করা যায়। পানীয় জল ফুটাইয়া ও সামান্য কর্পূর দিয়া খাইতে হয়। মাছি, মশা প্রভৃতি যাহাতে বসিতে না পারে তাহার জন্য খাদ্যদ্রব্য উত্তমরূপে ঢাকিয়া রাখা উচিত। কখনও খালি পেটে থাকা উচিত নয়। পাকস্থলী মধ্যস্থ জারক রসের অম্লত্ব, জীবাণু নাশ করে। এই অম্লত্ব যাহাতে নষ্ট না হয় সেইজন্য সোডি সাল্‌ফ, সোডি বাইকার্ব বা অন্য কোন ক্ষার জাতীয় ঔষধ সেবন করা বিধেয় নহে। রোগীর কাপড়-জামা, বমি, মল ইত্যাদি যে পাত্রে রাখা হয় তাহা কার্বলিক এসিড, লাইসল, ডেটল প্রভৃতি ঔষধ দ্বারা নির্বীজন করা আবশ্যক। ঘর বাড়ী ফিনাইল দ্বারা ধুইয়া দেওয়া উচিত। শুশ্রূষাকারীর হস্ত ভাল করিয়া সাবান ও নির্বীজক পদার্থ (anitiseptic) দ্বারা ধুইয়া ফেলা কর্তব্য। রোগীকে সর্বদা পৃথক ঘরে রাখা উচিত। প্রতি বৎসর কলেরা নিরোধক ইন্‌জেকসন লইলে এবং খাদ্য ও পানীয় সম্বন্ধে উপরোক্ত প্রকার সাবধানতা অবলম্বন করিলে কলেরা রোগের প্রকোপ নিবারণ করা যায়।

2. **টাইফয়েড (Typhoid)**:—টাইফয়েড জ্বর পৃথিবীর সর্বত্র দেখা যায়। ভারতবর্ষেও ইহার প্রকোপ কম নহে। কখনও কখনও এই রোগ মহামারী রূপে দেখা দেয়। টাইফয়েড জ্বর সাধারণতঃ দুই প্রকারের:—**টাইফয়েড ও প্যারা-টাইফয়েড**। প্যারাটাইফয়েড আবার 'এ' ও 'বি' ভেদে দুই প্রকার। আমাদের দেশে টাইফয়েড রোগীর সংখ্যা প্যারাটাইফয়েড অপেক্ষা প্রায় 6 গুণ বেশী। প্যারাটাইফয়েড তত মারাত্মক নহে এবং ইহাতে মৃত্যু ঘটিতে খুব কম দেখা যায়।

লক্ষণ:—টাইফয়েড রোগের উপ্তিকাল 5 হইতে 21 দিন। প্রাথমিক অবস্থায় শীত করিয়া জ্বর হয়, হাতে পায়ে ব্যথা হয়, মাথা ধরিয়া থাকে, গা ম্যাজ ম্যাজ করে, শরীর ও মন ভার হইয়া থাকে। অরুচি, পেটে ব্যথা, কোষ্ঠবদ্ধতা, ব্রঙ্কাইটিস্, নাক দিয়া রক্ত পড়া প্রভৃতি দেখা দেয়। প্রথম সপ্তাহে জ্বর ধাপে ধাপে বাড়িয়া 102° হইতে 105° ডিগ্রী পর্যন্ত উঠে। মাথার যন্ত্রণা ও প্লীহা বৃদ্ধি পায়, জিহ্বা অপরিষ্কার

হয় ও উদরাময়ের সূচনা দেখা দেয়। দ্বিতীয় সপ্তাহে পেট ফাঁপে ও রক্তমকরা মণ্ডের ডালের ন্যায় তরল দাস্ত হইতে থাকে। তৃতীয় সপ্তাহে রোগী বিকারের ঘোরে অর্থহীন প্রলাপ বকে, কুণ্ডলী পাকাইয়া শয়ন করিতে চায়, স্মরণশক্তি লোপ পায়, অন্ত্রে ক্ষত হওয়ায় রক্ত দাস্ত হইতে থাকে। মারাত্মক না হইলে তৃতীয় সপ্তাহের আরম্ভ হইতেই রোগ উপশম হইতে থাকে। টাইফয়েড জ্বরের পুনরাক্রমণ অত্যন্ত মারাত্মক হয়।

কারণ ঃ—টাইফয়েড রোগের কারণ **ব্যাসিলাস টাইকোসাস** (Bacillus typhosus) নামক এক প্রকার জীবাণু (চিত্র 28)। 1880 খ্রীষ্টাব্দে এবার্থ (Eberth) এই জীবাণু সর্বপ্রথম ঠিক ভাবে বর্ণনা করেন। রোগীর মল, মূত্র, ঘর্ম, থুথু প্রভৃতি হইতে এই ব্যাধি সুস্থ মানুষের দেহে সংক্রামিত হয়। সম্পূর্ণ সুস্থ হইলেও অনেকে বহু বৎসর যাবৎ এই রোগজীবাণু দেহ মধ্যে বহন করে। ইহারা ব্যাপক ভাবে এই রোগের বিস্তার সাধন করিয়া থাকে। মশা, মাছি বা দূষিত হস্ত কর্তৃক সংক্রামিত খাদ্যদ্রব্য, পানীয় জল, দুধ, বরফ এমন কি কাঁচা তরিতরকারীর সহিত এই রোগ-জীবাণু আমাদের শরীরে প্রবেশ করিতে পারে। দুধের মধ্যে ইহারা দ্রুত বংশ বৃদ্ধি করিতে পারে। সেইজন্য গোয়ালার হস্ত হইতে টাইফয়েডের রোগ-জীবাণু দুধকে দূষিত করিলে উহা বহু লোকের দেহে রোগ সংক্রমণ ঘটায়। রোগ-জীবাণু, মুখ দিয়া আমাদের শরীরে প্রবেশ করিলে প্রথমে উহা প্লীহা, যকৃৎ ও লসিকা গ্রন্থিগুলিকে আক্রান্ত করে ও উহাদের মধ্যে বৃদ্ধি লাভ করিতে থাকে। উপ্তিকালের শেষ ভাগে জীবাণুগুলি রক্ত মধ্যে আসে এবং রোগের লক্ষণগুলি প্রকাশ পায়। রক্তের মধ্য দিয়া জীবাণুগুলি পিত্তথলির মধ্যে আসে ও তথা হইতে পুনরায় অন্ত্রমধ্যে প্রবেশ করে ও অন্ত্রে ক্ষতের সৃষ্টি করে।



চিত্র 28
টাইফয়েড রোগের জীবাণু × 1500

চিকিৎসা ঃ—টাইফয়েড রোগে চিকিৎসা অপেক্ষা শুশ্রূষা অধিক প্রয়োজন। জ্বর বাড়িলে মাথায় বরফ দেওয়া উচিত। পূর্বে চিকিৎসার জন্য টাইফাস ফাজ, আন্ত্রিক ফাজ, সালফোনামাইড ইত্যাদি ব্যবহার করা হইত। বর্তমানে ক্লোরোমাইসিটিন (chloromycetin) নামক এক প্রকার অ্যান্টিবায়োটিক (antibiotic)

ঔষধ আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহার সাহায্যে আজকাল টাইফয়েড রোগকে অনায়াসে আয়ত্ত করা যায়। তবে এই ঔষধ ব্যবহার করিবার সময় অভিজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণ প্রয়োজন। কখনও কখনও উপসর্গ ভেদে এই ঔষধের সহিত অথবা পৃথকভাবে টেরামাইসিন, আইলোসাইটিন প্রভৃতি অ্যান্টিবায়োটিক টাইফয়েড চিকিৎসায় ব্যবহার করা হয়।

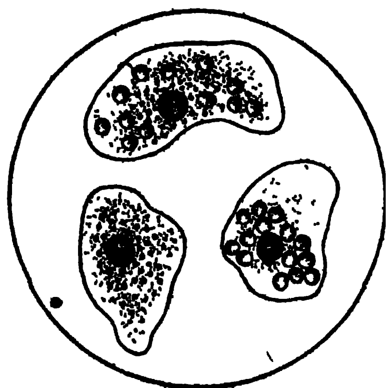
রোগ নিবারণ ঃ—ভারতবর্ষে এই রোগ বৎসরের প্রায় সকল সময়েই হয়। বাংলাদেশে সাধারণতঃ গ্রীষ্মকালে ইহার প্রাদুর্ভাব হয়। সেইজন্য রোগ নিবারণ কল্পে বসন্ত কালের শেষভাগে টাইফয়েড নিবারক T. A. B. C. ইনজেকশন্ লওয়া উচিত। ইহার প্যারাটাইফয়েড এবং কলেরা নিবারণ করিবারও ক্ষমতা আছে। রোগের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে রোগীকে ভিন্ন ঘরে রাখা উচিত এবং রোগীর ব্যবহৃত পোষাক-পরিচ্ছদ, মলমূত্র প্রভৃতি রাখিবার পাত্রাদি নির্বীজক ঔষধ দ্বারা ধুইয়া লওয়া কর্তব্য। দুধ ও পানীয় জল উত্তমরূপে ফুটাইয়া খাইলে এবং খাদ্যদ্রব্য ঢাকা দিয়া রাখিয়া মাছি বা অন্যান্য কীট পতঙ্গ বসিতে না দিলে এই রোগ অনেকাংশে নিবারণ করা যায়।

3. **আমাশয় (Dysentery)** ঃ—আমাশয় আমাদের দেশে একটি অতি সাধারণ আন্ত্রিক ব্যাধি। ইহা অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক এবং কখনও কখনও দেশব্যাপী সংক্রামক আকারে আবির্ভূত হয়। গ্রীষ্মপ্রধান দেশে এই রোগের প্রাদুর্ভাব বেশী দেখা যায়। আমাশয় সাধারণতঃ দুই প্রকারের—**অ্যামিবিক** (amoebic) ও **ব্যাসিলারী** (bacillary)। শেষোক্ত প্রকারটি অধিক সাংঘাতিক। ইহাতে মৃত্যুর হার শতকরা প্রায় 20 জন।

লক্ষণ ঃ—অ্যামিবিক আমাশয়ের জীবাণু শরীরে প্রবেশ করিবার প্রায় 6 হইতে 12 সপ্তাহ পরে ইহার লক্ষণ প্রকাশ পায়। তলপেট থাকিয়া থাকিয়া কামড়ায়, মলের সহিত সাদা পিচ্ছিল মিউকাস্ (আম) বাহির হইতে থাকে। কখনও কখনও মলের সহিত মিশ্রিত অবস্থায় রক্তের ছিট দেখা যায়। বারবার মল ত্যাগের ইচ্ছা হয় এবং মলত্যাগ কালে কোঁথ বা বেগ থাকে। এই রোগে সাধারণতঃ জ্বর থাকে না। ব্যাসিলারী আমাশয় জীবাণু জল বা খাদ্য হইতে শরীরে প্রবেশ করিলে প্রায় 12 ঘণ্টা হইতে কয়েক দিনের মধ্যেই ইহার লক্ষণ প্রকাশ পায়। ভীষণ ভাবে পেট কামড়াইতে থাকে ও উদরাময় (diarrhoea) দেখা দেয়। মলের সহিত রক্ত ও পিচ্ছিল সাদা মিউকাস কখনও কখনও পুঁজ বাহির হইতে

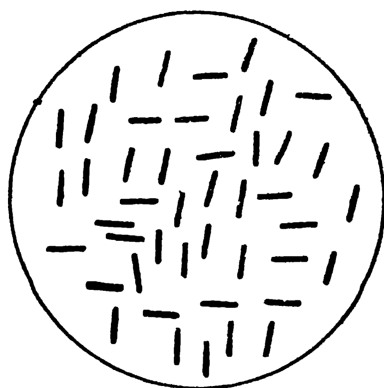
থাকে। এই রোগ স্নায়ুতন্ত্রকেও আক্রমণ করিতে পারে। ইহাতে রক্তদুষ্টি ঘটে, ফুস্ফুসে ক্ষত জন্মায় ও জ্বর দেখা দেয়।

কারণ ঃ—অ্যামিবিক আমাশয় **এণ্টঅ্যামিবা হিষ্টোলিটিকা** (Entamoeba histolytica) নামক এক প্রকার আদ্যপ্রাণী হইতে সংঘটিত হয় (চিত্র 29ক)। অ্যামিবার সহিত আমাশয়ের যে সম্পর্ক আছে তাহা বৈজ্ঞানিক **লীস্‌খ (Loesch)**



চিত্র 29ক

অ্যামিবিক আমাশয়ের জীবাণুবাহী অ্যামিবা × 500



চিত্র 29খ

ব্যাসিলারী আমাশয়ের জীবাণু × 1500

1875 খ্রীষ্টাব্দে প্রথম আবিষ্কার করেন। ব্যাসিলারী আমাশয়, **শিগেল্লা ডিসেন্ট্রি (Shigella dysenteriae)** নামক একপ্রকার ব্যাসিলাস্ বা জীবাণু দ্বারা সংঘটিত হয় (চিত্র 29খ)। একজন জাপানী চিকিৎসক **শিগা** (Shiga) 1898 খ্রীষ্টাব্দে এই জাতীয় আমাশয় জীবাণুর একটি প্রজাতি (Shigella shigar) সর্বপ্রথম আবিষ্কার করেন। এই জীবাণুগুলি সাধারণ অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে দেখা যায়। আমাশয়ের জীবাণুগুলি খাদ্য ও পানীয়ের মাধ্যমে আমাদের অন্ত্রের মধ্যে প্রবেশ করে ও দ্রুত বংশবৃদ্ধি করিতে থাকে। অ্যামিবিক আমাশয়ে, মৃত অ্যামিবাগুলি মলের সহিত বাহিরে আসে। কখনও কখনও ইহারা অন্ত্রের মধ্যে স্থায়ী বাসা বাঁধে। আন্ত্রিক শিরার মাধ্যমে অ্যামিবাগুলি যকৃতের মধ্যেও প্রবেশ করে। ব্যাসিলারি আমাশয়ে জীবাণুগুলি অন্ত্রে ক্ষতের সৃষ্টি করে, ফলে মলের সহিত রক্ত বাহির হয়।

চিকিৎসা ঃ—অ্যামিবিক আমাশয়ের চিকিৎসার জন্য এণ্টারোভায়োফর্ম, এণ্টারোকুইনল, সালফাগুয়ানিডিন, থানকুনি পাতার রস প্রভৃতি ঔষধ বিশেষ

ফলপ্রদ। এই আমাশয় অনেক দিন স্থায়ী হইলে চিকিৎসকের পরামর্শ মত কয়েকটি এমিটিন ইনজেক্‌শন লইলে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়। ব্যাসিলারী আমাশয়ে সালফোনামাইডস্‌, সালফাগুয়ানিডিন, সাক্‌সিনল, সালফা থায়াজল প্রভৃতি ঔষধ উপযুক্ত পরিমাণে বিশেষ ফলপ্রদ। আধুনিক যুগে এই প্রকার আমাশয় চিকিৎসার জন্য ষ্ট্রেপটোমাইসিন, টেরামাইসিন্‌ প্রভৃতি অ্যান্টিবায়োটিক জাতীয় ঔষধ বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হইতেছে।

রোগ নিবারণ :—রোগীকে পৃথক্‌ ঘরে রাখিলে ও রোগীর মল, থুথু প্রভৃতি, নির্বীজক ঔষধ দ্বারা শোধন করিলে এই রোগ প্রসারে বাধা দেওয়া যায়। আমাশয় মাছি, কীট-পতঙ্গ, জল প্রভৃতির সাহায্যে সংক্রামিত হয়। সেইজন্য খাদ্যদ্রব্য ভাল ভাবে ঢাকিয়া রাখিলে এবং পানীয় জল ফুটাইয়া খাইলে এই রোগ নিবারণ করা যায়।

(গ) কয়েকটি কীটপতঙ্গ বাহিত রোগ (Some insect borne diseases) :

1. **ম্যালেরিয়া (Malaria) :** ম্যালেরিয়া জ্বর মশক বাহিত এক প্রকার রোগ। এই জ্বর **কোটিডিয়ন, টার্শিয়ান্‌, কোয়ার্টন্‌,** নামে বহু দিন হইতে পরিচিত। এই মারাত্মক ব্যাধি কিছুকাল পূর্বেও ব্যাপকভাবে আক্রমণ করিয়া, বাংলার বিশেষতঃ পল্লীর জনস্বাস্থ্য বিশেষভাবে ক্ষুণ্ণ করিয়াছিল। প্রতি বৎসর বর্ষার মাঝামাঝি হইতে শীতের প্রারম্ভ পর্যন্ত বাংলাদেশে ম্যালেরিয়া মহামারীরূপে দেখা দিত। 1954 খ্রীষ্টাব্দে ভারতবর্ষ হইতে ম্যালেরিয়া দূরীকরণের জন্য সরকার কর্তৃক একটি পরিকল্পনা (Malaria eradication programme) গৃহীত হয়। ইহার ফলে বর্তমানে এই ব্যাধি প্রায় আয়ত্তে আনা হইয়াছে।

লক্ষণ : এই রোগের লক্ষণগুলিকে প্রধানতঃ তিনটি অবস্থায় বিভক্ত করা যায় ; যথা **কম্পন, উত্তাপ** ও **ঘম**। প্রথম অবস্থায় রোগীর হাত পা ঠাণ্ডা হইয়া যায়, গা বমি বমি করে ও মাথায় যন্ত্রণা বোধ হয়। দ্বিতীয় অবস্থায় ক্রমে ক্রমে জ্বর বাড়িতে থাকে এবং 103°—106° ডিগ্রী ফারেণহাইট্‌ পর্যন্ত উঠিতে দেখা যায়। শ্বাস প্রশ্বাসের গতি দ্রুত হয় ও সমস্ত শরীরে যন্ত্রণা অনুভূত হয়। তৃতীয় অবস্থায় ঘাম দিয়া জ্বর ছাড়িতে থাকে ও রোগী সুস্থ বোধ করে। এইগুলি ব্যতীত ম্যালেরিয়া জ্বরের আরও কয়েকটি বিশেষত্ব আছে। সাধারণতঃ জ্বর প্রতিদিন একই সময়ে আসে। কখনও কখনও ইহা 24/48/72 ঘণ্টা অন্তর আসে। ক্রমাগত জ্বর চলিতে থাকিলে প্লীহা বাড়ে এবং রক্তে লোহিত কণিকার সংখ্যা

কমিয়া যায়। স্বাস্থ্য ও শরীর দুর্বল হয় এবং শেষ পর্যন্ত রোগী মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

কারণঃ ম্যালেরিয়া জ্বর **প্লাসমোডিয়াম** (Plasmodium) নামক এক প্রকার পরজীবী আদ্যপ্রাণী কর্তৃক সংঘটিত হয়। সাধারণতঃ তিন প্রকারের ম্যালেরিয়া জ্বর আছে এবং ইহাদের জীবাণুগুলিও বিভিন্ন। প্রথম প্রকারের নাম



চিত্র 30

ম্যালেরিয়া জীবাণুর জীবনচক্র

এক-ম্যালেরিয়া বা **কোটিডিয়ান ম্যালেরিয়া** (quotidian fever) ইহাতে জর 24 ঘণ্টা অন্তর একই সময়ে আসে। ইহার **জীবাণু প্লাসমোডিয়াম ফালসিপেরাম** (Plasmodium falciparum)। এই জীবাণু **ওয়েলস্** 1897 খ্রীষ্টাব্দে আবিষ্কার করেন। দ্বিতীয় প্রকারের নাম **দ্বি-ম্যালেরিয়া** বা **টারশিয়ান ম্যালেরিয়া** (t_rtian fever) ইহাতে 48 ঘণ্টা অন্তর জর হয়। ইহার জীবাণু **প্লাসমোডিয়াম ভাইভাকস** (Plasmodium vivax)। এই জীবাণু **গ্রাসি ও ফেলেটি** 1890 খ্রীষ্টাব্দে আবিষ্কার করেন। তৃতীয় প্রকারের নাম **ত্রি-ম্যালেরিয়া** বা **কোয়ার্টান ম্যালেরিয়া** (quartan fever)। ইহাতে প্রতি 72 ঘণ্টা অন্তর জর আসে। ইহার জীবাণু **প্লাসমোডিয়াম ম্যালেরি** (Plasmodium m_lari_e)। ইহা **লাভেরাঁ** (Laveran) 1881 খ্রীষ্টাব্দে প্রথম আবিষ্কার করেন। পরবর্তীকালে 1894 খ্রীষ্টাব্দে স্যার **রোনাল্ড রস** (Ron_ld Ross) গবেষণা করিয়া দেখান ম্যালেরিয়া পরজীবীর জীবনচক্র কিছুটা মানুষ ও কিছুটা এনোফিলিস (anopheles) জাতীয় মশার মধ্যে সম্পূর্ণ হয়। মশকী রোগাক্রান্ত মানুষকে দংশন করিলে মানুষের রক্ত হইতে প্লাসমোডিয়াম পরজীবী মশকীর পাকস্থলীতে প্রবেশ করে ও তথা হইতে ক্রমে উহার লালাগ্রন্থি মধ্যে আসিয়া দ্রুত বংশ বৃদ্ধি করিতে থাকে (চিত্র 30)। এখানে পরজীবীর জীবন-চক্রের কিছুটা সম্পূর্ণ হয়। ইহার পর এই মশকী কোন সুস্থ মানুষকে দংশন করিলে ঐ জীবাণু মশকীর লালাগ্রন্থি হইতে উহার হুলের মাধ্যমে মানুষের রক্তে মিশিয়া যায়। তথায় জীবাণুগুলি রক্তের লোহিত কণিকার মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করে এবং জীবন-চক্রের বাকী অংশ সম্পূর্ণ করে। পরে লোহিত কণিকাগুলি বিদারিত করিয়া অসংখ্য নূতন জীবাণু বাহির হইয়া আসে। এই জীবাণুগুলি পর্যায়ক্রমে লোহিত কণিকাগুলিকে ধ্বংস করিতে থাকে, ফলে ম্যালেরিয়া জরের লক্ষণগুলি প্রকাশ পায়। এই অবস্থায় যদি কোন মশকী ঐরূপ রোগগ্রস্ত মানুষকে দংশন করে তাহা হইলে পরজীবীগুলি পুনরায় মশকীর মধ্যে প্রবেশ করে। সুতরাং দেখা যাইতেছে এনোফিলিস মশকীর মাধ্যমে প্লাসমোডিয়াম জীবাণু মানুষের শরীরে প্রবেশ করিলে ম্যালেরিয়া হয়।

চিকিৎসা : পূর্বে ম্যালেরিয়ার একমাত্র চিকিৎসা ছিল কুইনাইন। ইহা সিঙ্কোনা গাছের ছাল হইতে প্রস্তুত করা হয়। কুইনাইন সেবনে শরীরে কতকগুলি বিষলক্ষণ দেখা দেয়। ইহা ব্যতীত প্লাসমোডিয়াম ফালসিপেরাম ঘটিত ম্যালেরিয়ায় কুইনাইন বিশেষ কার্যকরী হয় না। সেইজন্য এটেব্রিন ও প্লাজমোকুইন সেবন

করিতে হয়। বর্তমানে প্যালুড্রিন, মেপাক্রিন, ক্যামোকুইন, নিভাকুইন ইত্যাদি ঔষধও এই রোগ চিকিৎসায় ব্যবহৃত হইতেছে।

রোগনিবারণ : পূর্বে দেখিয়াছি এনোফিলিস মশকীই ম্যালেরিয়া রোগ-জীবাণুর বাহক। সুতরাং ইহাদের ধ্বংস করিতে পারিলে এবং ইহাদের দংশন প্রতিহত করিতে পারিলে ম্যালেরিয়া রোগ বহুলাংশে নিবারণ করা যায়। এনোফিলিস মশা বসিবার সময় মাথার দিক নীচু করিয়া সোজা হইয়া বসে (চিত্র 30) এবং মাটির সহিত সূক্ষ্মকোণ সৃষ্টি করে। ইহাদের ডানায় সাদা কালো ফুটকি থাকে। এই প্রকার মশকের জন্মস্থান বদ্ধ জলা, ডোবা, নর্দমা ইত্যাদি। এই সকল স্থানে ডি. ডি. টি., কেরোসিন, প্যারিসগ্রীন বা অন্য কীটনাশক পদার্থ ছড়াইলে মশকেরা ডিম পাড়িতে পারে না ও সমূলে বিনষ্ট হয়। বাড়ীর নিকটবর্তী স্থানে ঘন গাছপালা না রাখিলে ঘরে ধূনা, গন্ধক ইত্যাদি পোড়াইলে বা ফ্লীট স্প্রে করিলে মশকের বৃদ্ধি নিবারণ করা যায়। রাত্রে মশারী টাঙ্গাইয়া শয়ন করিলে মশার দংশন হইতে রক্ষা পাওয়া যায়। মশকী কামড়াইলে সাবধানতা হিসাবে 5 গ্রেণ কুইনাইন দিনে তিনবার করিয়া পর পর তিন দিন সেবন করিলে রোগ নিবারণ করা যায়।

2. **প্লেগ (Plague)** : প্লেগ মানব-জাতির ইতিহাসে একটি মারাত্মক সংক্রামক রোগ। ইহা মহামারী রূপে দেখা দিলে বহুলোকের মৃত্যুর কারণ হয়। চতুর্দশ শতাব্দীতে এই মহামারী ইউরোপে "কৃষ্ণমৃত্যু" (black death) নামে প্রায় 250,00000 লোকের মৃত্যু ঘটাইয়াছিল। ভারতবর্ষে বোম্বাই সহরে 1896 ও কলিকাতায় 1900 খ্রীষ্টাব্দে ভীষণভাবে এই রোগের প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল। প্লেগ, **বিউবনিক, সেপ্টিসিমিক, নিউমোনিক** প্রভৃতি নানাপ্রকার হইয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে শেষোক্ত দুইটি অধিক মারাত্মক।

লক্ষণ : রোগজীবাণু শরীরে প্রবেশ করিবার প্রায় দুই হইতে আট দিনের মধ্যে এই রোগের লক্ষণ প্রকাশ পায়। বিউবনিক প্লেগে সামান্য শীত করিয়া জ্বর হয় ও শরীরের উত্তাপ 103°—107° ডিগ্রী পর্যন্ত বর্ধিত হয়। জ্বর বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে চক্ষু রক্তবর্ণ হয়, জিহ্বা শুষ্ক হইয়া যায় ও পিপাসা পায়। প্রথমে কুঁচকি ও পরে বগলের লসিকা গ্রন্থিগুলি স্ফীত হয় (চিত্র 31খ) ও পরবর্তীকালে পাকিয়া যায়। চর্মে রক্তবিন্দু দেখা দেয়। রোগী বিকারগ্রস্ত হইয়া ভুল বকিতে থাকে ও ক্রমশঃ মৃত্যুমুখে পতিত হয়। সেপ্টিসিমিক প্লেগে গ্রন্থি স্ফীত হয় না রোগী ক্রমশঃ নিস্তেজ হইয়া পড়ে ও ভুল বকিতে থাকে। কখনও কখনও নাক কান দিয়া রক্ত পড়ে এবং দুই তিন দিনের মধ্যেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়। নিউমোনিক প্লেগে অত্যন্ত শীত করিয়া জ্বর আসে

কারণ: একপ্রকার **ছত্রাক** (fungus) জাতীয় উদ্ভিদ এই রোগের কার[ণ]। এই নিম্নস্তরের উদ্ভিদগুলি মানুষের চর্মে পরজীবী রূপে বাস করে ও এই রোগ করে। রোগাক্রান্ত ব্যক্তির পোশাক পরিচ্ছদ, গামছা ইত্যাদি ব্যবহার করিলে সংস্পর্শে আসিলে এই রোগ সংক্রামিত হয়। গাত্রচর্ম অপরিষ্কার থাকা এই রোগে[র] অন্যতম কারণ।

চিকিৎসা: আক্রান্ত স্থানগুলি কার্বলিক সাবান দ্বারা ভাল করিয়া ধুইয়া দেওয়া উচিত। ক্ষতের উপর সালফার আইয়োডাইড, বেনজোয়িক এসিড, স্যালিসিলি[ক] এসিড, ক্রাইসোফেনিক এসিড প্রভৃতি মিশ্রিত মলম প্রয়োগে উপকার হয়। লিমিনেন্ট আয়োডিন, লোসিও অ্যাক্রিফ্ল্যাভিন প্রভৃতি ঔষধও এই রোগ চিকিৎসায় ব্যবহৃত হয়।

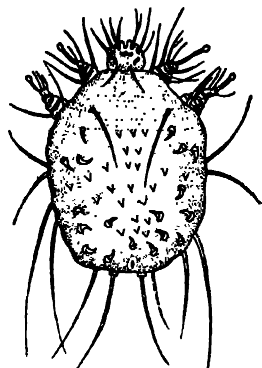
রোগ নিবারণ: দাদ নিবারণ করিতে হইলে দেহ, পোশাক পরিচ্ছদ পরিষ্কা[র] পরিচ্ছন্ন রাখিতে হইবে। ভাল করিয়া সরিষার তৈল মর্দন করিয়া, মধ্যে মধ্যে সর্বা[ঙ্গ] সাবান দিয়া পরিষ্কার করিয়া স্নান করিলে এই রোগ হয় না। আক্রান্ত রোগীর সংস্প[র্শ] পরিত্যাগ করিলে এই রোগ নিবারণ করা যায়।

2. খোস, পাঁচড়া (Scabies): খোস একটি স্পর্শসংক্রামক চর্মরোগ।

লক্ষণ: এই রোগ প্রথমে অঙ্গুলিতে বা দেহের অন্যান্য স্থানে চর্মের উপর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফোস্কার আকারে দেখা যায়। আক্রান্ত স্থান অত্যন্ত চুলকাইতে থাকে। পরে ফোস্কাগুলি পাকিয়া যায় ও উহার মধ্যে পুঁজ হয়। আক্রান্ত স্থানের নিকটবর্তী লসিকা গ্রন্থিগুলিতে ব্যথা হয়। কখনও কখনও জ্বর দেখা দেয়। মারাত্মক ন[া] হইলেও খোস অত্যন্ত কষ্টদায়ক ও বিরক্তিকর ব্যাধি।

কারণ: এই রোগ অতি ক্ষুদ্র একপ্রকার **পরজীবী কীট** (Sarcoptes scabiei) কর্তৃক সংঘটিত হয় (চিত্র 32)। অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে ইহাদের দেখা যায়। চর্মের উপর ময়লা জমিলে এই কীটগুলি সেখানে বাসা নির্মাণ করে পরে উহারা চর্মের উপরের স্তর ভেদ করিয়া নীচে যায় এবং তথায় সুড়ঙ্গ খনন করিয়া বাস করিতে থাকে। এই সুড়ঙ্গের মধ্যে স্ত্রী কীটগুলি অসংখ্য ডিম পাড়ে ও দ্রুত বংশবৃদ্ধি করিতে থাকে। চুলকাইবার সময় ঐ ডিম মিশ্রিত রস বা পুঁজ আঙুলে বা নখে লাগিয়া যায়। পরে দেহের অন্য কোন স্থান ঐ নখের সাহায্যে চুলকাইলে তথায় উহারা সংক্রমিত হয়। ডিম ফাটিয়া নূতন কীট জন্মগ্রহণ করে ও উহা সেই স্থানের চর্ম ভেদ করিয়া নীচে চলিয়া যায়। রোগাক্রান্ত ব্যক্তির ব্যবহৃত গামছা, পোশাক, শয্যা ইত্যাদি ব্যবহার করিলে এবং ঐ ব্যক্তির সংস্পর্শে আসিলে এই রোগ সংক্রমিত হইতে পারে।

চিকিৎসা ঃ আক্রান্ত স্থান উষ্ণ জল ও কার্বলিক সাবান বা ডেটল দ্বারা ভাল করিয়া ধুইয়া ঐ স্থানে গন্ধক মিশ্রিত কোন মলম অথবা ভেসেলিনের সহিত বরিক এসিড পাউডার বা সালফা ডায়াজিন গুঁড়া মিশ্রিত করিয়া লাগাইলে সুফল পাওয়া যায়। সিবাজল বা পেনিসিলিন মলম প্রয়োগে বিশেষ উপকার হয়। বর্তমানে বেনজিল বেনজয়েট (Benzyl Benzoate) নামক রাসায়নিক পদার্থযুক্ত এস্‌কাবায়ল (Ascabiol) লোশান এই রোগ সারাইবার জন্য ব্যবহৃত হইতেছে।



চিত্র 32
খোসের কীট

রোগ নিবারণ ঃ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকিলে, নিম বা কার্বলিক সাবান দ্বারা গাত্র পরিষ্কার করিয়া প্রত্যহ স্নান করিলে এই রোগ হয় না। নিয়মিত নখ কাটিলে, রোগগ্রস্ত ব্যক্তির ব্যবহৃত দ্রব্যাদি ব্যবহার না করিলে এবং নিয়মিত চিরতা ভিজানো তক্ত জল খাইলে এই রোগ বহুলাংশে নিবারণ করা যায়।

1. ভাইরাস কি? একটি ভাইরাস ঘটিত রোগ সম্বন্ধে যাহা জান লিখ।

2. ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগের লক্ষণ, কারণ, চিকিৎসা ও রোগ নিবারণ বিশদভাবে বর্ণনা কর। স্কু. ফা.-৬৬

3. তিনটি জলবাহিত রোগের নাম কর ও উহাদের মধ্যে যে কোন একটির বিশদ বিবরণ লিখ।

4. কলেরা ও টাইফয়েড রোগ সম্বন্ধে একটি বিবরণ লিখ।

5. কোন্ ব্যাধি এনোফিলিস মশক কর্তৃক মানবদেহে সংক্রামিত হয়? উহার সম্বন্ধে যাহা জান লিখ।

6. প্যাস্তুরেল্লা পেস্‌টিস কোন্ রোগের জীবাণু। এই রোগ কি ভাবে মানুষের দেহে সংক্রামিত হয়? ইহার লক্ষণ, চিকিৎসা ও প্রতিরোধের উপায় কি?

7. স্পর্শাক্রমক ব্যাধি সম্বন্ধে যাহা জান লিখ।

8. শূন্য স্থান পূরণ কর :—

(a) —প্রকৃত পক্ষে ইঁদুরের ব্যাধি। ইহা— —নামক জীবাণু দ্বারা সংঘটিত

হয়। এই রোগজীবাণুর বিবরণ— ও —প্রায় একই সময়ে প্রথম লিপিবদ্ধ করেন। ইঁদুর মরিয়া গেলে, ইঁদুর গাত্রস্থ এক প্রকার—ইহাদের দেহ হইতে—শোষণকালে রোগ-জীবাণু নিজ শরীরে গ্রহণ করে। পরে ইহারা—কে দংশন করিলে রোগ-জীবাণু মানুষের দেহে—হয়।

(b) খোস অতি ক্ষুদ্র একপ্রকার—কর্তৃক সংঘটিত হয়। —উপর—জমিলে ইহারা তথায়—বাঁধে। পরে উহারা চর্মের উপরের—ভেদ করিয়া নীচে যায় এবং তথায়—খনন করিয়া বাস করিতে থাকে।

9. বন্ধনীর মধ্যে লিখিত অশুদ্ধটি কাটিয়া দাও :—

সর্দি একটি (জীবাণু, ভাইরাস) ঘটিত ব্যাধি। কলেরা একটি (বায়ুবাহিত, জলবাহিত) রোগ। টাইফয়েড রোগের জীবাণু সর্বপ্রথম (রবার্ট কক, এবার্থ) আবিষ্কার করেন। প্লেগব্যাধি (মশা, ইঁদুর) কর্তৃক মানুষে সংক্রামিত হয়। দাদের কারণ চর্মের উপরিস্থিত একপ্রকার (কীট, ছত্রাক)।

10. শুদ্ধ (✓) অথবা (×) চিহ্ন দ্বারা পার্শ্বে চিহ্নিত কর :—

(a) প্লাসমোডিয়াম আদ্যপ্রাণীর জীবন-চক্র সম্পূর্ণ হয় কিছুটা মানুষ ও কিছুটা মশার মধ্যে।

(b) কুইনাইন প্লেগ রোগের ঔষধ।

(c) টাইফয়েড চিকিৎসায় ক্লোরোমাইসিটিন ব্যবহৃত হয়।

(d) রোণাল্ড রস সর্বপ্রথম ম্যালেরিয়া জীবাণু আবিষ্কার করেন।

(e) আমাশয় একটি বায়ুবাহিত এবং ভাইরাস ঘটিত রোগ।

(f) প্লেগ রোগে কুঁচকি ও বগলের লসিকা গ্রন্থিগুলি স্ফীত হয়।

11. নিম্নলিখিত কারণ তিনটির মধ্যে উপযুক্ত কারণটি পার্শ্বের শূন্যস্থানে (a) বা (b) বা (c) লিখিয়া চিহ্নিত কর।

মশকী কামড়াইলেই যে ম্যালেরিয়া হইবে এমন কোন কথা নাই। কারণ—

(a) মশকী এনোফিলিস না হইতে পারে।

(b) মশকীর মধ্যে ঐ সময়ে রোগ জীবাণু নাও থাকিতে পারে।

(c) রোগজীবাণু মানুষের রক্তে প্রবেশ করিয়া রক্তস্থিত লোহিত কণিকাগুলিকে আক্রমণ না করিতে পারে